গল্প হলেও গল্প নয়

গল্প হলেও গল্প নয় ● দেব সাহিত্য কুটীর

গল্প হলেও গল্প নয়
দেব সাহিত্য কুটীর

GALPO HOLEO GALPO NOI
CODE : 62 G 25

প্রকাশ করেছেন—
অরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ—
শুভ মহালয়া, ১৩৮৭

পুনর্মুদ্রণ—
শুভ মহালয়া, ১৪১৫

রঙ্গীন ছবি ও প্রচ্ছদপট এঁকেছেন—
নারায়ণ দেবনাথ

সাদা-কালো ছবি এঁকেছেন—
প্রসাদ রায়

বর্ণ সংস্থাপন—
প্রদ্যুৎ সাহা
৭, কামারডাঙ্গা রোড
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

ছেপেছেন—
বি সি মজুমদার
বি পি এম'স্ প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগনা (উত্তর)

দাম—৬০.০০

আমাদের কথা

গল্প মানুষের শিক্ষার প্রথম চাবিকাঠি। আদিম সমাজে যখনও লেখার প্রচলন হয় নি, মানুষ যখনও প্রকৃতির অনেক কিছুই চিনে উঠতে পারে নি, সেই সময় কোন কিছু দেখে এসে একজন আর একজনকে সেই জিনিসটি বুঝিয়েছে গল্পের মাধ্যমে। সেই থেকেই শুরু। তারপর নানা উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে মানুষ এগোলেও গল্পের আকর্ষণ কিন্তু একটুও কমে নি। বরং বেড়েই চলেছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ, গল্পের নামে তাই সবাই পাগল। একরকম নয়। সব বয়সেই সবাই চায় নানারকম নানা অভিজ্ঞতার রসে পূর্ণ নতুন নতুন সব আনকোরা গল্প।

অথচ ঠিক গল্প না হলেও গল্পের মতই সত্যি ঘটনা নিয়ে এই সংকলন 'গল্প হলেও গল্প নয়'। এতে পাওয়া যাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতার ভয়াবহ বিবরণ। যে বিবরণগুলোর কোথাও আছে রোমাঞ্চকর সব ঘটনা—চারপেয়ে হিংস্র স্বভাবের বাঘিনীর মতই দ্বিপদ জংলী রমণীর কথা। কোথাও আবার কালো মানুষের ওপর সাদা মানুষের অত্যাচারের কাহিনী। ভয়ংকর বন্য মহিষ কেপ-বাফেলোর সঙ্গে মানুষের লড়াই, মানুষখেকো এক জানোয়ারের সত্যিকার বিবরণ।

এসব যেমন আছে, তেমনি এমন অনেক রোমাঞ্চকর বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে মানুষেরই সমাজজীবন থেকে। ঘটনার পটভূমি কোথাও তাই গভীর অরণ্যে, শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমির বুকে, কখনো বা উত্তাল সমুদ্রে। আবার কখনো কোথাও বনজঙ্গল ছেড়ে জনজীবনের মধ্যে মানুষে মানুষে চক্রান্ত আর লড়াইয়ের মাঝখানে।

সব মিলিয়ে অসংখ্য ছবিসহ এই ঘটনাবহুল গল্পগুলো ভাল লাগলেই শ্রম সার্থক মনে করব।

দেব সাহিত্য কুটীর

সূচীপত্র

মানুষখেকো বাঘিনীকে মানুষ ভয় করে, ঘৃণা করে। কিন্তু সেই ভয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এক ধরনের শ্রদ্ধা—একথাও সত্যি।

মানুষ চিরকালই বীরত্বের পূজারী—তাই নরভুক্ বাঘিনীর হিংস্র স্বভাবের মধ্যেও সে যখন বীরত্বের সন্ধান পায় তখন নিজের অজান্তে তার মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়।

আমি আজ কোনও চতুষ্পদ ব্যাঘ্রীর গল্প বলব না; আমার কাহিনীর নায়িকা একটি দ্বিপদ রমণী যার সঙ্গে অনায়াসে বনচারিণী বাঘিনীর তুলনা করা যায়। শৌর্যে, সাহসে ও স্বভাবের ভীষণতায় এই মেয়েটি বাঘিনীর চাইতে কোন অংশেই কম ছিল না।

আজকের কথা নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে আমাদের নায়িকার কাহিনী। তবে এই কাহিনী শুরু করার আগে জুলুদের কথা একটু বলা দরকার। আফ্রিকার অধিবাসী এই জুলুজাতি সাহস ও বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। কেবলমাত্র বর্শা ও তরবারি সম্বল করে জুলুরা আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বারংবার। রাইফেল ও মেসিনগানের কল্যাণে শ্বেতাঙ্গরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছে বটে, কিন্তু তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে জুলুদের মতো নির্ভীক যোদ্ধা ইউরোপেও নিতান্ত দুর্লভ।

এই জুলুজাতির একটি মেয়েকে নিয়েই আমাদের কাহিনী। জোয়েদি নামক এক জুলু সর্দারের গৃহিণী ছিল নজমবাজী—আমাদের বর্তমান কাহিনীর নায়িকা...

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জুলুজাতির ইতিহাসে আবির্ভূত হলেন এক প্রচণ্ড পুরুষ—রাজা 'উ-শকা'!

একাধিক পুস্তকে তাঁর নামটিকে সংক্ষিপ্ত করে শকা নামে অভিহিত করা হয়েছে, আমরাও তাই বলব।

এই রাজা শকার কোপদৃষ্টিতে পড়ল জোয়েদি সর্দার এবং তার স্ত্রী নজমবাজী। জোয়েদি পালিয়ে বাঁচল, কিন্তু নজমবাজীকে শকার সৈন্যরা গ্রেপ্তার করে ফেলল।

রাজা শকার তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ। যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন শকা। রণডঙ্কা বাজিয়ে যেদিক দিয়ে ছুটে গেছে তাঁর সেনাবাহিনী, সেইদিকেই ধরিত্রীর বুকে লম্বমান হয়েছে অগণিত মানুষের রক্তাক্ত মৃতদেহ।

এমন একটি মানুষের সম্মুখীন হলে অনেক সাহসী
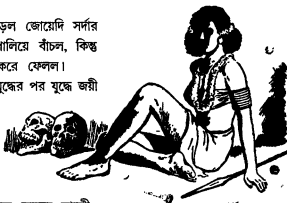
পুরুষের বুকের রক্ত জল হয়ে যায়, কিন্তু নজমবাজীকে যখন বিচারের জন্য শকার সামনে নিয়ে আসা হল তখন তার চালচলনে ভয়ের আভাস ছিল না কিছুমাত্র!

গর্বিত পদক্ষেপে রাজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল রমণী। তার জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টিতে নেই আতঙ্কের ছায়া—রুদ্ধ আক্রোশ ও ঘৃণায় দপদপ করে জ্বলছে বন্দিনীর দুই চক্ষু!

রাজার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল নজমবাজী। জুলুজাতি এবং তাদের রাজা শকাকে উচ্চৈঃস্বরে সে অভিশাপ দিতে লাগল বারংবার।

সমবেত জুলুদের মধ্যে অনেকেই ভীত হল। মারামারি কাটাকাটি করতে জুলুরা ভয় পায় না, কিন্তু ভূত প্রেত মন্ত্রতন্ত্র সম্পর্কে তাদের আতঙ্ক অপরিসীম। নজমবাজী ডাকিনী বিদ্যায় সিদ্ধ, তাই সকলেই তাকে ভয় করতো যমের মতো।

কিন্তু রাজা শকা অন্য ধরনের মানুষ—আততায়ীর তরবারি এবং ডাকিনীর মন্ত্র তাঁর কাছে সমান উপহাসের বস্তু। শরীরী বা অশরীরী কোন জীবকেই তিনি পরোয়া করতেন না।

শকা বন্দিনীকে চুপ করতে বললেন। তিক্তস্বরে নজমবাজী বললে, "বিচারের রায় আগে দিয়ে দাও রাজা—পরে না হয় বিচার কোরো! ফলাফল কি হবে তা তো জানা আছে, মিছামিছি সময় নষ্ট করে লাভ কি?"

রাজা শান্তস্বরে বললেন, "আমি তোমার বিচার করছি বটে, তবে তোমার কথাগুলো আমায় শুনতে হবে। আমি ন্যায় বিচার করতে চাই। তোমার একটি সাধারণ ছোট্ট কথার জন্য হয়তো আমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারি।"

বিচার শুরু হল। নজমবাজীর বিরুদ্ধে রয়েছে নরহত্যা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। একটি নয়, দুটি নয়—ত্রিশটি মানুষকে নাকি হত্যা করেছে নজমবাজী! শুধু হত্যা করেই সে খুশী হয়নি, নিহত লোকগুলির মুণ্ড নিয়ে সে ঝুলিয়ে দিয়েছে তার কুটিরের দেয়ালে দেয়ালে!

বন্দিনী অভিযোগ অস্বীকার করলো না। দৃপ্তকণ্ঠে সে বললে, "হ্যাঁ, আমি ওদের হত্যা করেছি, ওদের মুণ্ডগুলো নিয়ে আমার ঘর সাজিয়েছি।"

শকা প্রশ্ন করলেন, "কেন?"

উত্তর এল, "ক্ষমতা লাভ করার জন্য। আমি ডাকিনী-বিদ্যায় সিদ্ধ হয়েছি। ঐ মুণ্ডগুলি আমার দরকার।".

শকা গম্ভীর স্বরে বললেন, "ভাল, ভাল। কিন্তু ওহে ডাইনি!—বলো দেখি, তোমার ডাকিনী-বিদ্যা কি তোমাকে বাঁচাতে পেরেছে?...পারেনি। কারণ তোমার মন্ত্রের চাইতে আমার অস্ত্রের ক্ষমতা অনেক বেশী আর সেইজন্যই আজ তুমি আমার বন্দী। বুঝেছ?"

"বুঝেছি". বন্দিনীর ওষ্ঠাধরে ফুটল বিদ্রূপের হাসি, "কিন্তু মহামান্য ডিশিংওয়ের মুণ্ডুটা তাহলে আমার দেয়ালে ঝুলছে কেন? বলো?"

সমবেত জনতা স্তব্ধ নির্বাক্। ডিশিংওয়ে রাজার প্রিয় বন্ধু। তাকে হত্যা করেছে নজমবাজী এবং রাজার সামনে দাঁড়িয়ে সেই কথা জানিয়ে বিদ্রূপ করতে সে ভয় পায় না—কী স্পর্ধা!

শকা গম্ভীর স্বরে বললেন, "ঐ মানুষটির মৃত্যু নিয়ে উপহাস করে তুমি খুব বুদ্ধির পরিচয় দাওনি। ডিশিংওয়ে ছিল ভাল মানুষ—সে তোমার স্বামী জোয়েদি ও তোমার প্রতি উদারতা দেখিয়েছিল, তাই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হল প্রাণ দিয়ে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। হায়নার মতো নিকৃষ্ট জীবকে যদি কেউ ভালবাসে, বিশ্বাস করে—তবে সেই হায়নার আক্রমণেই হতভাগ্যের মৃত্যু নিশ্চিত; তোমরাও হায়নার চাইতে উন্নত ধরনের জীব নও...ভাল কথা, নজমবাজী,—শুনেছি হায়নাগুলি ডাকিনীদের অনুচর, ওরা নাকি ডাকিনীর আদেশ পালন করে ভৃত্যের মতো—কথাটা কি সত্যি?"

—"নিশ্চয়, সত্যি বই কি!"

নজমবাজী ভাবল, ঐ উত্তর শুনেই রাজা ঘাবড়ে যাবে।

জুলুরা সাহসী জাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ভয় পায় না—কিন্তু ভৌতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা, অশেষ ভীতি!

কিন্তু রাজা শকা অন্য ধরনের মানুষ, স্থির দৃষ্টিতে নজমবাজীর দিকে তাকিয়ে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "তুমি তো ডাইনি—তাহলে বনের হায়নারা তোমার অনুচর? তারা তোমার কথা শুনবে?"

দৃঢ়স্বরে নজমবাজী বললে, "শুনবে। সব কথা শুনবে।"

"বাঃ! বাঃ! খুব ভাল কথা," শান্ত স্বরে বললেন শকা, "খুব ভাল! খুব ভাল! তাহলে তুমি তোমার কুটিরে ফিরে যাও। নরমুণ্ড সাজিয়ে যেখানে তুমি ক্ষমতার অধিশ্বরী হয়েছ, সেখানেই তুমি নিশ্চিন্তে বাস করো। আমার দেহরক্ষীরা তোমাকে খাদ্য ও পানীয় দিয়ে আসবে। একা একা তোমার খারাপ লাগতে পারে, তাই তোমাকে একটি উপযুক্ত সঙ্গীও দেওয়া হবে। আমার ভৃত্যরা কখনও তোমার কোন ক্ষতি করবে না, তবে—"

—"তবে?"

—"তবে তোমার সঙ্গীর জন্য কোনও আহার্য বা পানীয় দেওয়া হবে না। তার খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজেই করে নেবে।"

নজমবাজী অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। রাজা কথা কইছেন খুব শান্তভাবে, কিন্তু সেই শীতল শান্ত স্বরে যেন এক ভয়াবহ ইঙ্গিত!

নজমবাজী প্রশ্ন করলে, "তাহলে, তাহলে—আমার শাস্তির কি ব্যবস্থা হল?"

মৃদুকণ্ঠে উত্তর এল, "যথাসময়ে তুমি জানতে পারবে..."

নজমবাজীর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল কুটিরের দরজা। হঠাৎ আলো থেকে অন্ধকারের মধ্যে এসে পড়লে মানুষ কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে ফেলে তার দৃষ্টিশক্তি—নজমবাজীরও সেই অবস্থা হল।

বন্ধদ্বার কুটিরের অন্ধকার তার চক্ষুকে সাময়িকভাবে অন্ধ করে দিল বটে, কিন্তু নাসিকার ঘ্রাণশক্তি অন্ধকারের কাছে পরাজিত হল না—একটা তীব্র দুর্গন্ধ তার নাকে এসে ধাক্কা মারল। পশুর গায়ের গন্ধ!

নজমবাজী সাহসী মেয়ে। কিন্তু এইবার সে ভয় পেল। যে অজানা জীবটা ঘরের মধ্যে রয়েছে

তার জান্তব চক্ষু নিশ্চয়ই অন্ধকারের মধ্যেও সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু নজমবাজীর দৃষ্টিশক্তি এখনও আঁধারের যবনিকা ভেদ করে তাকে আবিষ্কার করতে পারছে না—ভয়ের কথা বই কি!

পাথরের মূর্তির মতো বদ্ধ দরজায় সে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল...নিশ্চল, নীরব...

কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠল রমণীর দৃষ্টিশক্তি, আর তখনই তার নজরে পড়ল কুটিরের শেষপ্রান্তে প্রায় বিশগজ দূরে মিট মিট করে জ্বলছে একজোড়া অগ্নিময় চক্ষু! তার কণ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে এল তীব্র আর্তনাদ, "কি! কি! কি ওটা?"

কুটিরের বাইরে ঘন ঘাসের আবরণ সরিয়ে প্রহরীরা জানতে চাইল কি হয়েছে? ভীত ত্রস্তস্বরে নজমবাজী বারবার প্রশ্ন করলে, "কি আছে? কি আছে ঘরের মধ্যে? দপ্ দপ করে ঐ যে জ্বলছে আর জ্বলছে—ওদুটো কার চোখ?"

প্রহরীরা সবিনয়ে জানিয়ে দিল কুটিরের মধ্যে একমাত্র নজমবাজী ছাড়া অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা সচেতন নয়।

কথা বলার সময়ে প্রহরীরা কুটিরের দেয়াল থেকে ঘাসের আবরণ সরিয়ে দিয়েছিল। সেই ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো কিছুটা এসে পড়ল অন্ধকার কুটিরের মধ্যে। আবছা আলো-আঁধারিতে এবার নজমবাজীর দৃষ্টিপথে ধরা পড়ল একজোড়া জ্বলন্ত চোখের নীচে একজোড়া বীভৎস চোয়াল!

দুই চোখের তীব্র দৃষ্টি সঞ্চালন করলে রমণী—অস্পষ্ট আলোছায়ার মধ্যে দেখা গেল লালা গড়িয়ে পড়তে পড়তে ফাঁক হয়ে গেল সেই চোয়াল দুটি—ঝক ঝক করে উঠল দুই চোয়ালের ফাঁকে অনেকগুলো তীক্ষ্ণধার দন্ত!

হায়না!

একটা পুরুষ হায়না!

আবার আর্তনাদ করে উঠল নজমবাজী, আবার ছুটে এল প্রহরীরা, সাগ্রহে জানতে চাইল বন্দিনীর ভয়ের কারণটা কি!

"আলো, আলো, আরও আলো" চেঁচিয়ে উঠল নজমবাজী।

"আপনার আদেশ নিশ্চয়ই পালিত হবে," উত্তর এল সসম্ভ্রমে। ছোট ছোট জানালাগুলোর উপর ছিল শুষ্ক ঘাসের আবরণ, প্রহরীরা সেগুলো সরিয়ে দিল...

নেমে এল রাতের কালো যবনিকা। নজমবাজীর কুটিরের বাইরে এসে দাঁড়াল আরও কয়েকজন প্রহরী। জানালার ফাঁক দিয়ে বন্দিনীকে আহার্য

ও পানীয় সরবরাহ করা হল—প্রচুর মাংসের গ্রিল আর উৎকৃষ্ট 'বিয়ার' জাতীয় সুরা।

পানাহারের রাজকীয় ব্যবস্থা দেখে খুশী হল না বন্দিনী—আসন্ন রাত্রির অন্ধকারের ভয়ে সে বিচলিত। নজমবাজীর ভীতি অমূলক নয়, ঘন অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে যে কোন মুহূর্তে জন্তুটা তাকে আক্রমণ করতে পারে।

নজমবাজী আগুন চাইল, কিন্তু এইবার তার অনুরোধ রক্ষিত হল না। প্রহরী সবিনয়ে জানাল আগুন দেওয়া সম্ভব নয়—রাজার নিষেধ।

প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়েছে বনবালা নজমবাজী, হায়নার স্বভাব-চরিত্র তার অজানা নয়। সে জানত হায়না ভীরু জানোয়ার—যতক্ষণ জন্তুটা ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে পারবে ততক্ষণ সে আক্রমণ করবে না, কিন্তু শূন্য উদরে যখন ক্ষুধার দংশন অসহ্য হয়ে উঠবে তখনই মানুষের মাংসের লোভে ঝাঁপিয়ে পড়বে ক্ষুধার্ত শ্বাপদ—

অন্ধকারের মধ্যে নিরস্ত্র অবস্থায় হায়নার হিংস্র আক্রমণ রোধ করা মেয়েটির পক্ষে অসম্ভব।

নজমবাজী বুঝল হায়নাকে নিজের খাদ্য থেকে কিছু কিছু অংশ যদি দেওয়া যায়, তাহলে জন্তুটা তাকে সহজে আক্রমণ করবে না—একটুকরো মাংস নিয়ে সে ছুঁড়ে ফেলল হায়নার দিকে। হায়না একটুও দেরী করলে না। টপ করে মাংসের টুকরোটা চেপে ধরল দুই চোয়ালের ফাঁকে—কঠিন দন্তের সংঘর্ষে শব্দ উঠল 'খটাস'!

শিউরে উঠল নজমবাজী।

আর তৎক্ষণাৎ বাতায়ন পথে ভেসে এল প্রহরীর কণ্ঠস্বর, "ওকে খাদ্য দেওয়ার হুকুম নেই। আপনি যদি আদেশ অমান্য করেন তবে আপনাকেও ভবিষ্যতে আর খাবার দেওয়া হবে না।"

নজমবাজী বুঝল প্রহরীর কথা না শুনলে উপবাস অনিবার্য। অনাহারে দুর্বল হয়ে পড়লে আরও বিপদ—সে মাংসের টুকরোগুলিতে মনোনিবেশ করলে। খাওয়ার পর আকণ্ঠ সুরাপান করলে সে। গুরু ভোজনের পর সুরার প্রভাব তার চোখে এনে দিল নিদ্রার আবেশ। কিন্তু নজমবাজী জানত অন্ধকার কুটিরের মধ্যে ক্ষুধার্ত হায়নার সামনে ঘুমিয়ে পড়লে সেই ঘুম আর ভাঙ্গবে না কোনদিন—

রমণী প্রাণপণে জেগে থাকার চেষ্টা করতে লাগল...

হঠাৎ তার মনে পড়ল শুধুমাত্র হাড় চিবিয়ে হায়না ক্ষুধানিবৃত্তি করতে পারে। মাংসাশী পশুদের মধ্যে হায়নাই একমাত্র জীব যে মাংসহীন অস্থি থেকে খাদ্যরস সংগ্রহ করার ক্ষমতা রাখে। কুটিরের দেয়াল থেকে নজমবাজী একটু নরমুণ্ড নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। একটু পরেই কুটিরের মধ্যে জাগল এক ভয়াবহ শব্দের তরঙ্গ—কটমট! কটমট! কটমট!

কঠিন শ্বদন্তের নিষ্পেষণে ভেঙ্গে যাচ্ছে অস্থিসার নরমুণ্ড!

ভয়ে ভয়ে জেগে রইল নজমবাজী, একবারও সে চোখ বন্ধ করলে না। হায়না অবশ্য একবারও আক্রমণের চেষ্টা করেনি, শুকনো হাড় চিবিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকল। ভোররাতের দিকে চক চক করে জলপানের আওয়াজ শোনা গেল—কুটিরের একধারে যে কাঠের গামলাতে জল ছিল সেইখানে এসে জন্তুটা তৃষ্ণা নিবারণ করছে...

একটা দিন কাটল। দুপুর এগারটার সময়ে প্রহরী নিয়ে এল মাংস ও সুরা। নজমবাজী যখন বড় বড় মাংসের টুকরো চিবিয়ে খেতে শুরু করলে, তখন হায়না হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল।

মাংসের গন্ধ তার নাকে গেছে—

মুখ তুলে সে ঘ্রাণ গ্রহণ করতে লাগল সশব্দে!

নজমবাজী কয়েকটা নরমুণ্ড দেয়াল থেকে তুলে নিল। এবার সে মুণ্ডগুলি নিক্ষেপ করতে লাগল জন্তুটাকে লক্ষ্য করে। বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে মেয়েটির নেশা চড়ে গেল।

সে চিৎকার করে হায়নার দিকে ধেয়ে গেল। জন্তুটা ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করলে। কুটিরের চারপাশে হায়না তাড়িয়ে ছুটতে লাগল নজমবাজী এবং একসময়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমের জন্য প্রস্তুত হল। শুষ্ক করোটিগুলিতে মেয়েটি মাংসের ঝোল মাখিয়ে দিয়েছিল, এমন লোভনীয় খাদ্য ফেলে হায়না নিশ্চয়ই আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়বে না—এই ছিল তার আশা...

সূর্য অস্ত গেল। প্রহরীরা খাদ্য নিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল। একটি লম্বা ঘুম দিয়ে উঠে বসল নজমবাজী। এবার কিন্তু খুব বেশী খাদ্যগ্রহণ করলে না সে, সুরাপান করল খুব অল্প পরিমাণে—তারপর প্রস্তুত হল রাত্রি জাগরণের জন্য।

রাত কাটল। শুষ্ক অস্থিসার নরমুণ্ড ভোজন করলে হায়না। বিনিদ্র চোখে জেগে রইল নজমবাজী। মাঝে মাঝে মেয়েটি চিৎকার করে উঠছিল, কিন্তু হায়না সম্পূর্ণ নীরব,— শুধু নিক্ষিপ্ত কঙ্কাল-করোটির উপর তার দাঁতের বাজনা বেজেছিল কড়মড় শব্দে...

পরের দিনটাও কেটে গেল এবং পার হয়ে গেল আরও একটি রাত। তার পরের দিন সকালবেলা খুব বেশী পরিমাণেই মাংস ভোজন করলে নজমবাজী, তারপর প্রচুর সুরাপান করে নিদ্রাকাতর দেহে লম্বমান হল মাটির উপর।

সূর্য অস্ত গেল। নজমবাজীর ঘুম ভাঙ্গল না। কুটিরের মধ্যে ঘন হয়ে এল অন্ধকার। নজমবাজী তখনও গভীর নিদ্রায় মগ্ন...

অসহ্য যাতনায় আর্তনাদ করে জেগে উঠল নজমবাজী! এক লাফে শিকারের সামনে থেকে সরে গেল হায়না, তার মুখ থেকে ঝুলছে শ্রীমতী নজমবাজীর একটি পদ-পল্লবের অর্ধেক অংশ!

আহত রমণী চিৎকার

করে প্রহরীকে ডাকল। প্রহরী সাড়া দিতেই সে জানাল একটা গাছের ছালের 'ব্যাণ্ডেজ', কিছু মাকড়সার জাল আর 'জোই' জাতীয় গাছের পাতা তার এখনই দরকার।

প্রহরী তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে ফিরে এল। নজমবাজী যা যা চেয়েছিল সব কিছুই তাকে দেওয়া হল, উপরন্তু সে পেল একটি ধারাল বর্শা। প্রহরী জানাল তার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে মহারাজ শকা বল্লমটা তাকে উপহার দিয়েছেন।

অস্ত্র হাতে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল মেয়েটি। রক্তাক্ত পা'টিকে সে ভালভাবে বাঁধল, তারপর প্রহরীর কাছে খাদ্য চাইল। অন্যদিনের মতো আজ সে পরিমিত পানাহার করলে না—প্রচুর পরিমাণে মাংস উদরস্থ করে সে বিয়ারের পাত্রে চুমুক দিল। আকণ্ঠ মদ্যপান করে সে সোজা হয়ে বসল, তারপর হুকুম করল কুটিরের বাইরে যেন আগুন জেলে দেওয়া হয়।

অনুরোধ রক্ষিত হল। কুটিরের পাশ থেকে ঘাসের আবরণ সযত্নে আরও কিছুটা সরিয়ে নিল প্রহরী, ফলে বাইরের জ্বলন্ত আগুনের আলোতে কুটিরের আঁধার মাখা অন্তঃপুরে জাগল অস্পষ্ট আলোর আভাস...

নজমবাজী আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আচম্বিতে সে অনুভব করলে তার আহত পায়ের উপর তীক্ষ্ণ দন্তের করাল স্পর্শ। হাতের বল্লম তুলে ধরার আগেই মেয়েটির পায়ের ডিম থেকে এক কামড়ে খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে সরে গেল হায়না!

ঘরের মধ্যে তখন বিরাজ করছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বাইরে আর আগুন জ্বলছে না। নজমবাজী চিৎকার করে প্রহরীদের আগুন জ্বালাতে বললে। আদেশ পালিত হল তৎক্ষণাৎ।

জানালার ফাঁকে ফাঁকে জ্বলন্ত মশালের আলোতে নজমবাজী তার ক্ষতবিক্ষত পা'টিকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, তারপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধল খুব নিপুণ হাতে। তখন তার চলার ক্ষমতা আর ছিল না, এক হাতে বর্শা উঁচিয়ে কোনমতে সে হায়নাটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে। খুব সহজেই উদ্যত বর্শাটাকে এড়িয়ে সরে গেল হায়না। শ্রান্ত অবসন্ন দেহে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে পড়ল নজমবাজী।

তার পায়ের ক্ষত থেকে বেশ কিছু রক্ত ঝরে এক জায়গায় মাটির উপর জমেছিল। হায়নাটা সেই রক্তপান করল, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে নজমবাজীর মুখের উপর ক্ষুধিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। বর্শার খোঁচা মারার উপায় ছিল না, জন্তুটা ভারি

শয়তান, উদ্যত বর্শার নাগালের মধ্যে একবারও পা বাড়াল না সে—কেবল তার দুই জ্বলন্ত চক্ষুর নির্নিমেষ দৃষ্টি ক্ষুধার্ত আগ্রহে লেহন করতে লাগল রমণীর সর্বাঙ্গ...

অকস্মাৎ অন্ধকার রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কুটিরের মধ্যে জাগল এক ভয়াবহ অট্টহাস্য—হা! হা! হা! হা!

হায়নার হাসি! কুটিরের মধ্যে নজমবাজীর অঙ্গে অঙ্গে ছুটে গেল আতঙ্কের বিদ্যুৎ-প্রবাহ! এমন কি কুটিরের বাইরে মহারাজের নির্ভীক প্রহরীর মাথার চুলও আতঙ্কে খাড়া হয়ে উঠল! জুলু সৈনিক হাতে অস্ত্র থাকলে কারুকে ভয় পায় না, কিন্তু সেই জান্তব অট্টহাস্য তাদের অন্তরেও ভীতির সঞ্চার করলে।

হি! হি! হি! হি! কুটিরের ভিতর থেকে জাগল এবার নারীকণ্ঠে তীব্র হাস্যধ্বনি!

স্নায়ুর উপর এতখানি চাপ সহ্য করতে পারল না নজমবাজী, সে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ল...

অতর্কিত আক্রমণ করলে হায়না। বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে মেয়েটির পায়ে কামড় বসাল।

সজোরে বর্শা চালনা করল নজমবাজী। সাঁৎ করে সরে গিয়ে জন্তুটা আত্মরক্ষা করলে এবং মেয়েটি সাবধান হওয়ার আগেই দুই চোয়ালের বজ্র-দংশনে চেপে ধরলে বর্শাফলক—

পরক্ষণেই এক টান মেরে হায়না অস্ত্র ছিনিয়ে নিল। নজমবাজী বুঝল নিরস্ত্র অবস্থায় আর সে আত্মরক্ষা করতে পারবে না, মৃত্যু তার নিশ্চিত। সে তার আর্তনাদ করলে না, দৃঢ় স্বরে হাঁক দিল, "প্রহরী!"

উত্তর এল, "আদেশ করুন।"

—"আমি আর একে ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না। শয়তানটা এখনই আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। রাজাকে জানিও নজমবাজী জীবনে কখনও কাঁদে নি। আজও সে হাসিমুখে মরতে চায়। আমার অন্তিম অনুরোধ এই কুটিরে যেন আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। শত্রুকে যদি পুড়ে মরতে দেখি তাহলে আমিও হাসতে হাসতে মরতে পারব। যাও প্রহরী, তাড়াতাড়ি যাও।"

রাজার অনুমতি আনতে একটু দেরী হল। ঐ সময়ের মধ্যেই বার বার আক্রমণ চালিয়েছে হায়না। কোনমতে দুই হাত দিয়ে জন্তুটার আক্রমণ ঠেকিয়েছে নজমবাজী। হায়নার নিষ্ঠুর দাঁত তার শরীরের মারাত্মক স্থানগুলিকে স্পর্শ করতে পারে নি বটে, কিন্তু রাজার আদেশ নিয়ে প্রহরী যখন ফিরে এল তখন হতভাগিনী মেয়েটিকে দুখানি পায়ের বেশীর ভাগ অংশই হায়নার উদরস্থ হয়েছে।

হায়না বুঝেছে তার শিকার দুর্বল হয়ে পড়ছে। হিংস্র দন্ত বিস্তার করে সে আবার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কুটিরের শুষ্ক আবরণ ভেদ করে উঁকি দিল জ্বলন্ত অগ্নিশিখা!

নজমবাজীর প্রার্থনা পূরণ করেছেন রাজা, প্রহরীরা আগুন লাগিয়েছে কুটিরে...

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন, সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল হায়না, কুটিরের অভ্যন্তরে জাগল নারীকণ্ঠে তীব্র হাস্যধ্বনি—"হি! হি! হি! হি!"

কুটিরের ছাতের উপর, দেয়ালের উপর সগর্জনে লাফিয়ে উঠল শত শত লেলিহান অগ্নিশিখা—

প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে পড়ল ছাত। অগ্নিদেবের জ্বলন্ত আলিঙ্গনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল শ্বাপদ ও রমণী...

নজমবাজীকে কেউ প্রশংসা করবে না।

বহু মানুষকে সে হত্যা করেছিল; বাঘিনীর মতো হিংসা-কুটিল তার স্বভাব, বাঘিনীর মতোই সে ভয়ংকরী—অপরাধের যোগ্য শাস্তি পেয়েছে সে।

কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় সে দিয়েছিল তার জন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মহারাজ শকা—বাঘিনীকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি তিনি।

ঐ সম্মান তার প্রাপ্য।

বাঘিনীর প্রাপ্য।

সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আজ নবজাগ্রত আফ্রিকা। যাঁরা রাজনীতির চর্চা করেন, তাঁদের কাছে আজ আফ্রিকা তীব্র কৌতূহল ও উদ্দীপনার বিষয়, কিন্তু শুধু আজ নয়—

যুগ যুগ ধরে এই অরণ্যাবৃত মহাদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে আর এক ধরনের মানুষ, যারা রাইফেল হাতে বারংবার হানা দিয়েছে আফ্রিকার বনভূমির বুকে—

আফ্রিকা!

বলতেই শিকারীর মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে এক বিশাল অরণ্যভূমি—যেখানে মদগর্বে সর্বত্র পদচারণা করে বেড়ায় বিপুলবপু হস্তিযূথ, গাছের ডালে ডালে এবং ঝোপঝাড়ে শিকারের অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকে মহাকায় অজগর, তৃণ-আচ্ছাদিত প্রান্তরে ছুটোছুটি করে হরিণ-জাতীয় 'অ্যান্টিলোপ' আর জেব্রার দল, লম্বা গলা তুলে গাছের মগডালের পাতা ছিঁড়ে খায় বেঢপ জিরাফ, সর্বাঙ্গ বর্মে ঢেকে নাকের ডগায় দু-দুটো খড়্গ উঁচিয়ে হঠাৎ ঘন জঙ্গলের ভিতর থেকে প্রান্তরের মাঝখানে আত্মপ্রকাশ করে দ্বি-খড়্গী গণ্ডার এবং মাথায় শিঙের সঙিন চড়িয়ে নির্ভয়ে বিচরণ করে যে-সব ভয়ংকর 'কেপ বাফেলো' শক্তির দম্ভে তারা দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করে না।

গাছের উপরে ও নীচে আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় হিংস্র কুকুরমুখো বেবুন-বাঁদরের দল, আর তাদের উপর হানা দিতে সতর্ক পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে আসে আরও হিংস্র এক অতিকায় মার্জার—গাছের ছায়ায় ছায়ায় অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে তার গায়ের গোল গোল দাগগুলো মিশে যায়, শুধু পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘাসের আড়ালে জ্বলতে থাকে একজোড়া ক্ষুধিত চক্ষু—

লেপার্ড!

অকস্মাৎ সমগ্র বনভূমির বুকে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে জেগে ওঠে এক ভৈরব-কণ্ঠের হুঙ্কার-সঙ্গীত! পশুরাজ সিংহ তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে সগর্বে!

হ্যাঁ, এই হল আফ্রিকা! শিকারীর স্বর্গ!

এখানকার নদী আর জলাভূমিও অতিশয় বিপজ্জনক। জলের মধ্যে এবং জলের ধারে ঝোপের ভিতর স্থির হয়ে পড়ে থাকে যে-সব কুমির, নরমাংসে তাদের মোটেই অরুচি নেই; এবং দৈত্যাকৃতি হিপোপটেমস বা জলহস্তীরা যদিও মাংসভোজী নয়, কিন্তু মেজাজ খারাপ হলে মানবদেহের উপর দাঁতের ধার পরখ করতে তারা আপত্তি করে এমন কথা কেউ কখনও শোনেনি।

এমন চমৎকার জায়গায় যারা বাস করে তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি যে আদর্শ ভদ্র সন্তানের উপযুক্ত হবে না একথা অনুমান করতে খুব বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না; তবু ভীষণের মধ্যেও 'অরও-ভীষণ' আছে—তাই আফ্রিকার যোদ্ধা অধিবাসীদের মধ্যেও মাসাই জাতির নাম সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করেছে।

আজ এই মাসাইদের কথাই বলব।

পৃথিবীতে বহু ধরনের খেলা আছে, কিন্তু শিকারের মতো উত্তেজনা কোন খেলাতেই নেই। আর সব শিকারের সেরা শিকার—সিংহ-শিকার।

এই সিংহের চামড়ার লোভে দেশ-বিদেশের শিকারীরা এসে ভিড় জমায় আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে। ইউরোপ আর আমেরিকায় নিজের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় লম্বমান সিংহ-চর্মের স্বপ্ন দেখেন না এমন শিকারী নেই বললেই চলে।

কিন্তু সিংহ-শিকার সহজ নয়, তাই এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করতে গিয়ে অনেক ভদ্রলোকই আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে প্রাণ হারিয়েছেন, অথবা বিকলাঙ্গ দেহ নিয়ে ফিরে গেছেন স্বদেশে, সর্বাঙ্গে বহন করেছেন শিকারী জীবনের তিক্তস্মৃতি—বীভৎস ক্ষতচিহ্ন!

গর্জনে আকাশ কাঁপিয়ে পশুরাজ সিংহ যখন শিকারীর দিকে ছুটে আসে, তখন তার সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত হয়ে বৃত্তাকার ধারণ করে—দূর থেকে মনে হয় এক দন্ত-ভয়াল ধূসর চর্মগোলক মাটির উপর দিয়ে বিদ্যুৎ-বেগে উড়ে আসছে শূন্যকে বিদীর্ণ করে! সেই ধাবমান বিভীষিকার দেহের উপর লক্ষ্য স্থির করে গুলি চালানো অত্যন্ত কঠিন কাজ, আর একেবারে মর্মস্থানে আঘাত হানতে না পারলে আহত সিংহ ধরাশায়ী হতে চায় না—শত্রুর দেহের উপর পড়ে তাকে দাঁতে-নখে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর খেলাকে পেশা হিসাবে নিয়েছে এমন পেশাদার শিকারীও আছে। ওদেশে তাদের বলে 'হোয়াইট হান্টার' বা 'শ্বেত শিকারী'।

এই সাদা শিকারীদের সকলেই ক্ষিপ্রহস্তে গুলি চালিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারে, আক্রমণোদ্যত হিংস্র পশুর সামনে তারা কখনও আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে পড়ে না, মাত্র সাত-আট গজ দূর থেকে নির্ভুল নিশানায় গুলি চালিয়ে মারমুখী ধাবমান সিংহকে এরা মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

এহেন সাদা শিকারীরাও মাসাই যোদ্ধাদের নামে মাথার টুপি খুলে শ্রদ্ধা জানাতে লজ্জা পায় না।

নিম্নলিখিত বিবরণী পড়লেই বোঝা যাবে তাদের শ্রদ্ধা নেহাত অপাত্রে ন্যস্ত হয় নি।

একজন বিখ্যাত শ্বেত শিকারীর রোজনামচা থেকে এই কাহিনী তুলে দিচ্ছি—

"ভোর হতেই আমরা সিংহের পায়ের চিহ্ন খুঁজে বার করলাম। আগের রাত্রে সিংহ যে ষাঁড়টা মেরেছে, তার মৃতদেহ পাওয়া গেল না। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ও রক্তমাখা পায়ের চিহ্ন ধরে দশজন বর্শাধারী মোরান এগিয়ে চলল (মাসাই যোদ্ধাদের মোরান নামে ডাকা হয়)।

আমি রাইফেল হাতে তাদের অনুসরণ করলাম। আজকের শিকারে আমি দর্শক-মাত্র, মোরানরা জানিয়ে দিয়েছে আমার সাহায্য তাদের প্রয়োজন নেই।

কিছুক্ষণ পরে জানোয়ারটার সন্ধান পাওয়া গেল। ফাঁকা জায়গায় বসে সিংহ সারারাত ধরে আকণ্ঠ ভোজন করেছে, তারপর মাংসে পরিপূর্ণ উদর নিয়ে ঢুকেছে একটা ঘাসঝোপের ভিতর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে।

ঘন ঘাসঝোপের মধ্যে সিংহের সঙ্গে লড়াই চলে না। মাসাইরা ঝোপের বাইরে থেকে পাথর ছুঁড়তে লাগল। একটু পরেই শোনা গেল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অস্ফুট গর্জন—পশুরাজ ক্রোধ প্রকাশ করছে! ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, মাসাই যোদ্ধারা দ্বিগুণ উৎসাহে পাথর ছুঁড়তে শুরু করল। সেই প্রচণ্ড পাথর বৃষ্টির মধ্যে স্থির হয়ে বসে থাকা সিংহের পক্ষেও অসম্ভব; ঝোপজঙ্গল কাঁপিয়ে আমাদের থেকে প্রায় একশ' গজ দূরে পশুরাজ বেরিয়ে এল ফাঁকা জমির উপর এবং পরক্ষণেই লাফের পর লাফ মেরে পালাতে শুরু করল।

তৎক্ষণাৎ ভীষণ চিৎকার করে মাসাইরা তার পিছু নিল। লম্বা লম্বা হলুদ রং ঘাসের ভিতর দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলল দশটি দীর্ঘাকার মনুষ্যমূর্তি—শিকার হাতছাড়া করতে তারা রাজী নয়।

ছুট, ছুট, ছুট।

সিংহের স্ফীত ও শিথিল উদর সবেগে দুলতে লাগল, একবার এদিক, একবার ওদিক।

কিন্তু ভরপেট খাওয়ার পর এত ছুটোছুটি তার বেশীক্ষণ ভাল লাগল না, হঠাৎ থেমে পশুরাজ 'রণং দেহি' মূর্তিতে ঘুরে দাঁড়াল।

বর্শাধারী যোদ্ধারা সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে তাকে গোল হয়ে ঘিরে ফেলল, আর বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গর্জাতে লাগল পশুরাজ সিংহ।

সেই সচল বৃত্ত ক্রমশঃ ছোট হয়ে এল; সিংহের চেহারাও হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর। তার দুই চোখ জ্বলতে লাগল, উন্মুক্ত মুখবিবরের ফাঁকে ফাঁকে আত্মপ্রকাশ করল নিষ্ঠুর দাঁতের সারি, আর তার সুদীর্ঘ লাঙ্গুল দারুণ আক্রোশে মাটিতে আছড়ে পড়ল—একবার, দু'বার, তিনবার!

পরমুহূর্তে সিংহ আক্রমণ করল।

সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল—উড়ে এল এক ঝাঁক বর্শা সিংহের দিকে।

একটা বর্শা তার স্কন্ধ ভেদ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে এল, কিন্তু সিংহের গতি রুদ্ধ হল না, সামনে যে লোকটিকে পেল তার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। আক্রান্ত মাসাই একটুও নড়ল না, ঢালের আড়াল থেকে বর্শা বাগিয়ে প্রস্তুত হল চরম মুহূর্তের জন্য।

পরমুহূর্তে সিংহ আক্রমণ করল।

থাবার এক আঘাতে সিংহ ঢালটাকে ফেলে দিল, তারপর পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের থাবার সাহায্যে লোকটিকে টেনে আনতে চেষ্টা করল নিজের দিকে।

কিন্তু সেই শরীরী মৃত্যুর আলিঙ্গনে ধরা পড়ার আগেই মাসাই-যোদ্ধা ক্ষিপ্রহস্তে বর্শা চালিয়ে সিংহের বক্ষ ভেদ করে ফেলল, তবু শেষ রক্ষা করতে পারল না—পশুরাজের গুরুভার দেহের সংঘাতে ভূমিপৃষ্ঠে লম্বমান হয়ে পড়ে গেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম ধারাল বর্শার ফলা বুকের পিচ্ছিল মাংসপেশী ভেদ করে অন্ততঃ তিন ফুট ভিতরে ঢুকে গেছে এবং ক্ষতস্থান থেকে গল গল করে বেরিয়ে আসছে গরম রক্তের ফোয়ারা!

এমন দারুণ মার খেয়েও সিংহ পরাজয় স্বীকার করল না।

বজ্রদংশনে শত্রুর কাঁধ চেপে ধরে সিংহ পিছনের দুই থাবার সবগুলো নখ বিঁধিয়ে দিল

শত্রুর পেটে—পরক্ষণেই সনখ থাবার প্রচণ্ড আকর্ষণে বিদীর্ণ হয়ে গেল ভূপতিত যোদ্ধার উদর, রক্তাক্ত পাকস্থলীটা কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে পড়ল মাটির উপর।

বীভৎস দৃশ্য!

এবার আর বর্শা নয়—কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে দ্বি-ধার ছুরিকা খুলে যোদ্ধারা ছুটে এল এবং বারংবার আঘাত করতে লাগল সিংহের মাথায় উন্মাদের মতো।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে নাকের ডগা থেকে করোটি পর্যন্ত বিরাট কেশরযুক্ত মাথাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

মাসাইদের বিশ্বাস সিংহের সঙ্গে লড়াই-এর সময় যে-ব্যক্তি সিংহের লেজ ধরে টেনে রাখতে পারবে, সেই সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা। ব্যাপারটা বড় সহজ নয়—অন্যান্য যোদ্ধারা যখন সিংহের দেহের উপর বর্শা ও ছোরার সদ্ব্যবহার করবে, তখন একজন মাসাই সেই ক্রোধোন্মত্ত সিংহের লাঙ্গুল সজোরে টেনে রাখবে। যে-যোদ্ধা পর পর চারবার ওইভাবে সিংহের লেজ ধরতে পারে, মাসাইরা তাকে 'মেলমবুকি' উপাধি দেয়। 'মেলমবুকি' উপাধি মাসাইদের কাছে বিরাট সম্মানজনক ব্যাপার এবং এই সম্মানের লোভে বহু মোরান যুবক অকালে প্রাণ হারায়।

আমার জীবনে এমন ভয়ঙ্কর নাটকের দর্শক হওয়ার সৌভাগ্য একবার হয়েছিল, সে-কথাই বলছি।

যোদ্ধাদের দলটা বেশ বড় ছিল এবং এবারও আমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হল কোন কারণেই গুলি চালাতে পারব না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ছোট ঝোপের ভিতর সিংহের সাড়া পাওয়া গেল। মাসাই যোদ্ধারা সঙ্গে সঙ্গে ঝোপটাকে ঘিরে ফেলল।

ঝোপটা খুব ঘন ছিল না। মাসাইরা বৃত্তাকারে এগিয়ে চলল চিৎকার করতে করতে। হঠাৎ ঝোপের মাঝখান থেকে একাধিক সিংহের চাপা গর্জন শুনতে পেলাম। তারপরই দেখলাম একটা সিংহ তীরবেগে ছুটে এসে একজন মাসাইর ঢালের উপর সজোরে চপেটাঘাত করে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল এবং অন্যান্য যোদ্ধারা কিছু করার আগেই সকলের মাথার উপর দিয়ে লম্বা লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল পাশের জঙ্গলের মধ্যে। সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, কেউ হাতের বর্শা তোলার সময় পেল না।

যাই হোক, যে-লোকটি পড়ে গিয়েছিল সে আহত হয় নি, এটাই সান্ত্বনা।

ঝোপের ভিতর সিংহের চাপা গর্জন ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠল।

এগিয়ে গিয়ে দেখলাম মাসাইরা আর একটা সিংহকে ঘিরে ফেলেছে। কোণঠাসা পশুরাজ এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর থেকে থেকে গর্জে উঠছে, যেন বলতে চাইছে—'সাবধান, আর এগিও না।'

সিংহের থেকে প্রায় দশগজ দূরে মাসাইরা দাঁড়িয়ে পড়ল। পরক্ষণেই বর্শা ছুটতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে। কয়েকটা বর্শা সিংহের দেহ বিদ্ধ করে মাটিতে পড়ে গেল, কেবল একটা বর্শা দেখলাম

সিংহের পেটে গভীর হয়ে বসে গেছে। ভীষণ গর্জন করে জানোয়ারটা লাফিয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে একজন মাসাই হাতের বর্শা মাটিতে ফেলে ছুটে এসে সিংহের লম্বা লেজটা **দুই হাতের** বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল। (মাসাইরা কখনও সিংহের লেজের আগায় রোমশ অংশ হাত দেয় না তারা গোড়ার দিকটা চেপে ধরে। কারণ, সিংহ তার লেজটাকে লোহার ডাণ্ডার মতো **শক্ত করতে** পারে এবং সেই আড়ষ্ট ও কঠিন লাঙ্গুলের একটি আঘাতে ঠিকরে মাতা ধরিত্রীকে **আলিঙ্গন** না করে মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এমন বলিষ্ঠ মানুষ দুনিয়ায় আছে কি না **সন্দেহ**।)

লেজ ধরামাত্র অন্যান্য যোদ্ধারা ছোরা হাতে ছুটে এসে সিংহকে আক্রমণ করল। **এই চরম** মুহূর্তে মাসাই যোদ্ধাদের দেহে কোনও অনুভূতি থাকে না, তারা যন্ত্রের মতো আঘাত করতে **থাকে** এবং যন্ত্রের মতোই নখ ও দাঁতের আঘাত গ্রহণ করে নিজেদের শরীরের উপর—ভীষণ **উত্তেজনায়** কিছুক্ষণের জন্য তাদের শারীরিক অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়।

আমি স্বচক্ষে দেখলাম সিংহ যখন নিজেকে মুক্ত করতে পারল না, তখন পিছনের **দুই পায়ে** খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দক্ষ মুষ্টিযোদ্ধার মতো ডাইনে-বামে থাবা চালাতে শুরু করল। প্রায় **প্রতিটি** আঘাতেই তার থাবার নখগুলো একাধিক শত্রুর দেহে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করল **বটে, কিন্তু** আমি কোনও যোদ্ধার মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম না। পরে শুনেছিলাম **এই সময়** তারা বেদনা বোধ করে না।

লড়াই চলল অনেকক্ষণ ধরে—তারপর অত্যধিক রক্তপাতে অবসন্ন পশুরাজ ধীরে ধীরে **ধরাশয্যা** গ্রহণ করল।

সূর্যের আলোয় আবার ঝলসে উঠল অনেকগুলো শাণিত ছুরিকা—নিষ্ঠুর আঘাতে টুকরো **টুকরো** হয়ে গেল সিংহের বিশাল মস্তক!—সব শেষ!

আহত মাসাইদের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই চোখে পড়ল বীভৎস ক্ষত থেকে রক্ত **ঝরে পড়ছে** গল্ গল্ করে, কিন্তু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই! আমি দুজন যোদ্ধার ক্ষতস্থান ছুঁচসুতো দিয়ে **সেলাই** করে দিলাম; একজন তো কথাই বলল না, আর একজন তালুতে জিভ লাগিয়ে শব্দ করল **'সব্‌ব্'**। অর্থাৎ 'কী আপদ! সামান্য ব্যাপারে এত কেন?'

আমি বাজি ফেলে বলতে পারি যে কোনও শ্বেতাঙ্গ এই অবস্থায় পড়লে **যন্ত্রণায় পাগল** হয়ে যেত।"

মাসাই যোদ্ধাদের বর্শা খুব শক্ত হয় না। স্রোতস্বতী নদীর ধার থেকে **মাটি-মেশানো-লোহা** দিয়ে স্থানীয় কামাররা বর্শা তৈরি করে, কিন্তু সেই লোহাকে 'টেম্পার' দিয়ে **কঠিন করার বিদ্যা** তারা আয়ত্ত করতে পারে নি। জোরে আঘাত পেলে বর্শার ফলা বেঁকে যায়। **হাঁটুর উপর রেখে** অনায়াসেই ঐ বর্শাফলক বাঁকিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মাসাই যোদ্ধা ঐ বর্শা **চালিয়ে অবিশ্বাস্য** দ্রুতবেগে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। সেই আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা চোখে **না দেখলে বিশ্বাস হয় না। মাসাইদের** দক্ষতার নমুনাস্বরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। এই ঘটনাটি বলার আগে আফ্রিকার **লেপার্ড** সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা দরকার।

আফ্রিকার মতো ভারতের অরণ্যেও লেপার্ড আছে, বাংলায় তাকে চিতাবাঘ বলে ডাকা হয়। কিন্তু আফ্রিকার জঙ্গলে চিতা নামে যে জানোয়ার বাস করে, তার দেহ-চর্মের সঙ্গে লেপার্ডের কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও দেহের গঠনে আর স্বভাব-চরিত্রে চিতার সঙ্গে লেপার্ডের বিশেষ মিল নেই—চিতা এবং লেপার্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন জানোয়ার। চিতা ভীরু প্রকৃতির জীব। লেপার্ড হিংস্র, দুর্দান্ত।

জে. হান্টার, জন মাইকেল প্রভৃতি খ্যাতনামা শিকারী লেপার্ডকে আফ্রিকার সবচেয়ে বিপজ্জনক জানোয়ার বলেছেন। সিংহের মতো বিপুল দেহ এবং প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী না হলেও ধূর্ত লেপার্ডের বিদ্যুৎ-চকিত আক্রমণকে অধিকাংশ শিকারীই সমীহ করে থাকেন।

লেপার্ডের আক্রমণের কৌশল অতি ভয়ঙ্কর। লতাপাতা ও ঘাসঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে সে যখন বিদ্যুৎবেগে শিকারীর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, তখন আক্রান্ত ব্যক্তি অধিকাংশ সময়েই হাতের অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পায় না। প্রথম আক্রমণেই লেপার্ড তার সামনের দুই থাবার ধারাল নখ দিয়ে শিকারীর চোখ দুটোকে অন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া দাঁতালো চোয়ালের মারাত্মক দংশন চেপে বসে শিকারীর কাঁধে, আর পিছনের দুই থাবার নখগুলোর ক্ষিপ্র সঞ্চালনে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় হতভাগ্যের উদর।

মাসাই যোদ্ধাকে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিলেন হান্টার। [পৃ. ১৭

বিখ্যাত শিকারী জে. হান্টার একবার তিনজন বর্শাধারী মাসাই-যোদ্ধার সঙ্গে একটা লেপার্ডকে অনুসরণ করেছিলেন। জন্তুটা কয়েকদিন ধরে মাসাই পল্লীতে ছাগল মারছিল। সিংহ ক্ষুধার্ত হলেই শিকার ধরে, অকারণে সে প্রাণিহত্যা করে না। লেপার্ড শুধু হত্যার আনন্দেই হত্যা করে। মাসাই পল্লীর হানাদার লেপার্ড অনেকগুলো ছাগল মেরেছিল, কিন্তু একটিরও মাংস খায় নি।

বেশ কিছুক্ষণ পলাতক লেপার্ডের পদচিহ্ন ধরে খোঁজাখুঁজি করার পর একটা ঘাস-জঙ্গলের মধ্যে তার সন্ধান পাওয়া গেল। পায়ের দাগ দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল জন্তুটা ঐ ঘাসের জঙ্গলেই ঢুকেছে, তবে ঠিক কোথায় সে অবস্থান করছে সেটা অনুমান করা সহজ ছিল না। লেপার্ডের পরিবর্তে সিংহ হলে আন্দাজে কয়েকটা পাথর ঘাসঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে

দিলেই কাজ হতো—পশুরাজ ছুটে এসে আক্রমণ করত অথবা তার অস্তিত্ব ঘোষণা করত সগর্জনে। কিন্তু লেপার্ড অতিশয় ধূর্ত, গায়ে ঢিল পড়লেও সে চুপ করে থাকে, শিকারীকে তার অবস্থান নির্ণয় করতে দেয় না। ঘাস-জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলো পাথর ছোঁড়া হল। বৃথা চেষ্টা। লেপার্ডের সাড়া নেই।

হাণ্টার জানতেন জন্তুটা আক্রমণের সুযোগ খুঁজছে। তিনি ভেবেছিলেন ক্রুদ্ধ লেপার্ডের বিদ্যুৎ-চকিত আক্রমণ মাসাইদের বিভ্রান্ত করে দেবে, তারা বর্শা চালানোর সুযোগই পাবে না—কিন্তু সাহেব ভুল করেছিলেন, বর্শাধারী মাসাই-যোদ্ধার ক্ষিপ্রতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট।

সাহেবের নির্দেশ অনুসারে তাঁর পিছনে দু'পাশে ছড়িয়ে পড়ে তিনটি মাসাই কোমর সমান উঁচু ঘাসের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল পলাতক শ্বাপদের সন্ধানে। প্রতি পদক্ষেপেই শিকারীরা একবার থমকে দাঁড়াচ্ছিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে আবার পা ফেলছিল অতি সন্তর্পণে। ঘাস-জঙ্গলটা খুব বড় নয়, কিন্তু এইভাবে চলা বড় কষ্টকর—দারুণ উত্তেজনায় স্নায়ু যেন ছিঁড়ে পড়তে চায়।

আচম্বিত হাণ্টার সাহেবের ডানদিকে সম্মুখভাগে ঘাসের আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করল এবং লাফ দিল তাঁকে লক্ষ্য করে। সাহেব রাইফেল তোলার আগেই তাঁর ডানদিকে দণ্ডায়মান মাসাই-যোদ্ধার বর্শা শ্বাপদের দেহ বিদ্ধ করল। ঘাড় এবং কাঁধের মাঝামাঝি জায়গায় এফোঁড়-ওফোঁড় করে বর্শাটা লেপার্ডকে মাটিতে গেঁথে ফেলেছিল।

মুক্তিলাভের চেষ্টায় জন্তুটার কী আস্ফালন আর গর্জন—কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াস! এমন শক্ত আলিঙ্গনে বর্শাটা তাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলেছিল যে, প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে অস্ত্রটাকে ঝেড়ে ফেলে উঠে আসতে পারছিল না।

মাসাই-যোদ্ধা কোমর থেকে সিমি (বড় ছোরা) খুলে লাফ মেরে এগিয়ে গেল চরম আঘাত করার জন্য—তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে দিলেন হাণ্টার, 'কী সর্বনাশ! ছোরার কোপ মারলে অমন সুন্দর চামড়াটা নষ্ট হয়ে যাবে যে!'

ক্ষিপ্রহস্তে রাইফেল তুলে গুলি চালাতেই বর্শাবিদ্ধ লেপার্ডের ভবযন্ত্রণা শেষ হয়ে গেল।

মাসাইদের সাহস ও বীরত্বের কথা তো বললাম, এবার তাদের চেহারা ও অস্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দু' একটা কথা বলছি।

মাসাইদের নাক, চোখ ও মুখের গড়ন সুন্দর। কেউ কেউ মনে করেন মাসাইদের দেহে রয়েছে প্রাচীন মিশরবাসীর রক্ত।

চেহারার মতো মাসাইদের বর্শাও কিছু বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। মাসাইদের বর্শার দু' দিকেই ধারাল লোহার ফলা বসানো, মাঝখানের অংশটিতে অর্থাৎ ধরার জায়গায় কাষ্ঠদণ্ড লাগানো থাকে। ঐ ধরনের বর্শা অন্যান্য জাতির নিগ্রোরা ব্যবহার করে না। যুদ্ধ বা শিকার অভিযানে যাত্রা করার সময়ে মাসাই যোদ্ধা মাথায় উটপাখির পালক গুঁজে দেয়।

মাসাই জাতি যে কেবল হানাহানি আর মারামারি করতেই দক্ষ তা নয়, তারা অতিশয় অতিথিবৎসল এবং ভদ্র। অকারণে তারা বিদেশীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে না।

১৯৪২ সাল, ৭ই নভেম্বর।

পূর্বোক্ত তারিখে মধ্য আফ্রিকার নগানচু নামে এক ফরাসী উপনিবেশকে কেন্দ্র করে শুরু হচ্ছে আমাদের কাহিনী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নরমেধ যজ্ঞ চলছে দেশে দেশে। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার সর্বত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সেই আগুন সর্বগ্রাসী দাবানলের মতো। কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকাও রণদেবতার কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হল না।

আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল দুই মিত্রপক্ষ—ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ড। জার্মানির ফ্যাসিস্ট বাহিনী তখন ফ্রান্সে পদার্পণ করেছে, কিন্তু আফ্রিকার বুকে ছোট ছোট ফরাসী সেনাদল যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড উৎসাহে। ইংরেজ ও ফরাসীর আর এক বন্ধু আমেরিকা যানবাহন ও কলকব্জার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কিছু লোকজন পাঠিয়ে যুধ্যমান মিত্রপক্ষকে সাহায্য করছিল।

যাদের দেশের উপর এই ভয়াবহ তাণ্ডব চলছিল, সেই নিগ্রো নামধারী কালো মানুষরা কিন্তু কোন পক্ষেই যোগ দেয় নি। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দেশের সাদা মানুষরা শোষণ করেছে আর উৎপীড়ন চালিয়েছে হতভাগ্য নিগ্রোদের উপর, আজ তারা বুঝেছে সাদা মানুষ মাত্রেই কালো চামড়ার শত্রু—

অতএব আত্মকলহে দুর্বল সাদা চামড়ার মানুষগুলোকে ঘায়েল করার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।

নিগ্রোরা ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্বেতাঙ্গদের উপর।

ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি কোন শ্বেতকায় জাতিকেই তারা নিষ্কৃতি দিল না। বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ জাতির উপর হানা দিয়ে ফিরতে লাগল বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিগ্রো যোদ্ধার দল।

রক্ত আর আগুনের সেই ভয়ঙ্কর পটভূমিকায় ১৯৪২ সালের ৭ই নভেম্বর মধ্য আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশ নগানচু নামক স্থানে উত্তোলন করলাম বিস্মৃত ইতিহাসের যবনিকা।

নগানচুতে একটি ফাঁকা মাঠের উপর যেখানে ফরাসীদের সারি সারি শিবির পড়েছে, সেইখানে খুব সকালেই শিবিরের বাসিন্দাদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা গেল!

চাঞ্চল্যের কারণ ছিল—

চারজন ফরাসী সৈনিক একটি বন্দীকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে নিকটবর্তী অরণ্যের দিকে।

সেনাবাহিনীর এলাকা ছাড়িয়ে একটি গাছের কাছে তারা স্থির হয়ে দাঁড়াল।

বন্দী জার্মান নয়, স্থানীয় অধিবাসী—কৃষ্ণকায় নিগ্রো।

বন্দীর অপরাধ গুরুতর; বিগত রাত্রে সেনানিবাসের এক প্রহরীকে সে আক্রমণ করেছিল আক্রমণ সফল হয় নি। লোকটি ধরা পড়েছে।

সারারাত্রি সে ছিল বন্দী শিবিরে—আজ সকালে তার বিচার।

খুব তাড়াতাড়ি শেষ হল বিচার-পর্ব।

বন্দীর দু'খানা হাত কব্জি থেকে কেটে ফেলে ফরাসীরা তাকে মুক্তি দিলে। অবশ্য ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করে তার রক্তপাত বন্ধ করা হয়েছিল—অতিরিক্ত রক্তপাতে লোকটি যাতে মারা না যায় সেইজন্যই এই ব্যবস্থা।

আহত নিগ্রোর কণ্ঠ ভেদ করে নির্গত হল অবরুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনি।

স্খলিত চরণে সে পদচালনা করলে বনের দিকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই অরণ্যের অন্তরালে অদৃশ্য হল তার দেহ।

বন্দীর হস্তচ্ছেদন করেছিলেন মেজর জুভেনাক স্বহস্তে।

রক্তাক্ত তরবারি খাপে ঢুকিয়ে তিনি স্থান ত্যাগ করার উপক্রম করলেন, কিন্তু হঠাৎ অদূরে দণ্ডায়মান তিনটি শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের দিকে আকৃষ্ট হল তাঁর দৃষ্টি।

ঐ তিনটি মানুষের মুখের রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে ক্রোধ ও ঘৃণার অভিব্যক্তি।

মেজরের বিচার তাদের পছন্দ হয় নি!

মেজর জুভেনাক ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, "তোমরা আমেরিকার মানুষ; নিগ্রোদের সম্বন্ধে তোমাদের কোনও ধারণা নেই। লোকটিকে প্রাণদণ্ড দিলে স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনা খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যেত। কিন্তু হাতকাটা জাতভাই-এর অবস্থা দেখে ওরা ভয় পাবে, ভবিষ্যতে ফরাসীদের আক্রমণ করতে ওরা সাহস করবে না।"

জুভেনাক চলে গেলেন।

নিজের ব্যবহারের জন্য কৈফিয়ৎ দেওয়ার অভ্যাস মেজরের ছিল না। জুভেনাক অতিশয় দাম্ভিক মানুষ। কিন্তু ঐ তিন ব্যক্তি ফরাসী গর্ভনমেন্টের বেতনভোগী সৈনিক নয়, ওরা আমেরিকার নৌ-সেনা। নিকটস্থ নদীর উপর মোটর বোট এবং ছোট ছোট জলযানগুলি পরিদর্শন করার মতো

উপযুক্ত ইনজিনীয়ার বা কলাকুশলী নগানচু অঞ্চলে ফরাসীদের মধ্যে ছিল না। তারা আমেরিকার সাহায্য চেয়েছিল।

তাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশে জলযানগুলির তত্ত্বাবধান করতে এসেছিল আমেরিকার নৌ-বিভাগের তিনটি সৈনিক।

নৌ-বিভাগের অন্তর্গত তিন ব্যক্তির নাম—

মাইক স্টার্ণ, ম্যাক কার্থি এবং হ্যারিস।

পূর্ববর্ণিত রক্তাক্ত দৃশ্যের অবতারণা যেখানে হল সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল ঐ তিনজন নৌ-সেনা। মেজর প্রস্থান করতেই হ্যারিস বন্ধুদের জানিয়ে দিলে জুভেনাকের নিষ্ঠুর আচরণ তার ভাল লাগে নি।

হ্যারিসের অপর দুই বন্ধুও তাকে সমর্থন জানিয়ে বললে যে উক্ত ফরাসী মেজরের সান্নিধ্য তারা পছন্দ করছে না।

তিন বন্ধুর ভাগ্যদেবতা অলক্ষ্যে হাসলেন।

তাদের মনস্কামনা শীঘ্রই পূর্ণ হল বটে কিন্তু জুভেনাকের সান্নিধ্য থেকে মুক্তি পেয়ে তাদের মনের ভাব হয়েছিল—

'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না'...

হস্ত-ছেদন ঘটিত ভয়াবহ ঘটনার পর একটা দিন কেটে গেল নির্বিবাদে। দ্বিতীয় দিন সকালবেলা তিন বন্ধু দেখল, ফরাসীরা সাজ-সরঞ্জাম গুটিয়ে স্থান ত্যাগ করার উপক্রম করছে।

তিন বন্ধু ছুটল মেজরের কাছে—"ব্যাপারটা কি?"

মেজর জুভেনাক জানালেন, তাঁরা এই জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

তিন বন্ধুর জিজ্ঞাস্য, "তাদের কি হবে?"

জুভেনাক রূঢ়স্বরে জানিয়ে দিলেন, আমেরিকানদের তিনি ব্যক্তিগতভাবে আসতে বলেন নি, অতএব তারা কি করবে না করবে সে বিষয়ে চিন্তা করে মস্তিষ্ককে ঘর্মাক্ত করতে তিনি রাজী নন—তারা যা খুশী তাই করতে পারে।

এই প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করে জুভেনাক সসৈন্যে প্রস্থান করলেন। তিন বন্ধু নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলে—তাদের অবস্থা মোটেই আনন্দজনক নয়।

মাইক বললে, "আমরা ফাঁদে পড়েছি। নদীর বিপরীত দিকে ঘাঁটি নিয়েছে জার্মান সৈন্য আর জঙ্গলের ভিতর ওত পেতে বসে আছে নিগ্রোরা। রক্তপিপাসু ফরাসী মেজব আর শান্তিপ্রিয় আমেরিকার মানুষের মধ্যে নিগ্রো যোদ্ধারা তফাৎ খোঁজার চেষ্টা করবে না—সুযোগ পেলেই ওরা আমাদের হত্যা করবে। অতএব আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে, যে কোনও সময়েই নিগ্রোরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।"

ফরাসীদের পরিত্যক্ত শিবিরগুলো পর্যবেক্ষণ করে তারা জানতে পারল যে খাদ্য ও পানীয়ের

অভাব তাদের হবে না। প্রচুর পরিমাণে শুকনো খাদ্য জমানো রয়েছে বায়ুশূন্য টিনের পাত্রে আর আছে 'বীয়ার' জাতীয় সুরার অসংখ্য বোতল।

অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থাও খুব নৈরাশ্যজনক নয়।

কলের কামান প্রভৃতি ভারী অস্ত্র না থাকলেও রাইফেল ছিল। গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় নেই—অজস্র টোটা রেখে গেছে ফরাসী সৈন্য। তাছাড়া আছে পিস্তল, রিভলভার ও অনেকগুলো 'গ্রেনেড' বা হাতবোমা।

যে ঘরটায় খাদ্য ও পানীয় ছিল সেই ঘরে তারা তালা লাগিয়ে দিলে। সন্ধ্যার পর পানাহার শেষ করে তারা আশ্রয় গ্রহণ করলে একটা ঘরের মধ্যে।

বর্তমানে ঐ ঘরটাই হল তিন বন্ধুর 'দুর্গ'।

একটা রাত্রি ভাল ভাবেই কাটল। কিন্তু পরের দিন সকালেই হানা দিল নিগ্রো যোদ্ধার দল তিন বন্ধুর রাইফেল সশব্দে অগ্নি-উদ্‌গার করলে, কয়েকটি নিগ্রোর হত ও আহত দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর।

নিগ্রোরা পিছিয়ে গেল। একটু পরে ফিরে এসে আহত সঙ্গীদের তুলে নিয়ে আবার আত্মগোপন করল সবুজ অরণ্যের অন্তরালে। মৃত সঙ্গীদের তারা ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর জলে।

গভীর রাত্রে আবার আক্রমণ করলে নিগ্রোরা। সারারাত্রি ধরে বারবার হানা দিল নিগ্রো বাহিনী ঘরের ভিতর থেকে অনবরত গুলি চালিয়ে আর হাতবোমা ছুঁড়ে অতি কষ্টে তিন বন্ধু তাদের ঠেকিয়ে রাখল।

পূর্বদিকের আকাশে জাগল অস্পষ্ট আলোর আভাস। নিগ্রোরা আবার গা-ঢাকা দিল বনের আড়ালে। এল প্রভাত।

প্রভাতের শীতল বায়ু তপ্ত হয়ে উঠল ধীরে ধীরে, মাথার উপর জ্বলে উঠল মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য

একটা ঘরের মধ্যে বড় বড় টিনের পাত্রে জল জমিয়ে রেখেছিল ফরাসীরা। ঐ জলে তিন বন্ধু স্নান করলে, তারপর আহারপর্ব শেষ করে ফেলল চটপট। গতরাত্রে কেউ ঘুমাতে পারেনি রাত্রি জাগরণ এবং উত্তেজনার ফলে তারা হয়ে পড়েছিল অবসন্ন। মাইককে পাহারায় রেখে হ্যারিস ও ম্যাক কার্থি শয্যা গ্রহণ করলে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল গভীর নিদ্রায়

"ওঠ! ওঠ! তাড়াতাড়ি!"

চিৎকার করে উঠল মাইক স্টার্ণ।

দুই বন্ধু বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, তারপর মাইকের নির্দেশ অনুযায়ী দৃষ্টি সঞ্চালন করতেই তাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য।

বাঁকের মুখে নদীর ধারে নোঙর করেছে একটি নৌকা এবং সেই নৌকা থেকে নেমে আসছে দু'জন জার্মান সৈনিক!

তিন বন্ধু অবাক হয়ে দেখল একজন জার্মান সৈন্যের হাতে রয়েছে শ্বেত পতাকা! সন্ধির সংকেত!

হতভম্ব হয়ে পড়ল তিন বন্ধু—দুরন্ত জার্মান সৈন্যরা হঠাৎ এমন শান্তিপ্রিয় হয়ে পড়ল কেন, একথাটা তারা বুঝতে পারল না।

মাইক জার্মান ভাষা জানত। সঙ্গীদের ঘরের মধ্যে রেখে সে পিস্তল হাতে এসে দাঁড়াল জার্মানদের সামনে, কিন্তু তার জার্মান ভাষায় কথা বলার প্রয়োজন হল না।

চোস্ত ইংরেজীতে একজন জার্মান আত্মপরিচয় দিল, "আমার নাম অটো গ্যটমেয়ার। আমি জার্মান সেনাদলের এক লেফটেন্যান্ট।"

তারপর অটো যা বললে তার সারমর্ম হচ্ছে এই ঃ

ম্যাঙ্গবেটু জাতীয় নিগ্রোরা এখন আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের নির্বিচারে আক্রমণ করছে—জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, আমেরিকান প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ জাতি তাদের শত্রু এবং অবশ্য বধ্য; অতএব জার্মানি এবং আমেরিকা বৃহত্তর পৃথিবীতে পরস্পরের শত্রু হলেও এই মুহূর্তে সেই শত্রুতা ভুলে এই দুটি ছোট দল যদি এখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিগ্রোদের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ায়, তাহলে খুব শীঘ্রই নিগ্রোদের আক্রমণে উভয়পক্ষই হবে নিশ্চিহ্ন—জার্মান বা আমেরিকানদের মধ্যে একটি লোকও নিগ্রোদের রোষ থেকে রেহাই পাবে না। তাই নিতান্ত সাময়িকভাবে জার্মানীদের পক্ষ থেকে অটো সন্ধির প্রস্তাব এনেছে। তার দলের আরও চারজন সৈন্য জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, আমেরিকানরা যদি সন্ধি করতে রাজী হয় তাহলে লেফটেন্যান্টের সঙ্গী তাদের নিয়ে আসবে।

মাইক তার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে বুঝল যে, জার্মান সেনানায়কের প্রস্তাব মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

সন্ধি হল। লেফটেন্যান্টের সঙ্গী দূর অরণ্যের গোপন স্থান থেকে চারজন জার্মান সেনাকে নিয়ে এল আমেরিকানদের আস্তানায়। আপাততঃ এই জায়গাটাই উভয়পক্ষের মিলিত শিবির হল।

সন্ধির একটি বিশেষ শর্ত ছিল এই যে, কোন কারণে যদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তাহলেও একপক্ষ অপর পক্ষকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে গণ্য করতে পাবেে না।

শর্তটা উভয় পক্ষেরই মনঃপূত হয়েছিল।

সাময়িকভাবে নিজেদের শত্রুতা ভুলে দুই পক্ষ এইবার মিলিতভাবে নিগ্রোদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সন্ধ্যার আগেই শুরু হল আক্রমণ। নয়টি রাইফেল

ঘনঘন গর্জন করে অনেকগুলো কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধার হত ও আহত দেহ শুইয়ে দিল মাটির উপর।

নিগ্রোরা পিছিয়ে গেল...আবার আক্রমণ করলে...শ্বেতাঙ্গদের আস্তানার উপর এসে পড়ল ঝাঁকে ঝাঁকে বল্লম...রাইফেলের অগ্নিবৃষ্টিও বুঝি আর নিগ্রোদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে না...

শ্বেতাঙ্গরা এইবার 'গ্রেনেড' (হাতবোমা) ব্যবহার করলে। নিগ্রো যোদ্ধাদের উপর ছিটকে পড়ল কয়েকটা হাতবোমা, আগুনের ঝলকে ঝলকে ধূম এবং মৃত্যু পরিবেশিত হল চতুর্দিকে, হতাহত সঙ্গীদের ফেলে সভয়ে পলায়ন করলে বর্শাধারী কালো মানুষগুলো—বিজ্ঞানের মহিমায় স্তব্ধ হয়ে গেল অরণ্যের বন্য বিক্রম!

কেটে গেল কয়েকটি দিন আর কয়েকটি রাত। এর মধ্যে আবার আক্রমণ করেছে ম্যাঙ্গবেটু নিগ্রোরা, কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের রাইফেলের অগ্নিবৃষ্টির মুখে ব্যর্থ হয়েছে তাদের আক্রমণ। একজন জার্মান সেনা প্রাণ হারিয়েছে বর্শার আঘাতে। চারদিকে হাতবোমার সাহায্যে 'মাইন' পেতে আত্মরক্ষা করতে লাগল জার্মান ও আমেরিকান সৈন্যরা।

সেদিন প্রকাশ্য দিবালোকে দুজন নিগ্রো জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজনের অঙ্গসজ্জা দেখে শ্বেতাঙ্গরা অনুমান করল লোকটি ম্যাঙ্গবেটুদের মধ্যে প্রভাবশালী সর্দার-শ্রেণীর মানুষ; অপর ব্যক্তির একহাতে শিকলে বাঁধা পাঁচটি কুকুর, অন্যহাতে একটা চামড়ার থলি। কুকুরগুলো সাগ্রহে চামড়ার থলিটা বারবার শুঁকছে। সর্দারের হাতে একটা লাঠির আগায় সাদা কাপড় বাঁধা—সন্ধির চিহ্ন সাদা নিশান!

অটো তৎক্ষণাৎ তাদের গুলি করতে চাইল, কিন্তু মাইক বলল, "দাঁড়াও, আগে ওদের বক্তব্যটা শুনি। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।"

মাইনের মৃত্যুফাঁদ থেকে যে পথটা মুক্ত, সেই সরু রাস্তাটার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে মাইক ম্যাঙ্গবেটুদের কাছে আসতে ইঙ্গিত করল।

সর্দারের মুখে ফুটল ধূর্ত হাসির রেখা, নিশানটা সজোরে মাটির উপরে বসিয়ে দিয়ে সঙ্গীর থলি থেকে কয়েকটা রক্তাক্ত মাংসের টুকরো বার করে সে ছুঁড়ে দিল সাদা মানুষদের দিকে। সঙ্গীও শিকলের বাঁধন থেকে কুকুরগুলোকে মুক্তি দিল তৎক্ষণাৎ।

জার্মান ও আমেরিকান সৈন্যরা মাটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শয্যাগ্রহণ করল উপুড় হয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাতবোমার তারে ধাবমান কুকুরের পা লাগল। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—মুহূর্ত পরেই আরও চারটি বোমা ফাটল ভীষণ শব্দে!

শ্বেতাঙ্গরা সম্মুখে দৃষ্টিপাত করল। কুকুরগুলোর মৃতদেহ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নিগ্রো দু'জন মাইকের নির্দিষ্ট নিরাপদ পথ ধরে সতর্ক চরণে এগিয়ে আসছে।

শ্বেতাঙ্গদের সামনে এসে হোমরা-চোমরা গোছের লোকটি তার সঙ্গীকে কথা কইতে নির্দেশ দিল।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে নিগ্রোটি জানাল তার সঙ্গে এসেছে মহামান্য মবংগো! মবংগো ঐ গ্রামের জাদুকর। তার ক্ষমতা অসীম। মবংগো বলছে, সাদা মানুষরা যদি এই ঘাঁটি এখনই ছেড়ে

দিতে রাজী থাকে, তাহলে তাদের নিরাপদে যেতে দেওয়া হবে। কথা না শুনলে মবংগোর আদেশে ম্যাঙ্গবেটুরা সাদা মানুষদের হত্যা করবে। মাটির উপর ফেটে যাওয়া জিনিসগুলোকে তারা ভয় করে না, ওগুলোকে ফাঁকি দেওয়ার রাস্তা তারা দেখে নিয়েছে।

অটো মাইকের দিকে চাইল, "কি বলো? ওদের প্রস্তাবে রাজী হব?"

"অসম্ভব", মাইক বলল, "ওরা সুযোগ পেলেই আমাদের খুন করবে। বরং এখানে দাঁড়িয়ে আমরা লড়তে পারব। ঘাঁটি ছেড়ে গেলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত।"

অটো মাইকের যুক্তি মেনে নিল। তারপর নিগ্রো দোভাষীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কর্তাকে বলো—আমরা এই জায়গাতেই থাকব। কোথাও যাব না।"

দোভাষীর মুখ থেকে শ্বেতাঙ্গদের বক্তব্য শুনে দারুণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল জাদুকর মবংগো। সে থুথু ছিটিয়ে দিল অটোর মুখে!

মুহূর্তের মধ্যে খাপ থেকে পিস্তল টেনে নিয়ে পর পর দু'বার গুলি ছুঁড়ল অটো। গুলি লাগল জাদুকরের পেটে। সঙ্গীটি দারুণ আতঙ্কে হাঁ করে চেয়ে রইল সাদা মানুষদের দিকে। তার দিকে তাকিয়ে হিংস্রভাবে দাঁত বার করে গর্জে উঠল অটো, "যাও, এই হতভাগাকে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাও।"

মরণাপন্ন জাদুকরকে নিয়ে নিগ্রোটি জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল...

কয়েকটা দিন নিরুপদ্রবে কাটল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গরা তাদের পাহারা শিথিল করল না। তারা জানত ম্যাঙ্গবেটুরা সুযোগ খুঁজছে, একটু অসতর্ক হলে আর রক্ষা নেই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জার্মান আর আমেরিকানরা তাদের শত্রুতা ভুলে গেল। অলস মধ্যাহ্নে তারা তাস খেলে মুখোমুখি বসে, রাতের অন্ধকারে পাহারা দেয় বিনিদ্র নেত্রে।

ছোটখাট তুচ্ছ বিষয় থেকে অনেক সময় হয় মারাত্মক বিপদের সূত্রপাত—

মাইক যদি জানতো তার পরিচয়পত্রটি অত বড় বিপদ ডেকে আনবে, তাহলে বোধ হয় সে যত্ন করে ঐ জিনিসটিকে মালার সঙ্গে আটকে বুকের উপর ঝুলিয়ে রাখতো না।

ঐ পরিচয়পত্রের দিকে আকৃষ্ট হল কোহন নামক জনৈক জার্মান সৈনিকের দৃষ্টি।

কোহন জিনিসটা দেখতে চাইল। মালা থেকে পরিচয়পত্রটি খুলে মাইক সেটাকে কোহনের হাতে দিল। কোহনের পাশেই দাঁড়িয়েছিল আর একজন জার্মান—নাম তার হহেনষ্টিন। সঙ্গীর হাত থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে জিনিসটাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল সে, তার দুই চোখে ফুটে উঠল তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের আভাস!

হহেনষ্টিন ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "আরে, এই লোকটা দেখছি ইহুদী! ওহে কোহন—এই নোংরা শূয়রটা ইহুদী! ছি! ছি!"

(ইহুদীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করত জার্মান জাতি। হের হিটলারের নির্দেশে এই সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও আক্রোশ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল জার্মান জাতির মধ্যে।)

গালাগালি শুনে চুপ করে থাকার মতো সুবোধ ছেলে নয় মাইক স্টার্ণ—সে বাঘের মতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হহেনষ্টিনের উপর!

চোখের পলক ফেলার আগেই শুরু হয়ে গেল মারামারি!

গোলমাল শুনে সেখানে ছুটে এল জার্মান লেফটেন্যাণ্ট অটো। তার সঙ্গে সঙ্গে এল অন্যান জার্মান সৈনিক এবং মাইকের দুই বন্ধু।

মাইককে ছেড়ে দিয়ে অটোর দিকে এগিয়ে এল হহেনষ্টিন, "স্যার! এই শুয়রটা ইহুদী! আমি এইমাত্র জেনেছি!"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জে উঠল মাইক, "হ্যাঁ, আমি ইহুদী—তাতে কি হয়েছে?"

অটো বিস্মিত স্বরে বললে, "তুমি ইহুদী? আশ্চর্য! তোমাকে দেখে তো মনে হয় না যে তুমি ইহুদী!"

মাইক রোষরুদ্ধ স্বরে বললে, "ইহুদীরা কেমন দেখতে হয়? তারা কি মানুষ নয়? তোমার মতো আমারও দুটো হাত আর দুটো পা আছে।"

অটো বললে, "তা ঠিক। তবে আমরা শুনেছি ইহুদীরা ভাল লোক নয়।"

"ভুল শুনেছ", জবাব দিল ম্যাক কার্থি, "শয়তান হিটলার তোমাদের যা বুঝিয়েছে তোমরা তাই বুঝেছ। কিন্তু অটো, তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে—তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে ঐ হিটলারটা হচ্ছে পয়লা নম্বরের মিথ্যুক।"

এক মুহূর্তে সমস্ত পরিবেশ হয়ে উঠল ভয়ংকর।

জার্মানরা এসে দাঁড়াল অটোর পাশে, তাদের চোখের দৃষ্টি থেকে মুছে গেছে বন্ধুত্বের স্বাক্ষর চোয়ালের রেখায় রেখায় পাথরের কাঠিন্য।

একজন জার্মান গম্ভীর স্বরে বললে, "লেফটেন্যাণ্ট! হুকুম দাও!"

মাইকের দুই পাশে ছড়িয়ে পড়ল দুই বন্ধু।

ম্যাক কার্থি খাপ থেকে পিস্তল টেনে নিল।

রাইফেলের বাঁটের উপর চেপে বসেছে জার্মান সৈনিকের কঠিন মুষ্টি, ট্রিগারের উপর সরে এসেছে আঙ্গুল—

আবার প্রশ্ন এল জার্মান ভাষায়, "কি হুকুম? লেফটেন্যাণ্ট?"

কিন্তু অটো মূর্খ নয়।

শান্ত ভাবে চারদিকে চোখ বুলিয়ে সে বললে, "লড়াই করার মতো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু আমি লড়াই-এর হুকুম দেব না। ইহুদীরাও মানুষ, হহেনষ্টিন অন্যায় করেছে।"

লেফটেন্যাণ্টের আদেশে হহেনষ্টিন ক্ষমা চাইতে বাধ্য হল। দুই পক্ষই আবার অস্ত্র নামিয়ে নিল।

মেঘ সরে গিয়েছে, ঝড় আর উঠবে না।

অটোর ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতি রাত্রে পালা করে একজন পাহারা দেয়। আজ জার্মান সার্জ

বনামিয়েরের পালা। বনামিয়ের তার হাতঘড়ির দিকে তাকাল—এগারোটা বেজে তিরিশ মিনিট হয়েছে। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সে আরাম করতে লাগল...

হঠাৎ কার পায়ের তলায় সশব্দে ভেঙে গেল একটা শুকনো গাছের ডাল। চমকে উঠল জার্মান প্রহরী বনামিয়ের।

আবার সেই শব্দ! শুকনো গাছের ডালগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে কাদের পায়ের তলায়?

দুই চোখ পাকিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে দৃষ্টি সঞ্চালিত করতেই, বনামিয়ের দেখল তার চারপাশে অন্ধকারের বুকে ভেসে উঠেছে অনেকগুলো চলমান মনুষ্যদেহ—নিগ্রো যোদ্ধার দল!

দারুণ আতঙ্কে জার্মান প্রহরীর বুদ্ধিভ্রংশ হল, রাইফেলটাকে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো...কিছুক্ষণ পরে ভয়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে নিয়ে বনামিয়ের তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল। খুব ধীরে ধীরে সে মাটির উপর বসে পড়ল—অন্ধকারের মধ্যে তার দেহটা এখনও নিগ্রোদের দৃষ্টিগোচর হয় নি।

মাটি থেকে একটা শুকনো গাছের ডাল তুলে নিয়ে বনামিয়ের দূরে ছুঁড়ে দিল। ডালটা সশব্দে মাটির উপর পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে এল চারটে ভুতুড়ে ছায়া গাছের আড়াল থেকে!

বনামিয়ের গুলি ছুঁড়ল। তারপর পিছন ফিরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল আস্তানার দিকে। তার ধাবমান দেহের এপাশ দিয়ে ওপাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে উড়ে গেল অনেকগুলো বর্শা। বনামিয়ের একটা ঘরের খুব কাছাকাছি এসে পড়ল, আর একটু গেলেই সে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে। কিন্তু বেচারার উদ্দেশ্য সফল হল না, তার বাম উরুর উপর বিদ্ধ হল একটি বর্শা—বনামিয়ের মাটির উপরে ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে রাইফেলের শব্দে আমেরিকান আর জার্মান সৈন্যদের ঘুম গেছে ভেঙ্গে, চটপট রাইফেল নিয়ে তারা ছুটে এসেছে অকুস্থলে—নিকটবর্তী অরণ্যের ভিতর দিয়ে ঝোপঝাড় ভেদ করে আঙ্গুলের চাপে চাপে রাইফেলের মুখ থেকে ছিটকে পড়ছে তপ্ত বুলেট বৃষ্টিধারার মতো!

সেই দারুণ অগ্নিবৃষ্টির মুখে লুটিয়ে পড়ল কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধা, বাকি সবাই তাড়াতাড়ি জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। শ্বেতাঙ্গরা এবার অদৃশ্য শত্রুদের লক্ষ্য করে হাতবোমা ছুঁড়ল—ঘন জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ের ভিতর প্রচণ্ড শব্দে ফাটাতে লাগল বোমাগুলো।

নিগ্রো যোদ্ধারা পিছিয়ে গেল। অন্ধকার অরণ্যের ভিতর তাদের দেহগুলো শ্বেতাঙ্গদের চোখে পড়ল না, কিন্তু দ্রুত ধাবমান পদশব্দ তাদের জানিয়ে দিলে শত্রু এখন প্রাণ নিয়ে সরে পড়ছে।

আহত জার্মান সৈন্যের দেহটাকে ধরাধরি করে তারা একটা ঘরের ভিতর নিয়ে এল। বনামিয়েরের পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল, তার ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। বনামিয়ের তখন দারুণ যাতনায় আর্তনাদ করছে, তাকে একটা মরফিয়া ইনজেকশন দিতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল—অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্য আঘাতের যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তি পেল।

এক সপ্তাহ পরের কথা। রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে স্টার্ণ মাইক।

হঠাৎ পায়ের উপর সে অনুভব করলে তীব্র দংশন!

অস্ফুট স্বরে আফ্রিকার যাবতীয় কীটপতঙ্গকে অভিশাপ দিতে দিতে মাইক তার আহত পায়ের শুশ্রূষা করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল তার হাতের উপর উঠে পড়েছে অনেকগুলো পতঙ্গ জাতীয় জীব!

মাইক অনুভব করলে তার দুই পায়ের উপরেই কামড় বসাচ্ছে অনেকগুলো পোকা—কিছুক্ষণের মধ্যেই তার হাতের পোকাগুলোও তাকে কামড়াতে লাগল।

তাড়াতাড়ি রাইফেলের বাঁটের উপর হাতটাকে সজোরে ঘর্ষণ করে মাইক তার হাতটাকে পোকার কবল থেকে মুক্ত করে নিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিল চাঁদ।

ম্লান জ্যোৎস্নার আলোকধারার মধ্যে মাইকের দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল এক অদ্ভুত দৃশ্য!

বনের ভিতর থেকে ফাঁকা মাঠের উপর বেরিয়ে এসেছে একদল পিঁপড়ে। সেই বিপুল পিপীলিকা বাহিনীর সংখ্যা অনুমান করা অসম্ভব—কারণ মাইকের সামনে যে পিঁপড়ের সারিটা এগিয়ে এসেছে তার পিছন দিকটা এখনও অদৃশ্য রয়েছে অরণ্যের অন্তরালে!

কয়েকটা অগ্রবর্তী দলছাড়া পিঁপড়ে ইতিমধ্যেই তার পায়ের উপর উঠে কামড় বসিয়েছে। মাইকের প্রায় দশ গজ দূরে এসে পড়েছে আসল দলটা!

মাইক তাদের মিলিটারী ব্যারাকের আস্তানা লক্ষ্য করে ছুটল। মাঝে মাঝে নীচু হয়ে সে পা থেকে পিঁপড়েগুলোকে ছাড়িয়ে নিচ্ছিল। হাত দিয়ে ঘষে ঐ মারাত্মক পোকাগুলোর কবল থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না—দু'আঙ্গুলে টিপে ধরে মাইক পিঁপড়েগুলোকে টেনে আনছিল তার পায়ের উপর থেকে!

জীবজগৎ সম্বন্ধে মাইক যদি কিছু খবর রাখতো তাহলে সে জানতো যে ঐ পিঁপড়েগুলো হচ্ছে আফ্রিকার মারাত্মক "ড্রাইভার অ্যান্ট"।

এরা যেখান দিয়ে যায় সেখানে পড়ে থাকে অসংখ্য জানোয়ারের কঙ্কাল—সিংহ, লেপার্ড প্রভৃতি হিংস্র পশুও এদের মিলিত আক্রমণের মুখে অসহায়ভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়।

মাইক তার হাতের রাইফেল আওয়াজ করে নিদ্রিত সঙ্গীদের জাগিয়ে দিলে। সকলে ছুটে এসে দেখল, তাদের আস্তানা আর জঙ্গলের মাঝখানে অবস্থিত ফাঁকা জায়গাটার উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে অসংখ্য পিপীলিকার শ্রেণীবদ্ধ বাহিনী!

শ্বেতাঙ্গরা তাড়াতাড়ি পিঁপড়েগুলোর সামনে গ্যাসোলিন ছড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিলে। পিঁপড়েরা নাছোড়বান্দা—তারা জ্বলন্ত আগুনের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগল। সৈন্যরা এবার পিঁপড়ের দলের উপর গ্যাসোলিন ছড়িয়ে অগ্নিসংযোগ করলে। অনেকগুলো পিঁপড়ে অগ্নিগর্ভে প্রাণ বিসর্জন দিলে—অন্যগুলো এদিক-ওদিক সরে গেল।

আচম্বিতে নিকটবর্তী শিবিরগুলোর একটি ঘর থেকে ভেসে এল এক করুণ আর্তনাদ!

সকলেই বুঝল, ঐ কণ্ঠস্বরের মালিক হচ্ছে বনামিয়ের!

কারণ সে ছাড়া ঐ সময়ে ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না। বনামিয়ের যে ঘরে শুয়েছিল সেই ঘরের দিকে সবাই ছুটল...

বীভৎস দৃশ্য!

খাটের উপর শুয়ে ছটফট করছে আহত বনামিয়ের, তাকে আক্রমণ করেছে পিঁপড়ের দল। জীবন্ত অবস্থায় তার দেহের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ঐ ভয়ংকর কীটগুলি, ইতিমধ্যেই পিপীলিকার দংশনে তার চক্ষু হয়েছে অন্ধ—চক্ষুহীন রক্তাক্ত অক্ষিকোটরের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু পিঁপড়ে আর পিঁপড়ে!

সকলেই বুঝল, বনামিয়ের আর বাঁচবে না—হিংস্র কীটগুলো তার দেহটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, তিলে তিলে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে তার মৃত্যু হবে ধীরে ধীরে।

সৈনিক মাত্রেই মরতে এবং মারতে প্রস্তুত থাকে, মৃত্যু তাদের কাছে অতি সহজ, অতি স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ বীভৎস দৃশ্য সহ্য করা যায় না।

লেফটেন্যান্ট অটো কোহনের দিকে তাকাল, "কিছু একটা করো! লোকটা এভাবে মরবে?"

—"কি করব! কিছু করার নেই।"

—"কিচ্ছু করার নেই?"

—"না।"

অটো রিভলভারটা বনামিয়েরের মাথা লক্ষ্য করে তুলে ধরলে।

মাইক মুখ ঘুরিয়ে নিলে অন্যদিকে।

গর্জে উঠল অটোর রিভলভার—গুলি বনামিয়েরের মস্তিষ্ক ভেদ করে তাকে অসহ্য যাতনা থেকে নিষ্কৃতি দিল মুহূর্তের মধ্যে।

সকালের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পিপীলিকা বাহিনী সৈন্যদের আস্তানা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল জীবন্ত দুঃস্বপ্নের মতো। সবাই দেখল, পিঁপড়েরা শুধু বনামিয়েরের

দেহের মাংস খেয়েই সন্তুষ্ট হয় নি, তার জুতো, রিভলভারের খাপ প্রভৃতি সব কিছুই উদরসাৎ করেছে ক্ষুদে রাক্ষসের দল।

বনামিয়েরের মাংসহীন রক্তাক্ত কঙ্কালটাকে সবাই মিলে কবরস্থ করলে।

অটো বললে, "এইভাবে আমরা বেশীদিন আত্মরক্ষা করতে পারব না। যদি বাঁচতে হয় তাহলে আমাদের আক্রমণকারীর ভূমিকা নিতে হবে।"

মাইক বললে, "তুমি কি করতে চাও?"

অটোর অভিমত হচ্ছে এই যে তারা যদি ম্যাঙ্গবেটু নিগ্রোদের একটি গ্রাম অধিকার করতে পারে তবে স্থানীয় বাসিন্দারা ভীত হয়ে পড়বে, খুব সম্ভব তারা আর লড়াই করতে চাইবে না।

অটোর প্রস্তাবে সম্মত হল মাইক।

একদিন খুব ভোরে ঘন জঙ্গল ভেদ করে জার্মান ও আমেরিকানদের মিলিত বাহিনী নিকটবর্তী নিগ্রো পল্লীতে হানা দিল। এমন অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না গ্রামবাসী।

রাইফেলের ঘন ঘন গর্জন ও হাতবোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আতঙ্কের সঞ্চার করল নিগ্রো পল্লীর বুকে। ভয়ার্ত নরনারী গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে আশ্রয় নিল শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের অন্তঃপুরে।

শ্বেতাঙ্গদের মিলিত বাহিনী প্রবেশ করল নির্জন গ্রামের মধ্যে।

দু'দিন পরেই সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে শ্বেতাঙ্গদের সামনে এসে দাঁড়াল ম্যাঙ্গবেটুদের কয়েকজন প্রতিনিধি—তারা শান্তিতে বাস করতে চায়, লড়াই করার আগ্রহ তাদের আর নেই।

শ্বেতাঙ্গরা সম্মত হল। ম্যাঙ্গবেটুদের গ্রামের মধ্যে নিগ্রোদের পাশাপাশি বাস করতে লাগল জার্মান আর আমেরিকান সৈন্যদল। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জ্বলন্ত নিদর্শন!

কয়েকদিন পরে এই নাটকীয় বন্ধুত্বের রঙ্গমঞ্চে নেমে এল সমাপ্তির যবনিকা। ম্যাঙ্গবেটুদের গ্রামের কাছে নদীর বুকে আবির্ভূত হল একটি আমেরিকান সী-প্লেন বা উভচর বিমান।

মার্কিন পাইলট জার্মান এবং আমেরিকানদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান দেখে বিস্মিত হয়েছিল। মাইকের অনুরোধে বিমান-চালক জার্মানদের নিরাপদ অঞ্চলে পৌঁছে দিতে সম্মত হল। স্প্যানিশ গায়নার সীমান্তে একটি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দুই পক্ষ পরস্পরের কাছে বিদায় গ্রহণ করলে। বিদায়ের আগে মাইকের হাত চেপে ধরেছিল অটো গ্যটমেয়াব—ঘটনাচক্রে দুই শত্রুর মধ্যে গড়ে উঠেছিল বন্ধুত্বের বন্ধন, ভাগ্য তাদের সেই বন্ধুত্ব যাচাই করে নিয়েছিল অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে।

বিমানযোগে তিন বন্ধু নিরাপদে ফিরে এল মিত্রপক্ষের আস্তানায়। অটো গ্যটমেয়ার এবং অন্যান্য জার্মানদের সঙ্গে আর কোনদিন তাদের সাক্ষাৎ হয় নি।

বর্তমান কাহিনীর পটভূমি হচ্ছে একটি মালবাহী জাহাজ এবং তরঙ্গ-গর্জিত উত্তাল সমুদ্র।

সমুদ্রযাত্রাকে ভিত্তি করে যে কাহিনীটি এখানে পরিবেশিত হচ্ছে, সেটি লিখেছেন একজন খ্যাতনামা বৃটিশ ক্যাপ্টেন—ও-ব্রায়ান।

ক্যাপ্টেন সাহেব বলছেন ঘটনাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। আমরা তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারি। ও-ব্রায়ানের মতো দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত মানুষ ছাপার অক্ষরে 'গুল' মারবেন বলে মনে হয় না। ঐ সামুদ্রিক নাটকে যারা অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি আজও সশরীরে বর্তমান—তাই ক্যাপ্টেন তাঁর লেখার মধ্যে আসল নামগুলো বদলে দিয়েছেন।

তা বদলান, লোকগুলোর সঠিক কুষ্ঠি-ঠিকুজি দিয়ে আমাদের কি দরকার? আমরা গল্প শুনতে পেলেই খুশী।

আচ্ছা, এবার কাহিনী শুরু করছি—

'এক্স' জাহাজটি নেহাৎ ছোটখাট নয়, পাকা ২৫০০ টন তার ওজন। ১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে টাকামা অঞ্চলে এসে উক্ত জাহাজের ক্যাপ্টেন কয়েকজন অভিজ্ঞ নাবিকের প্রয়োজন অনুভব করলেন।

লোক নেওয়া হল।

সর্দার খালাসীর পদে নিযুক্ত হল যে লোকটি, তার চেহারাটা সত্যি দর্শনীয় বস্তু—

দেহ পেশীবহুল ও দৃঢ়, মুখ পাথরের মতো কঠিন নির্বিকার, কালো চুলে ঘেরা চওড়া কপালের নীচে একজোড়া কালো চোখের উগ্র দৃষ্টিতে রূঢ়তার প্রলেপ।

নাম তার 'ম'।

বয়স প্রায় চল্লিশ।

'ম' রূপবান ছিল না। কিন্তু পৌরুষের প্রভাবে ঢাকা পড়েছিল রূপের অভাব। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল সে। সাধারণ নাবিকরা তার প্রতি আকৃষ্ট হতো, উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাকে উপেক্ষা দেখাতে সাহস করতেন না। জাহাজের কাজকর্মে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। সে যদি তার কর্তব্য

সম্বন্ধে অবহিত থেকে নিজের কাজে মনোনিবেশ করতো তাহলে ব্যক্তিগত জীবনে সে নিশ্চয়ই উন্নতি করতে পারতো।

কিন্তু 'ম' হচ্ছে সবজান্তা মানুষ!

সব বিষয়েই সে ভাল বোঝে এবং অন্য লোকগুলো কিছুই বোঝে না, এই ছিল তার ধারণা।

এই ধারণা পোষণ করে সে যদি ক্ষান্ত থাকতো তবে কোনও অসুবিধা ছিল না, কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় মূর্খকে জ্ঞান দেওয়ার গুরুদায়িত্ব সে পালন করতো অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে!

'এক্স' জাহাজের কাজে নিযুক্ত হওয়ার পর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে আবিষ্কার করে ফেলল যে ডেকের সাদা রংটা মোটেই ভাল হয় নি!

মাস্তুলের উজ্জ্বল রংটাও অতিশয় আপত্তিজনক মনে হল, তাছাড়া অন্যান্য কলকব্জার বিন্যাস-ব্যবস্থাও তার মনঃপূত হল না।

পেন্সিল কাগজ হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে যাবতীয় দোষত্রুটির বিশদ বিবরণ লিখতে লাগল সে। অবিলম্বে এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা দরকার!

ডেকের উপর দু'জন শিক্ষানবীশ সকৌতুকে তার চালচলন লক্ষ্য করছিল, কিন্তু কোনও মন্তব্য করাব সাহস তাদের ছিল না।

'ম'-র চেহারার মধ্যে ছিল এমন এক বন্য ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যে সাধারণ মানুষ চট করে তার আচরণের প্রতিবাদ করতে সাহস পেত না।

কিন্তু জাহাজের প্রধান মেট বা দ্বিতীয় অধ্যক্ষ 'বি' খুব সাধারণ মানুষ ছিল না। সে যখন দেখল বিনা কারণে কতকগুলি পুরনো দড়ি বাতিল করে 'ম' নামধারী সর্দার-খালাসী নূতন দড়ি ব্যবহার করতে চাইছে, তখন সে বাধা দিল—

"মাল বাঁধার কাজে পুরানো দড়িতেই চলবে। নতুন দড়ি শুধু গিয়ার আর নোঙর বাঁধার কাজে ব্যবহার করা হয়। ভবিষ্যতে আমার অনুমতি ছাড়া তুমি নতুন দড়িতে হাত দেবে না।"

নতুন দড়ির ফাঁসটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল সর্দার-খালাসী—

"তুমি যদি মনে করে থাকো যে কথায় কথায় তোমার কাছে আমি অনুমতি নিতে ছুটব তাহলে তুমি ভুল করেছ।"

'ম' স্থান ত্যাগ করার উপক্রম করলে, কিন্তু তাকে বাধা দিলে 'বি', "একটা কথা শুনে যাও। ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে কথা কইতে হলে স্যার বলবে, বুঝেছ?"

বিদ্রূপ-জড়িত হাসির সঙ্গে উত্তর এল, "বুঝেছি, স্যার!"

উইলসন নামে যে শিক্ষানবীশ নাবিকটি সামনে দাঁড়িয়েছিল সে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। তার সহযোগীকে সে বললে, "নতুন সর্দার-খালাসী আর আমাদের প্রধান মেট পরস্পরকে পছন্দ করছে না। একটা গোলমাল বাধবে মনে হচ্ছে।"

উইলসনের ধারণা যে ভুল হয় নি, খুব শীঘ্রই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

কয়েকদিন পরের কথা। ঠিক সাড়ে ছয়টার সময়ে সর্দার-খালাসীর কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল প্রধান মেট 'বি'—

"ওহে সর্দার! কাল রাতে তোমাকে যে হুকুম দিয়েছিলাম আজ সকালেই তুমি সেটা ভুলে গেছ? সকাল ছয়টার মধ্যে আমি লোকজন লাগিয়ে ডেকটাকে পরিষ্কার করে রাখতে বলেছিলাম। এখন সাড়ে ছয়টা বাজে অথচ ডেক আগের মতোই ময়লা হয়ে পড়ে আছে। ওখানে একটিও লোক নেই—ব্যাপারটা কি? কাল রাতের কথা আজ সকালেই ভুলে গেলে? তোমার স্মৃতিশক্তি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে।"

'ম' ধূমপান করছিল।

সে নির্বিকার চিত্তে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, "আমি কিছুই ভুলি নি। আমার স্মৃতিশক্তি নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। আসল কথা হচ্ছে যে ঘুমটা ভাল হলে কাজটাও ভাল হয়। তাই আমি ওদের আরও ঘণ্টা দুই ঘুমানোর অনুমতি দিয়েছি। ঠিক আটটার সময়ে ওরা কাজে লাগবে।"

"তুমি অনুমতি দিয়েছ? তুমি অনুমতি দেওয়ার কে? ফের যদি তুমি 'ওপর-চালাকি' করো তাহলে তোমাকে আমি সর্দার-খালাসীর পদ থেকে খারিজ করে দেব।"

"তুমি আমায় খারিজ করবে?" সর্দার-খালাসীর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, "ওহে খোকা! যখন তুমি দোলনায় দুলতে দুলতে বোতলের দুধ খাচ্ছো তখন থেকে আমি জাহাজের কাজে লোকজন খাটাচ্ছি, বুঝলে?"

'ম' আরও যেসব কথা বলতে যাচ্ছিল সেগুলো নিশ্চয়ই 'বি'-র পক্ষে খুব সম্মানজনক হতো না, কিন্তু 'বি' তাকে আর কথা বলতে দিলো না।

সর্দার-খালাসীর চোয়ালের উপর সে প্রয়োগ করলে, মুষ্টিবদ্ধ হস্তের নিদারুণ মুষ্টিযোগ!

আচমকা ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়ল 'ম'।

প্রথমে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, তারপর বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে সে উঠে দাঁড়াল এবং ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো গর্জন করে তেড়ে এল প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে।

'ম'-র শারীরিক শক্তি ছিল 'বি'-র চাইতে অনেক বেশী।

কিন্তু 'বি' পাকা মুষ্টিযোদ্ধা, তার বাঁ হাতের বজ্রমুষ্টি বারংবার ছোবল মারল প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে।

দেখতে দেখতে 'ম'-র মুখের উপর ফুটে উঠল তপ্ত রক্তধারার বিচিত্র আলপনা।

ডেকের উপর ততক্ষণে ভিড় জমিয়েছে নাবিকের দল। 'ম'-র রক্তমাখা মুখের অবস্থা দেখে একজন মন্তব্য করলে, "সর্দার-খালাসীর হয়ে এসেছে।"

কিন্তু 'ম' 'পোড় খাওয়া' মানুষ, এত সহজে সে হার মানতে রাজী হল না।

দুই বাহু বিস্তার করে সে 'বি'-কে জড়িয়ে ধরলে এবং চোখের পলক ফেলার আগেই প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহটাকে নিক্ষেপ করলে জাহাজের ডেকের উপর!

একটা লোহার যন্ত্রের গায়ে 'বি'-র মাথাটা সজোরে ঠোক্কর খেল, দারুণ যাতনায় লুপ্ত হয়ে এল তার চেতনা।

আচ্ছন্ন অবস্থায় সে দেখতে লাগল রাশি রাশি সর্ষে ফুল!

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে 'বি' যখন উঠে দাঁড়াল, তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী মুখের রক্ত মুছতে ব্যস্ত। দুই শত্রু পরস্পরকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে, তারপর 'বি' বললে, "লড়াই শেষ হয় নি। আমরা আবার লড়ব। দু'জন সহযোগী আর একজন মধ্যস্থ এখানে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে একজন লম্বা হয়ে শুয়ে না পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চলবে—রাজী?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে 'ম' বললে, "ঠিক আছে।"

জাহাজের খালাসীরা মহা উৎসাহে কাজে লেগে গেল। বিকালের মধ্যেই ডেকের উপর দড়িদড়া লাগিয়ে একটা সুন্দর মুষ্টিযুদ্ধের 'রিং' বা আখড়া বানিয়ে ফেলল তারা।

সবাই প্রস্তুত। এবার লড়াইটা লাগলে হয়। অকস্মাৎ মূর্তিমান বিঘ্নের মতো অকুস্থলে উপস্থিত হলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে তিনি বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার? সার্কাস-টার্কাস হবে নাকি?"

মেট সমস্ত ব্যাপারটা ক্যাপ্টেনকে বুঝিয়ে বললে।

সব শুনে ক্যাপ্টেন সাহেব একটি বক্তৃতা দিলেন।

সেই দীর্ঘ বক্তৃতার সারমর্ম হচ্ছে যে ঘুষির জোরে যারা মানুষের ভ্রম সংশোধন করতে চায়, তাদের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারছেন না এবং তাঁর জাহাজে এই ধরনেব বর্বরতা তিনি বরদাস্ত করবেন না কিছুতেই।
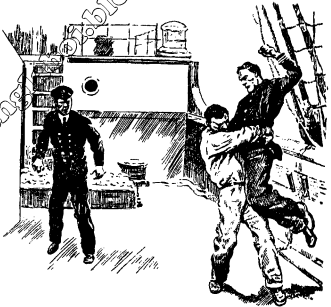
ক্যাপ্টেনেব কথার উপর কথা চলে না। লড়াই বন্ধ হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরেই জাহাজের উপর হানা দিল প্রবল ঝটিকা। ক্যাপ্টেন ডেকের উপর ছিলেন, জাহাজের একটা বৃহৎ অংশ ঝড়ের ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়ল তাঁর মাথার উপর এবং ঐ ভাঙ্গাচোরা অংশসমেত তাঁব দেহ ছিটকে পড়ল সমুদ্রের জলে।

ক্যাপ্টেনকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। উত্তাল তরঙ্গের বুকে হারিয়ে গেলেন জাহাজের প্রধান অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন 'জেড'।

অন্যান্য খালাসীরা ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। প্রধান মেট 'বি' এবং তার দুই সহকারী ভয়ার্ত নাবিকদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে প্রাণপণে যুদ্ধ করলে ঝড়ের বিরুদ্ধে।

'বি'-র উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহসে সেবার ভরাডুবি থেকে রক্ষা পেল 'এক্স' জাহাজ।

ক্যাপ্টেন তো আগেই মারা গিয়েছিলেন, এখন জাহাজ পরিচালনার ভার নেয় কে?

'বি' নিজেই এবার পোত-অধ্যক্ষ বা ক্যাপ্টেনের স্থান অধিকার করলে। জাহাজের ভাঙ্গাচোরা অংশগুলি মেরামত করে সে নাবিকদের ডাকল। সমবেত মাঝি-মাল্লাদের উদ্দেশ্য করে সে জানিয়ে দিলে, যদিও পূর্ব-নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী জাহাজের গন্তব্যস্থল ছিল 'পাগেট সাউণ্ড' নামক স্থান, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় 'এক্স' জাহাজ এখন সেখানে যাবে না।

জাহাজ যেখান থেকে সাগরে ভেসেছিল আবার সেই বন্দরেই ফিরে যাবে, অর্থাৎ জাহাজের গন্তব্যস্থল এখন পাগেট সাউণ্ড নয়—লিভারপুল।

'ম' হঠাৎ প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, মেট-এর সিদ্ধান্ত তার মনঃপূত নয় এবং 'বি' যদি তার সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাহলে সে বুঝবে নাবিকরা কেউ তাকে সমর্থন করছে না।

'বি' বললে, কারও মতামত জানতে সে এখানে নাবিকদের ডাকে নি।

তার মতামত জানানোর জন্যই সে সকলকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

নাবিকদের ভিতর থেকে একটি মূলাটো জাতীয় বর্ণ-সঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে 'বি'-কে জানাল যে সে 'ম'-র সঙ্গে একমত। জাহাজ চালানোর অভিজ্ঞতা 'বি'-র নেই, অতএব পরিচালনার ভার 'মা'-কে দেওয়া উচিত।

খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো ঘুরে দাঁড়াল 'বি', "বাঃ! ক্যাপ্টেনের মৃত্যুর জন্য তুমিই তো দায়ী, এখন আবার লম্বা বক্তৃতা ঝাড়ছো?"

সমবেত নাবিকমণ্ডলী চমকে উঠল—এ আবার কি কথা?

'বি' আবার বললে, "ভেবেছিলুম কিছু বলব না। কিন্তু তুমি যখন মুখ খুলেছ তখন সত্যি কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি। জাহাজের চাকা ঘোরানোর ভার ছিল তোমার উপর—ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে ছিলেন তোমার পাশে। তুমি যদি চাকা ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে না যেতে তাহলে হয়তো ক্যাপ্টেনের মৃত্যু হত না। ভীরু! কাপুরুষ! নিজে দোষ করে আবার বড় বড় কথা কইতে লজ্জা করে না! হ্যাঁ, তোমার সঙ্গীদের একটা কথা জানিয়ে দেওয়া দরকার—এখন থেকে তুমি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাবিক, প্রথম শ্রেণীর থেকে তোমাকে আমি খারিজ করলুম। এখন তুমি অনেক কম টাকা পাবে আর বন্দরে পৌঁছেই তোমার নামে আমি নালিশ জানাব।"

মূলাটো গজগজ করতে করতে চলে গেল।

'বি'-র সহকারী ব্যাপারটা পছন্দ করলে না।

বর্ণ-সঙ্কর মূলাটোটা পাকা গুণ্ডা, ইতিপূর্বে একটি লোককে সে ছোরা মেরেছিল।

'বি' অবশ্য এই ধরনের লোককে পরোয়া করে না।

ছোরাছুরির ভয়ে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার মতো মেরুদণ্ডহীন মানুষ সে নয়।

কিছুদিন পরে হল আর একটি দুর্ঘটনার সূত্রপাত।

একজন নাবিক হঠাৎ ডেকের উপর থেকে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। তাকে উদ্ধার করার জন্য নৌকা নামাতে গিয়ে নাবিকরা দেখলো, নোঙর তোলার জন্য যে কাষ্ঠ-আধারটা ব্যবহার করা হয় সেটা যথাস্থানে নেই। কোনও রকমে ব্যবস্থা করে লোকটাকে সলিল সমাধি থেকে উদ্ধার করা হল বটে কিন্তু বেশ দেরি হয়ে গেল। ইতিমধ্যে হিংস্র সামুদ্রিক পক্ষীর আক্রমণে লোকটির হাত এবং মুখ হয়ে গেছে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত।

'ম' বললে, যে লোকটি জলে পড়েছিল তার দুর্দশার জন্য দায়ী 'বি', কারণ তার আদেশেই ঐ নোঙরগুলো খুলো ফেলা হয়েছিল। শুধু ঐটুকু বলে সে চুপ করলে না, তার আশেপাশে সমবেত নাবিক-বন্ধুদের সে বোঝাতে লাগল যে 'বি' মোটেই অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়।

'ম'-র বক্তব্যের মধ্যে যুক্তির অভাব থাকলেও বিদ্রূপের অভাব ছিল না কিছুমাত্র।

'বি' একটু দূরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। 'ম'-র উচ্চকণ্ঠের মন্তব্যগুলি খুব সহজেই তার শ্রবণপথে প্রবেশ করছিল। সে বুঝল, নাবিকদের উপলক্ষ্য করে 'ম' কথাগুলো তাকেই শোনাতে চাইছে।

'বি' সামনে এসে 'ম'-কে সম্বোধন করে বললে, "শোনো 'ম', আজ থেকে তুমি আর খালাসীদের সর্দার নও। তোমাকে আমি সর্দারের পদ থেকে খারিজ করে সাধারণ মাল্লার পদে বহাল করলুম। তোমার মাইনেও কমে গেল।"

'ম'-র মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল, দুই হাতের মুঠি পাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "আমার কাজ আমি জানি। তুমি আমাকে খারিজ করবার কে? তোমার হুকুম আমি মানতে রাজী নই।"

'বি'-র কণ্ঠস্বরেও জাগল রোষের আভাস, "আমার কথা না শুনলে তোমার হাতে আমি হাতকড়া লাগাব।"

"সত্যি?" হা-হা শব্দে হেসে উঠল 'ম', "একবার চেষ্টা করে দ্যাখো।"

'বি'-র আদেশে তার সহকারী একটা হাতকড়া নিয়ে এল কেবিন থেকে।

একজন মাল্লা হঠাৎ বলে উঠল, "ওহে মিস্টার! 'ম'-র সঙ্গে বেশী চালাকি করার চেষ্টা করলে তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব না।"

"বাঃ! বাঃ!" ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সেই বর্ণ-সঙ্কর মূলাটো, "চমৎকার! চমৎকার! ভাইসব— আমরা থাকতে ঐ খোকাটা আমাদের সর্দারকে অপমান করবে? ডাণ্ডাগুলো একবার নিয়ে এসো দেখি, বুড়ো খোকাকে ঠাণ্ডা করার দাওয়াই আমি বাতলে দিচ্ছি।"

''সাবধান!'' গর্জে উঠল 'বি', সাঁৎ করে পকেট থেকে সে টেনে আনল একটা চকচকে রিভলভার, ''তোমাকে গুলি কবে মারলে আমার কোনও শাস্তি হবে না। আইন আমার পক্ষে, সমুদ্রের বুকে জাহাজের উপর বিদ্রোহের চেষ্টা আইনের চোখে গুরুতর অপরাধ। বিদ্রোহীকে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর গুলি করাব অধিকার আছে। অতএব সাবধান!''

সত্যি কথা। মূলাটোর উচ্চকণ্ঠ তৎক্ষণাৎ নীরব হল।

'বি'-র সহকারী ততক্ষণে হাতকড়া নিয়ে এসেছে।

হাতকড়াটা সহকারীর হাত থেকে নিয়ে 'বি' সেটাকে ডেকের উপর ছুঁড়ে দিলে, ''নাও, এবার ঐ হতভাগা 'ম'-র হাতে তোমবা লোহার বালা পরিয়ে দাও চটপট।''

সামনে এগিয়ে এল এক জোয়ান খালাসী, 'বি'-র চোখের উপর চোখ রেখে সে বললে, ''হ্যাঁ, চটপট করছি।'' পরক্ষণেই এক লাথি মেরে সে হাতকড়াটাকে পাঠিয়ে দিলে জাহাজের নর্দমার মধ্যে। প্রকাশ্য বিদ্রোহ!

'বি' তার চওড়া কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে বললে, ''বেশ, তোমরা যা খুশী করো। তবে একটা কথা জেনে রাখো, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা 'ম'-র হাতে হাতকড়া না লাগাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কেউ তামাক কিংবা সিগাবেট পাবে না। আমার আদেশ পালন না করলে ধূমপান বন্ধ, বুঝলে?''

'বি' তার নিজের কেবিনে ফিরে এল।

তিন দিনের মধ্যেই অবস্থা গুরুতর হয়ে পড়ল।

'বি'-র সহকারী শিক্ষানবীশ ছেলেটিকে সবাই মিলে এমন প্রহার করলে যে ছেলেটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

খবর পেয়ে লাফিয়ে উঠল 'বি', ''শয়তানগুলোকে ভালভাবে শিক্ষা দিতে হবে।''

'বি' সোজা এসে ঢুকল ভাঁড়ার ঘরে।

একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল বিদ্রোহী মাল্লার দল, তাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলে, ''কি করতে চাও মিস্টার?''

''বলছি, একটু অপেক্ষা করো।'' জাহাজের রাঁধুনিকে ভাঁড়ার ঘর থেকে বাইরে এনে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলে 'বি', ''যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা 'ম'-র হাতে হাতকড়া না লাগাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। ভাঁড়ার ঘর আর রান্নাঘর আমি তালা লাগিয়ে বন্ধ করে দিলুম।''

সমবেত জনতার কণ্ঠে জাগল হিংস্র গর্জন-ধ্বনি।

সাঁ করে উড়ে এসে একটা কাঠের ডাণ্ডা 'বি'-র মাথা ঘেঁষে দরজার উপর সশব্দে আছড়ে পড়ল, একটুর জন্য সে বেঁচে গেল।

বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে রিভলভার বার করলে 'বি'।

রিভলভার দেখে বিদ্রোহী নাবিকদের আক্কেল-গুড়ুম হয়ে গেল। চটপট পা চালিয়ে তারা সরে

পড়ল 'বি'-র সামনে থেকে। 'বি'-র ওষ্ঠাধরে জাগল তিক্ত হাসির রেখা, "গরম গরম গুলি খেতে বোধহয় তোমাদের ভাল লাগবে না, কি বলো?"

তারপব পিছন ফিরে সে অকুস্থল ত্যাগ করলে।

তাব সঙ্গ নিলে দু'জন সহকারী।

সেদিন সন্ধ্যার পরেই আকাশের অবস্থা হয়ে উঠল শোচনীয়। ঘন মেঘের কালো ছায়া হানা দিল আকাশের গায়ে, অন্ধকার শূন্যে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে হেঁকে উঠল বজ্র—গর্জিত বাতাসের সঙ্গে নাচতে নাচতে নেমে এল প্রবল বৃষ্টিধারা।

খালাসীরা কিন্তু কেউ জাহাজ রক্ষা করতে এগিয়ে এল না। 'বি' তার দুই সহকারীর সাহায্যে পালগুলো নামিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

আচম্বিতে ছুটে এল কয়েকটা কাঠের ডাণ্ডা 'বি'-র দিকে। একটা ডাণ্ডা 'বি'-র পেটে লাগতেই তার হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে পড়ল। তৎক্ষণাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে ছুটে এসে 'ম' রিভলভারটা তুলে নিয়ে 'বি'-র দেহ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। নিশানা ব্যর্থ হল, 'বি' লম্বা দৌড় মারল তার কেবিনের দিকে। তার পিছনে তাড়া করে ছুটে এল ক্ষিপ্ত মাল্লার দল।

'বি'-র দুই সহকারী এবার রঙ্গ মঞ্চে ভূমিকা গ্রহণ করলে।

একজন এগিয়ে এসে জনতাকে লক্ষ্য করে রিভলভার ছুঁড়ল। একটা কাতর আর্তনাদ ভেসে এসে জানিয়ে দিল রিভলভারের গুলি লক্ষ্যভেদ করেছে।

হঠাৎ অন্ধকারের বুকে বিদ্যুৎ হেনে উড়ে এল একটা মস্ত ছোরা। চিৎকার করে উঠল 'বি'-র একজন সহকারী—ছোরাটা তার কাঁধের উপর বসে গেছে।

আহত ছেলেটির অবশ হাত থেকে রিভলভারটা টেনে নিয়ে 'বি' দু'বার গুলি চালাল। জাহাজের অন্ধকাব গহ্বর থেকে কাতর আর্তস্বর জেগে উঠে জানিয়ে দিলে গুলি যথাস্থানে পৌঁছে গেছে।

মাঝি-মাল্লারা ক্ষেপে গেল। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তারা ছুঁড়তে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে কাঠের ডাণ্ডা আর লোহার টুকরো।

'বি' তার দুই সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে 'চার্টরুমের' ভিতর ঢুকে দরজায় ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে দিলে।

বন্ধ দরজার উপর পড়তে লাগল আঘাতের পর আঘাত, কিন্তু ওক কাঠের শক্ত দরজা অত সহজে ভাঙ্গা সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে নূতন বিপদের সূত্রপাত।

জাহাজের উপর আছড়ে পড়ছে ক্ষিপ্ত ঝটিকা এবং তার তলদেশে আঘাত হেনে লাফিয়ে উঠছে তরঙ্গ-বন্ধুর উত্তাল সমুদ্র।

চালকবিহীন জাহাজের তখন যায় যায় অবস্থা, এখনই বুঝি ভরাডুবি হয়।

বিপদের গুরুত্ব বুঝে মাল্লারা লড়াই থামিয়ে জাহাজ বাঁচাতে ছুটল।

কিছুক্ষণ পরেই আবার করাঘাতের শব্দ বেজে উঠল বন্ধ দরজার গায়ে, একজন নাবিক আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "মিঃ বি—দরজা খোলো। জাহাজ প্রায় ডুবতে বসেছে। তুমি তাড়াতাড়ি এস।"

উদ্যত রিভলভার হাতে 'বি' দরজা খুলল।

জলসিক্ত দেহে নাবিকটি চেঁচিয়ে উঠল, "তাড়াতাড়ি এস, জাহাজ ডুবছে!"

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে।

'বি' শান্তস্বরে বললে, "আমি কি করব? তোমাদের সর্দারের কাছে যাও।"

"সে হতভাগা জাহাজ চালাতে জানে না। এতক্ষণ ধরে সে উলটো-পালটা হুকুম চালিয়ে জাহাজটাকে ডোবাতে বসেছে। তুমি ছাড়া কেউ এখন জাহাজ বাঁচাতে পারবে না—তাড়াতাড়ি চলো।"

'বি'-র প্রধান সহকারী এগিয়ে এল, কিন্তু 'বি' বাধা দিলে, "না। আগে এই লোহার বালা দুটো নিয়ে যাও"—

টেবিলের টানা খুলে 'বি' একজোড়া হাতকড়া তুলে ধরলে, "ঐ হতভাগা 'ম' আর ছুরিমারা গুণ্ডা মূলাটোকে আগে বন্দী করে নিয়ে এস। আমার আদেশ পালিত না হলে আমি জাহাজের ভার গ্রহণ করব না।"

একটানে হাতকড়া দুটো ছিনিয়ে নিয়ে নাবিকটি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই একদল নাবিক ঘরে প্রবেশ করলে, তাদের সঙ্গে রয়েছে 'ম'! তার দুই হাতে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে হাতকড়া!

'বি' বললে, "আর একজন কোথায়? ঐ মূলাটো গুণ্ডা—তার কি হল?"

একজন নাবিক বললে, "পাজিটা ছুরি বার করেছিল স্যার।"

"হুঁ, তারপর?"

'ইয়ে, মানে...ছুরিটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমরা...মানে...ইয়ে''...

'বি' ধমক দিলে, ''স্পষ্ট করে বল কি বলতে চাও?''

''ইয়ে, মানে—ঝটাপটি করতে করতে মূলাটোটা হঠাৎ কেমন করে জলে পড়ে গেল।''

বাঁচা গেল।

'বি' আর জেরা করলে না। সে বুঝল, যেভাবেই হোক গুণ্ডাটা সমুদ্রগর্ভে সমাধিলাভ করেছে। সে দরজা খুলে বাইরে এসে জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াল।

'এক্স' জাহাজ সে যাত্রা বেঁচে গেল।

'বি'-র নির্দেশ অনুযায়ী প্রাণপণে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে মাল্লারা জাহাজটাকে রক্ষা করলে ক্ষিপ্ত সমুদ্রের গ্রাস থেকে।

জাহাজ নিরাপদে পৌঁছে গেল তার নিজস্ব বন্দরে।

সর্দার-খালাসী 'ম'-কে গ্রেপ্তার করে বিচারকের সামনে উপস্থিত করা হল। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির অভিযোগ।

বিচারে অবশ্য তার শাস্তি হয় নি, উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা গেল না। বিচারক তাকে ছেড়ে দিলেন।

তবে আদালতের দরবারে শাস্তি না পেলেও 'বি'-র হাতে যথেষ্ট নিগ্রহ এবং অপমান ভোগ করেছিল 'ম'।

সবজান্তা মানুষটির মানসপটে শুষ্ক ক্ষতচিহ্নের মতো চিরকাল জেগে থাকবে সেই লাঞ্ছনার ইতিহাস।

"হুঁ, তুমি! তোমার নাম ম্যাকফারলেন?"

মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন মিঃ স্কেটন।

তাঁর সামনে যে অপরূপ মূর্তিটি দাঁড়িয়েছিল, তার চেহারাটা সত্যি দর্শনীয় বস্তু। রোগাও নয়, মোটাও নয়, লম্বা একহারা শরীর, মাথা ভর্তি আগুনের মতো লাল টকটকে ঝাঁকড়া চুল, চুলের নীচে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ ছাড়া মুখের কোন অংশ দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ চোখ দুটি ছাড়া লোকটির সমস্ত মুখের উপর বাঁধা আছে পুরু কাপড়ের আস্তরণ বা 'ব্যাণ্ডেজ'।

মিঃ স্কেটনের প্রশ্নের উত্তরে আগন্তুক বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম মাকফারলেন।"

স্কেটন বললেন, "তোমার কথা আমি শুনেছি। তুমি নাকি জেল খেটেছ? যাই হোক, ভালভাবে যদি বাঁচতে চাও আমি তোমাকে সুযোগ দিতে পারি। হুঁ, আর একটা কথা—পাথর ভাঙ্গার কাজ সম্পর্কে তোমার কোন অভিজ্ঞতা আছে?"

পুরু কাপড়ের তলা থেকে ভেসে এল অস্ফুট হাস্যধ্বনি, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, পাথর ভাঙ্গার কাজই তো করেছি।"

ম্যাকফারলেন তার জামা গুটিয়ে ডান হাতখানা তুলে ধরলে মিঃ স্কেটনের সামনে—মিঃ স্কেটন দেখলেন তার বাহু বেষ্টন করে ফুলে উঠেছে দড়ির মতো পাকানো মাংসপেশী!

স্কেটন মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু বুঝলেন ঐ হাতের মালিক অসাধারণ শক্তির অধিকারী।

ম্যাকফারলেন বললে, "শুধু পাথর ভাঙ্গা নয়, আমি—" একটু থেমে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল স্কেটনের দিকে, "আমি ভাল লড়াই করতেও জানি।"

"বেশ, বেশ," স্কেটন বললেন, "তোমার মুখখানা দেখে সে কথাই মনে হচ্ছে আমার। অত বড় একটা ব্যাণ্ডেজ কেন বাঁধতে হয়েছে সে কথা আমি জানতে চাইব না, আমি শুধু বলব— ম্যাকফারলেন! যদি ভালভাবে বাঁচতে চাও তবে তোমাকে সেই সুযোগ দিতে আমার আপত্তি নেই। তোমাকে আমি কাজে বহাল করলুম। এখন যাও।"

ম্যাকফারলেনের দুই চোখ ঝকঝক করে উঠল, হাত তুলে সে মিঃ স্কেটনকে অভিবাদন জানাল, তাবপর তার দীর্ঘ দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁবুর দ্বারপথে।

উত্তর ক্যানাডার দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও ঝোপঝাড় ভেঙ্গে তৈরী হচ্ছিল একটা পথ। যে দলটা ঐ রাস্তা তৈরীর কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, মিঃ স্কেটন সেই দলের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

পাথর ভেঙ্গে রাস্তা তৈরীর কাজ করতে যে লোকগুলো এগিয়ে এসেছিল, তারা বিলক্ষণ কষ্টসহিষ্ণু—তবে দলের সবাই যে খুব শান্তশিষ্ট ভাল মানুষ ছিল তা নয়। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা মাঝে মাঝে লাগত। মিঃ স্কেটন জানতেন ওটুকু সহ্য করতেই হবে। দারুণ ঠাণ্ডার মধ্যে পাথর ভেঙ্গে যারা জীবিকা নির্বাহ করতে এসেছে, তাদের কাছে একেবারে শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার আশা করা যায় না। তবু যথাসম্ভব গোলমাল এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন মিঃ স্কেটন। তাই যেদিন তিনি শুনলেন ম্যাকফারলেন নামে একজন জেলখাটা কয়েদী তাঁর কাছে কাজ চাইতে এসেছে, সেদিন তিনি একটু অস্বস্তিবোধ করলেন। অবশ্য মিঃ স্কেটন জানতেন অপরাধীকে ভালভাবে বাঁচার সুযোগ দিলে অনেক সময় তার চরিত্র সংশোধিত হয়—স্বভাব-দুর্বৃত্তদের কথা অবশ্য আলাদা, তারা সুযোগ পেলেই সমাজবিরোধী কাজকর্ম অর্থাৎ চুরি ডাকাতি খুন প্রভৃতি দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু ম্যাকফারলেনের কথাবার্তা শুনে স্কেটনের মনে হল লোকটি স্বভাব-দুর্বৃত্ত নয়, ভালভাবে বাঁচার সুযোগ পেলে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সে কুণ্ঠিত হবে না। সেইজন্যই ম্যাকফারলেনকে কাজে বহাল করলেন মিঃ স্কেটন।

স্কেটনের অনুমান ঠিক হয়েছিল কিনা জানতে হলে পরবর্তী ঘটনার বিবরণ জানা দরকার। সে কথাই বলছি...

ম্যাকফারলেন যখন মিঃ স্কেটনের কাজে বহাল হল, তখন শীতের মাঝামাঝি। আবহাওয়া খুবই কষ্টকর। ক্যানাডা অঞ্চলে শীতকালে ঝড় হয়। ঝড়বৃষ্টির জন্য অনেক সময় সাময়িকভাবে কাজকর্ম বন্ধ রাখা হত। রাস্তা তৈরীর কাজে যে লোকগুলো নিযুক্ত হয়েছিল তারা সেই সময় ভিড় করত ব্যায়ামাগারের মধ্যে। ব্যায়ামাগারটি তৈরী করে দিয়েছিলেন মিঃ স্কেটন দলের লোকদের জন্য। নানা ধরনের খেলা হত সেখানে। তবে দলের লোকদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিল 'বক্সিং' বা মুষ্টিযুদ্ধ। স্কেটনের দলভুক্ত শ্রমিক ছাড়া অন্যান্য লোকজনও আসতো মুষ্টিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে।

সেদিন রবিবার। ব্যায়ামাগারের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধের আসর জমছে না। লাল পোশাক গায়ে চড়িয়ে দস্তানা পরিহিত দুই হাত তুলে সগর্বে পদচারণা করছে একটি বলিষ্ঠ মানুষ এবং চারপাশে দণ্ডায়মান জনতার দিকে তাকিয়ে গর্বিত কণ্ঠে 'চ্যালেঞ্জ' জানাচ্ছে বারবার। কিন্তু তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে

এগিয়ে আসছে না কোন প্রতিযোগী—এর আগে যে কয়জন তার সামনে মোকাবেলা করতে এসেছিল তারা সবাই বেদম মার খেয়ে কাবু হয়ে পড়েছে।

লোকটি শুধু শক্তিশালী নয়, মুষ্টিযুদ্ধের কায়দাও সে ভালভাবেই আয়ত্ত করেছে—সে পাকা 'বক্সার'।

"আমি লড়তে রাজী আছি", জনতার ভিড় ঠেলে একটি দীর্ঘকায় মানুষ সামনে এগিয়ে এল, তার মাথার উপর লটপট করছে রাশি রাশি আগুন রাঙ্গা চুল আর ওষ্ঠাধরে মাখানো রয়েছে ক্ষীণ হাসির রেখা—ম্যাকফারলেন!

রক্তকেশী নবাগতকে সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানাল সমবেত জনতা—

"দস্তানা লাগাও। ওর হাতে মুষ্টিযুদ্ধের দস্তানা লাগিয়ে দাও।"

ম্যাকফারলেনের উন্মুক্ত পুরোবাহুর (forearm) দিকে দৃষ্টিপাত করলে মুষ্টিযোদ্ধা—দড়ির মতো পাকানো মাংসপেশীগুলি তার একটুও ভাল লাগল না।

নীরস কণ্ঠে মুষ্টিবীর জানতে চাইল, "ইয়ে—তুমি—তুমি কি বলে—মানে, বক্সিং লড়তে জানো তো?"

"না, জানি না," ম্যাকফারলেন উত্তর দিলে, "তবে শিখতে দোষ কি? আজ থেকে তোমার কাছেই বক্সিং শিখব।"

লড়াই শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই বুঝল, ম্যাকফারলেন শক্তিশালী মানুষ বটে, কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধে সে একেবারেই আনাড়ি, তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বজ্রমুষ্টি তার মুখে ও দেহে আছড়ে পড়ল বারংবার—কোন রকমে দুই হাত দিয়ে আত্মরক্ষা করতে লাগল ম্যাকফারলেন। কয়েকটি মার সে বাঁচাল বটে কিন্তু পাকা মুষ্টিযোদ্ধার সব আঘাত সে আটকাতে পারল না। তার মুখের উপর দেহের উপর আছড়ে পড়তে লাগল ঘুষির পর ঘুষি।

জনতা ঐ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারছিল না, কয়েকজন চিৎকার করে উঠল, "ওহে বোকারাম, হাত চালাও, শুধু শুধু দাঁড়িয়ে মার খাও কেন?"

জনতার চিৎকারে কর্ণপাত করলে না ম্যাকফারলেন, অন্যান্য মুষ্টিযোদ্ধার মতো সরে গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টাও সে করলে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সে দু'হাত দিয়ে ঘুষি আটকাতে লাগল এবং আঘাতের পর আঘাতে হয়ে উঠল জর্জরিত।

আচম্বিতে ম্যাকফারলেনের বাঁ হাতের মুঠি বিদ্যুদ্বেগে ছোবল মারল প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে! প্রতিদ্বন্দ্বী মুষ্টিবীর মাটির উপর ঠিকরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল!

একটি ঘুষিতেই লড়াই ফতে!

তীব্র উল্লাসে চিৎকার করে জনতা ম্যাকফারলেনকে অভিনন্দন জানাল। সেই মুহূর্তে তার নূতন নামকরণ হল—'রেড' অর্থাৎ লাল। লাল চুলের জন্যই ঐ নাম হয়েছিল তার। আমরাও এখন থেকে ম্যাকফারলেনকে 'রেড' নামেই ডাকব।

সন্ধ্যার পরে নিজের ঘরে বসে ধূমপান করছিলেন মিঃ স্কেটন। হঠাৎ সেখানে উর্ধ্বশ্বাসে

ছুটে এল একটি শ্রমিক। শ্রমিকটি জানাল তাদের দলভুক্ত একটি অল্পবয়সী ছেলেকে দলেরই একজন লোক স্নানের চৌবাচ্চার মধ্যে ঠেসে ধরেছিল, ছেলেটি ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, মিঃ স্কেটনের এখনই একবার আসা দরকার।

স্কেটন তাড়াতাড়ি ছুটলেন। অকুস্থলে গিয়ে তিনি দেখলেন, একটি অল্পবয়সী কিশোর শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে—তার দেহে কোন বস্ত্রের আচ্ছাদন নেই, ভয়ে তার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে।

স্কেটন তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে বিছানায় শুইয়ে উপযুক্ত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করলেন। ছেলেটির 'নিউমোনিয়া' হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, স্কেটনের যত্নে সেই যাত্রা সে বেঁচে গেল।

পূর্বোক্ত ঘটনার চার দিন পরে স্কেটনের ঘরে আবির্ভূত হল এক বিপুল বপু পুরুষ। লোকটির মস্ত বড় শরীর ও রুক্ষ মুখ চোখ দেখলেই বোঝা যায় মানুষটি খুব শান্তশিষ্ট নয়।

লোকটি স্কেটনের বেতনভোগী শ্রমিক। তার দুর্দান্ত স্বভাবের জন্য স্কেটন তাকে পছন্দ করতেন না।

আগন্তুক কর্কশ স্বরে বললে, "মিঃ স্কেটন, দেখুন হতভাগা রেড আমার কি অবস্থা করেছে।"

মিঃ স্কেটন দেখলেন লোকটির দুই চোখের পাশে ফুটে উঠেছে আঘাতের চিহ্ন।

স্কেটন বললেন, "রেড তোমাকে মারল কেন?"

খুব মোলায়েম স্বরে লোকটি বললে, "আমি কিচ্ছু করি নি স্যার। হতভাগা রেড হঠাৎ এসেই আমাকে দু'ঘা বসিয়ে দিল। আমি স্যার ঝগড়াঝাঁটি পছন্দ করি না। আমি আপনার কাছে নালিশ জানাতে এসেছি।"

স্কেটন অবাক হয়ে ভাবলেন যে মানুষ চিরকালই দুর্বিনীত ও দুর্দান্ত স্বভাবের পরিচয় দিয়ে এসেছে, সে হঠাৎ আজ আঘাতের পরিবর্তে আঘাত ফিরিয়ে না দিয়ে শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকের মতো জানাতে এল কেন?

মুখে বিস্ময় প্রকাশ না করে স্কেটন বললেন, "তুমি যাও। যদি রেড দোষ করে থাকে আমি তাকে শাস্তি দেব।"

অনুসন্ধান করে আসল খবর জানলেন মিঃ স্কেটন। সমস্ত ঘটনাটা হচ্ছে এই—

ঐ 'ঝগড়াঝাঁটি পছন্দ না করা' লোকটি কয়েকদিন আগে অল্পবয়সী ছেলেটিকে জলের মধ্যে

চেপে ধরেছিল। দলের শ্রমিকরা ব্যাপারটা পছন্দ করে নি, কিন্তু সাহস করে কেউ প্রতিবাদ জানাতে পারে নি। ঐ লোকটা ছিল পয়লা নম্বরের ঝগড়াটে, আর তার গায়েও ছিল ভীষণ জোর—তাই সবাই তাকে ভয় করতো যমের মতো।

অকুস্থলে ম্যাকফারলেন উপস্থিত ছিল না। পরে সমস্ত ঘটনাটা যখন সে সহকর্মীদের মুখ থেকে জানল, তখনই সে ঝগড়াটে লোকটির কাছে কৈফিয়ৎ চাইল। ফলে মারামারি। রেডের হাতে মার খেয়ে 'শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকটি' স্কেটনের কাছে অভিযোগ করতে এসেছিল।

সব শুনে স্কেটন বললেন, "রেড যা করেছে, ভালই করেছে।"

এক রাতে স্কেটন যখন শুতে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন, সেই সময় তাঁর সামনে কাঁচুমাচু মুখে এসে দাঁড়াল রেড।

স্কেটন প্রশ্ন করলেন, "কি হয়েছে?"

রেড একটু হাসল, বোকার মতো ডান হাত দিয়ে বাঁ কানটা একটু চুলকে নিল, তারপর মুখ নীচু করে বললে, "স্যার! ঘুমাতে পারছি না স্যার।"

—"ঘুমাতে পারছো না! কেন?"

—"ওরা বড় গোলমাল করছে স্যার।"

স্কেটন কান পেতে শুনলেন। শ্রমিকদের শয়নকক্ষ থেকে ভেসে আসছে তুমুল কোলাহল ধ্বনি।

মিঃ স্কেটন ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত্রি গভীর, যে কোনও ভদ্রলোকই এখন শয্যার বুকে আশ্রয় নিতে চাইবে।

মুখ তুলে গম্ভীর স্বরে স্কেটন বললেন, "তোমার হাতে তো বেশ জোর আছে শুনেছি—তবে তুমি ঘুমাতে পারছ না কেন?"

রেড কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে রইল, তারপরই তার চোখে মুখে খেলে গেল হাসির বিদ্যুৎ। "স্যার! স্যার! আপনি কি বলছেন স্যার? আপনি কি—"

বাধা দিয়ে স্কেটন বললেন, "শোনো! তাঁবুর লোকজনদের মধ্যে যাতে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় থাকে তুমি সেই চেষ্টাই করবে। আজ থেকে তুমি হলে এই দলের 'পুলিসম্যান'! বুঝেছ?"

এক মুহূর্তের মধ্যে যেন রূপান্তর ঘটল মানুষটির। জ্বলজ্বল করে উঠল রেডের দুই চোখ, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্কেটনকে সে অভিবাদন জানাল, তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে গেল মুক্ত দ্বারপথে।

দশ মিনিটের মধ্যেই শ্রমিকদের কোলাহলমুখর শয়নকক্ষ হয়ে গেল নিস্তব্ধ এবং নিবে গেল বৈদ্যুতিক আলোর দীপ্তি।

রেড তার কর্তব্য পালন করেছে!

মিঃ স্কেটন শয্যাগ্রহণ করার উপক্রম করলেন আর ঠিক সেই সময় বেজে উঠল টেলিফোন। যন্ত্রটাকে তুলে নিলেন স্কেটন।

টেলিফোনের তারে এক উদ্বেগজনক সংবাদ পেলেন স্কেটন। তাঁর আস্তানা থেকে কয়েক মাইল

দূরে রাস্তা তৈরীর জন্য গড়ে উঠেছিল আর একটি ঘাঁটি। এ ঘাঁটির প্রহরী টেলিফোনে জানিয়ে দিল যে, তাদের ঘাঁটি থেকে একটি অতিশয় ভয়ংকর মানুষ স্কেটনের আস্তানার দিকে যাত্রা করেছে। প্রহরীর মুখ থেকে আরও বিশদ বিবরণ জানা গেল—ঐ গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকটা নাকি তাদের ঘাঁটিতে খুব উপদ্রব শুরু করেছিল, প্রহরী তাকে বাধা দিতে গিয়ে দারুণ মার খেয়েছে।

আবার ভেসে এল টেলিফোনে প্রহরীর কণ্ঠস্বর। "লোকটির নাম টারজান। অন্ততঃ ঐ নামেই সে নিজের পরিচয় দেয়। বাঘের মতো ভয়ংকর মানুষ ঐ টারজান। মিঃ স্কেটন, আপনি সাবধানে থাকবেন।"

"আমি সতর্ক থাকব।"

স্কেটন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

পরের দিন সকালেই স্কেটনের ঘরে 'টারজান' নামধারী মানুষটির শুভ আগমন ঘটল।

স্কেটন বই পড়ছিলেন। বই থেকে মুখ তুলে তিনি আগন্তুকের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। চিতাবাঘের মতো ছিপছিপে পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহ, দুই চোখের দৃষ্টিতে এবং মুখের রেখায় রেখায় নিষ্ঠুর বন্য হিংসার পাশবিক ছায়া—টারজান?

গম্ভীরভাবে স্কেটন বললেন, "তুমি টারজান? আগের ঘাঁটির প্রহরীকে তুমি মেরেছ?"

স্কেটনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে আগন্তুক, কুৎসিত হিংস্র হাস্যে বিভক্ত হয়ে গেল তার ওষ্ঠাধর, "হ্যাঁ, আমার থাবাগুলো বড় ভয়ানক।"

"শোনো টারজান," স্কেটন বললেন, "ইচ্ছে করলে তুমি এখানে কাজ করতে পাবো।"

"হ্যাঁ?"

লোকটি অবাক হয়ে গেল। এত সহজে কাজ পেয়ে যাবে সে ভাবতে পারে নি। স্পষ্টই বোঝা গেল, মালিকের তরফ থেকে এই ধরনের প্রস্তাব আসতে পারে এমন আশা তার ছিল না।

"হ্যাঁ, আর একটা কথা বলে দিচ্ছি," স্কেটন বললেন, "এখানে গোলমাল করলে বিপদে পড়বে। এই ঘাঁটিতে এমন একটি মানুষ আছে যে তোমাকে ইচ্ছে করলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে।"

নীরব হাস্যে ভয়ংকর হয়ে উঠল টারজানের মুখ, "ও! ঐ লালচুলো মানুষটার কথা বলছেন বুঝি? তার কথা আমার কানে এসেছে। আমি ঐ লালচুলোর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

"ভাল কথা। খুব শীঘ্রই তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে টারজান।"

মিঃ স্কেটন আবার তাঁর হাতের বইতে মনোনিবেশ করলেন। টারজান কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু স্কেটন একবারও বই থেকে মুখ তুললেন না।

অগত্যা টারজান স্কেটনের ঘর থেকে বেরিয়ে শ্রমিকদের শয়নকক্ষের দিকে পদচালনা করলে।

স্কেটন জানতেন টারজানের সঙ্গে ম্যাকফারলেন ওরফে রেড-এর কলহ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে তাঁর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হবে কে জানত?

স্কেটনের কাছে যেদিন টারজান এসেছিল সেদিন রেড অকুস্থলে উপস্থিত ছিল না। কয়েক মাইল দূরে রাস্তা তৈরীর কাজে সে ব্যস্ত ছিল। রাত্রিবেলা যখন সে শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে উপস্থিত হল, তখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠল এক অদ্ভুত দৃশ্য—

মস্ত বড় ঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছে আর চিৎকার করছে টারজান, "এইখানে এমন কোনও মানুষ নেই যে আমার সঙ্গে লড়তে পারে।"

দরজার কাছে স্থির হয়ে দাঁড়াল রেড।

শয়নকক্ষের মাঝখানে মস্ত বড় থামটার উপর সজোরে পদাঘাত করে চেঁচিয়ে উঠল টারজান, "যে কোন লোক—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে কোনও লোককে আমি মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে পারি।"

"তাই নাকি? যে কোন লোককে তুমি মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে পারো?" হাসতে হাসতে বললে রেড, "কিন্তু আমাকে তুমি ঠাণ্ডা করতে পারবে না।"

কথা বলতে বলতে একহাত দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল রেড, এইবার ক্ষিপ্রহস্তে গায়ের গরম জামাগুলো সে খুলে ফেলল।

শার্টের আস্তিন গুটিয়ে রেড ধীরে ধীরে এগিয়ে এল টারজানের দিকে! চরম মুহূর্ত!

মিষ্টি হাসি হেসে মধু ঢালা ঠাণ্ডা গলায় রেড বললে, "কিহে স্যাঙ্গাত—তুমি তৈরী?"

রেড স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। সে শক্তিশালী মানুষ। তার লড়াই-এর অস্ত্র হচ্ছে দুই হাতের বজ্রমুষ্টি।

টারজান বর্ণসঙ্কর—তার বাপ ফরাসী, মা রেড ইণ্ডিয়ান। সেও বলিষ্ঠ মানুষ। কিন্তু তার লড়াই-এর ধরন আলাদা। ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হোক শত্রু নিপাত করতে সে অভ্যস্ত; 'মারি অরি পারি যে কৌশলে', এই হল তার নীতি।

দুই বিচিত্র প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের সম্মুখীন হল।

টারজান খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। রেড-এর বলিষ্ঠ দুই হাতের কবলে ধরা পড়ার ইচ্ছা তার ছিল না—হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে শত্রুর মাথায় প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করলে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপর হাতখানি সবেগে আঘাত হানল শত্রুর উদরে এবং চোখের পলক ফেলার আগেই ছিটকে সরে গেল প্রতিদ্বন্দ্বীর নাগালের বাইরে।

টারজানের চোখ দুটো এতক্ষণ ক্রোধে ও ঘৃণায় জ্বলছিল জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের মতো, কিন্তু এইবার তার বিস্ফারিত চক্ষুতে ফুটে উঠল আতঙ্কের আভাস।

তার একটি আঘাতও শত্রুর দেহ স্পর্শ করতে পারে নি! রেড আক্রমণ করলে না, স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল শত্রুর জন্য।

আবার আক্রমণ করল টারজান। চিতাবাঘের মতো দ্রুত ক্ষিপ্রচরণে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, ক্রুদ্ধ সর্পের ছোবল মারার ভঙ্গীতে তার দুই হাত বারংবার আঘাত হানল শত্রুর দেহে, তারপর আবার ছিটকে সরে এসে প্রস্তুত হল পরবর্তী আক্রমণের জন্য।

টারজানের চোখে এইবার স্পষ্ট ভয়ের ছায়া। শত্রুর একজোড়া বলিষ্ঠ বাহু তার প্রত্যেকটি

আঘাত ব্যর্থ করে দিয়েছে! দুখানি হাত যেন দুটি লোহার দরজা—ইস্পাত-কঠিন সে হাত দুটির বাধা এড়িয়ে টারজানের আঘাত রেড-এর শরীর স্পর্শ করতে পারে নি একবারও!

টারজান এইবার অন্য উপায় অবলম্বন করলে। জ্যা-মুক্ত তীরের মতো তার দেহ ছুটে এল শত্রুর উদর লক্ষ্য করে। ঐ অঞ্চলে নদীর ধারের গুণ্ডারা সাধারণতঃ পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে লড়াই করে, হাত দিয়ে সেই ভীষণ আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু রেড হুঁশিয়ার মানুষ, সেও অনেক ঘাটের জল খেয়েছে, অন্যান্য বারের মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সে শত্রুর আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করলো না—সাঁৎ করে একপাশে সরে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর পায়ে পা লাগিয়ে মারল এক টান!

পরক্ষণেই টারজানের দেহ ডিগবাজি খেয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল বন্ধ দরজার উপর!

সমবেত জনতার কণ্ঠে জাগল অট্টহাস্য! টারজানের দুর্দশা তারা উপভোগ করছে সকৌতুকে।

টারজান উঠে দাঁড়াল। ভীষণ আক্রোশে সে ধেয়ে এল প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে, তারপর হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে উঠে রেড-এর মাথায় করলে প্রচণ্ড পদাঘাত।

লাথিটা রেড-এর মাথায় চেপে পড়ে নি, মুখের উপর দিয়ে হড়কে গিয়েছিল—পলকে টারজানের একটি জুতোসুদ্ধ পা ধরে ফেলল রেড। কিন্তু শত্রুকে সে ধরে রাখতে পারল না। মাটির উপর সশব্দে আছড়ে পড়েই আবার উঠে দাঁড়াল টারজান।

উল্লসিত জনতার চিৎকারে ঘর তখন ফেটে পড়ছে! হ্যাঁ, একটা দেখার মতো লড়াই হচ্ছে বটে।

তবে দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝতে পেরেছিল এটা সাধারণ লড়াই নয়। প্রথম প্রথম হয়তো যোদ্ধাদের মধ্যে কিছুটা খেলোয়াড়ী মনোভাব ছিল, কিন্তু এখন তাদের মাথায় চেপেছে খুনের নেশা।

টারজানের জুতোর তলা ছিল লোহা দিয়ে বাঁধানো। রেড-এর মুখের উপর সেই লৌহখণ্ড এঁকে দিয়েছে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন।

রেড-এর গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা, চিবুকটা একপাশে বেঁকে গেছে আঘাতের বেগে।

হর্ষধ্বনি থেমে গেল। রক্তমাথা ক্ষতচিহ্ন এইবার সকলের চোখে পড়েছে।

হঠাৎ সকলের নজর পড়ল টারজানের উপর। প্রায় ২০০ মানুষের দেহের অঙ্গে অঙ্গে ছুটে গেল বিদ্যুৎ-শিহরণ—টারজানের হাতের মুঠিতে ঝকঝক করছে একটি ধারাল ছোরা!

জনতা নির্বাক। দারুণ আতঙ্কে তাদের কণ্ঠ হয়ে গেছে স্তব্ধ।

নিঃশব্দে বাঘের মতো গুঁড়ি মেরে টারজান এগিয়ে এল শত্রুর দিকে—রেড তখন নিবিষ্ট চিত্তে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করছে।

ভীষণ চিৎকার করে আক্রমণ করল টারজান। এক মুহূর্তের জন্য দেখা গেল চারটি হাত আর চারটি পায়ের দ্রুত সঞ্চালন, তারপরই মৃত্যু-আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে স্থির প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে গেল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী!

একহাত দিয়ে টারজানের ছোরাসুদ্ধ হাত চেপে ধরেছে রেড, অন্য হাতের পাঁচটা আঙ্গুল চেপে বসেছে শত্রুর কণ্ঠদেশে। টারজানও নিশ্চেষ্ট নয়, সে ছোরাসুদ্ধ হাতটি ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে প্রাণপণে এবং অপর হাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে রেড-এর গলা টিপে ধরেছে সজোরে।

ঘরের মধ্যে অতগুলি মানুষ স্তব্ধ নির্বাক। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখেও কোন আওয়াজ নেই। নিঃশব্দে চলছে মৃত্যুপণ লড়াই।

হঠাৎ মট্ করে একটা শব্দ হল—রেড-এর শক্ত মুঠির মধ্যে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল টারজানের কবজির হাড়, অস্ফুট আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল টারজান।

দুই হাত কোমরে রেখে ধরাশায়ী শত্রুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে রেড। টারজান উঠল না, সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

ভগ্নস্বরে রেড বললে, "ওকে এবার একটু জল দাও। দেখছ না, মানুষটা যে অজ্ঞান হয়ে গেছে..."

মিঃ স্কেটন ভুল করেন নি। ম্যাকফারলেন ওরফে রেড সত্যিই ভাল লোক। পরবর্তী জীবনে ম্যাকফারলেন ভালভাবে বাঁচার সুযোগ পেয়েছিল এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সে কুণ্ঠিত হয় নি।
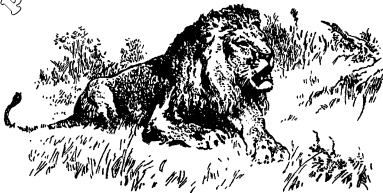
একদল হিংস্র নেকড়ের গুহার ভিতর যদি একটা বিড়াল বাচ্চা পথ ভুলে ঢুকে পড়ে তাহলে তার চালচলনটা কেমন হবে?

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেও অনুমান করা যায় যে মার্জার শাবক যে মুহূর্তে নেকড়েগুলোর অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারবে, সেই মুহূর্তে তার দেহের লোম খাড়া হয়ে উঠবে কাঁটার মতো— এবং দুই চোখের ভীত বিস্ফারিত দৃষ্টি সঞ্চালন করে সে যে চটপট চম্পট দেওয়ার সোজা রাস্তাটা খোঁজার চেষ্টা করবে, এ বিষয়ে ভুল নেই।

'স্নেক ডল্‌স্ সেলুন' নামক পানশালার মেঝের উপর দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এসে যে কিশোরটি দোকানীর কাছে এক গেলাস ঠাণ্ডা পানীয় চাইল, তার নির্বিকার মুখ এবং স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গী দেখে মনে হয় না যে এই মুহূর্তে স্থানত্যাগ করার ইচ্ছা তার আছে—

যদিও তার সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পানাগারের মধ্যস্থলে দৃষ্টিপাত করলেই নেকড়েবেষ্টিত মার্জার শাবকের কথা মনে পড়বে...

হ্যাঁ, নেকড়ে বই কি—

কিংবা নেকড়ের চাইতেও ভয়ংকর মানুষগুলো আড্ডা জমিয়েছে পানাগারের মধ্যে।

পানশালার টেবিলের চারধারে টেবিলে টেবিলে গোল হয়ে বসে যে লোকগুলো তাস খেলছে অথবা পানভোজন করছে তাদের চোখে মুখে মনুষ্যত্বের চিহ্ন নেই কিছুমাত্র—কঠিন চোয়ালের রেখায় রেখায় জ্বলন্ত চোখের তির্যক চাহনিতে যে বন্য হিংসার ছায়া উঁকি দিচ্ছে সেদিকে তাকালে ক্ষুধার্ত নেকড়ের কথা মনে হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

এতগুলো সাংঘাতিক মানুষের মাঝখানে একটি নিরীহ চেহারার কিশোরকে দেখলে নেকড়েবেষ্টিত মার্জার শাবকের কথাই মনে আসে।

স্নেক ডল্‌স্‌ সেলুনের মানুষগুলো সেদিন তাই ভেবেছিল, বিড়ালছানার মতো তুচ্ছ করেছিল তারা ঐ ছেলেটিকে। একটু পরেই তাদের ভুল ভাঙ্গল ভয়ংকরভাবে—তপ্ত রক্তধারায় হল তাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

তাই হয়।

রজ্জুতে সর্পভ্রম হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু সর্পতে রজ্জুভ্রম করলে তার ফল হয় মারাত্মক।

সেই মারাত্মক ভুলের সূচনা জানিয়ে ঘরের কোণ থেকে ভেসে এল এক বিদ্রূপ জড়িত কণ্ঠস্বর, "এই ছোঁড়াটা নিশ্চয়ই এখনও মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খায়। হা! হা! হা! এই দুধের বাচ্চা হল আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ডেপুটি মার্শাল! হো! হো! হো!"

খোঁচাখাওয়া সাপ যেমন দ্রুতবেগে আততায়ীর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি বিদ্যুৎচকিত সঞ্চালনে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর ছেলেটি চেয়ারে উপবিষ্ট লোকগুলির দিকে। সকলে দেখল তার বাঁ হাতটা সামনের টেবিলের উপর চেপে বসেছে আর ডান হাতের সরু সরু আঙ্গুলগুলো বাজপাখির ছোঁ মারার ভঙ্গীতে নেমে এসেছে কোমরের খাপে চাকা রিভলভারের খুব কাছাকাছি।

"হ্যাঁ, আমি যুক্তরাজ্যের ডেপুটি মার্শাল," কিশোর কণ্ঠে শোনা গেল দর্পিত ঘোষণা, "আমার নাম ড্যান ম্যাপ্‌ল্‌। কারও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে? কোনও প্রশ্ন?"

না, কারও কিছু জানার নেই।

কেউ কোনও প্রশ্ন করলে না।

যে লোকটি বিদ্রূপ করেছিল সে হাতের গেলাসটিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল খুব মন দিয়ে...আশেপাশে অন্য লোকগুলিও হঠাৎ মৌনব্রত অবলম্বন করলে। একটু আগেও যেখানে হইহই হট্টগোলে কান পাতা যাচ্ছিল না, এখন সেখানে ছুঁচ পড়লে শব্দ শোনা যায়...

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত—

পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে চেয়ারের উপর যে লোকগুলো বসেছিল তারা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল, অভ্যস্ত হাতগুলো ধীরে ধীরে নেমে এল কোমরের খাপে ঢাকা রিভলভারের দিকে।

ড্যান ম্যাপ্‌ল্‌ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল।

সে হেসে উঠল, "আমার সঙ্গে রিভলভারের খেলা খেলতে পারে এমন কোনও খেলোয়াড় এখানে নেই। আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি—তোমরা যদি আরো কিছুদিন দুনিয়ার আলো দেখতে চাও, তবে তোমাদের হাতগুলো রিভলভারের বাঁট থেকে একটু দূরে দূরে রাখো।"

ড্যান ম্যাপ্‌লের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার স্পর্শ ছিল না, খুব সহজ আর স্বাভাবিক ছিল তার গলার আওয়াজ। কিন্তু তার চোখ দুটি থেকে হারিয়ে গেল কৈশোরের প্রাণচঞ্চল আলোর দীপ্তি—সর্পিল আক্রোশে চোখেব তাবায় তারায় নেমে এল বিষাক্ত হিংসার ছায়া।

স্নেক ডল্‌স্‌ সেলুনের খুনী মানুষগুলো ঐ চোখের ভাষা বুঝল খুব সহজেই, তাদের হাতগুলো রিভলভারের বিপজ্জনক সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে গেল।

কোলাহলমুখর পানশালার মধ্যে নেমে এল মৃত্যুপুরীর নীরবতা।

ড্যান ম্যাপ্‌লের আবির্ভাব অতিশয় নাটকীয় বটে কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের তাহ্‌লাকুই নামে যে ছোট শহরটা পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানকার প্রতিটি বাসিন্দাই খববটা পেয়েছিল—

খুব শীঘ্রই নাকি ঐ অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একজন ডেপুটি মার্শাল আসবে

শহরের বাসিন্দারা খবরটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি। না দেওয়াই স্বাভাবিক। আজকের আমেরিকার কথা নয়—১৮৯২ সালে ঐ সব অঞ্চলে আইন-টাইন কেউ বড় একটা মানতো না বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ছোট ছোট জায়গায় থানা পুলিসের বিরাট ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না গভর্নমেন্টের পক্ষে, তাই শহরের শৃঙ্খলা রক্ষার ভার থাকতো 'টাউন মার্শালদের' উপর। দুর্ধর্ষ গুণ্ডারা যে মার্শালদের খুব ভয় করত তা নয়, তবে পারতপক্ষে মার্শালদের সঙ্গে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চাইতো না।

তাহ্‌লাকুই শহর কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম। পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই পাঁচজন মার্শালকে ঐ শহরের গুণ্ডারা গুলি করে মেরে ফেলল। শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক গর্ভনমেন্টের কাছে আবেদন জানালেন, একজন ডেপুটি মার্শালকে যেন অবিলম্বে তাহ্‌লাকুই শহরে পাঠানো হয়। ভদ্রলোক এখানে বাস করতে পারছে না।

আবেদন গৃহীত হল। তাহ্‌লাকুই শহরে আবির্ভুত হল ডেপুটি মার্শাল ড্যান ম্যাপ্‌ল্‌।

শহরের পানাগার 'স্নেক ডল্‌স্‌ সেলুন'-এর ভয়াবহ খ্যাতি ম্যাপ্‌লের কানেও পৌঁছে ছিল সে জানতো রাত্রিবেলা ঐ পানাগারের মধ্যে ঢুকলে সে স্থানীয় গুণ্ডাশ্রেণীর মানুষগুলোকে দেখতে পাবে, অতএব অকুস্থলে হল ড্যান ম্যাপ্‌লের আবির্ভাব।

পরবর্তী ঘটনার কথা তো কাহিনীর শুরুতেই বলেছি। শুধু দেখতে নয়, কিছু 'দেখাতেও' এসেছিল ম্যাপ্‌ল্‌। সমবেত গুণ্ডাদের উদ্দেশ করে সে যখন সাবধান বাণী উচ্চারণ করলে তখন কেউ সামনে এসে তাকে চ্যালেঞ্জ জানাল না।

না, চ্যালেঞ্জ নয়—কিশোর ড্যান ম্যাপ্‌লের চোখের দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস ছিল না কারও—কিন্তু গুণ্ডাদের চোখে চোখে ক্রূর ইঙ্গিতে নির্ধারিত হয়ে গেল নূতন ডেপুটি মার্শালের নিয়তি।

একটি দীর্ঘাকার কুৎসিত মানুষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—নাম তার নেড ক্রিষ্টি।

সঙ্গে উঠে দাঁড়াল তার সহকারী—আর্চি উল্‌ফ্‌।

নেড আর আর্চি ঐ অঞ্চলের দুর্ধর্ষ গুণ্ডা। নরহত্যায় তাদের দ্বিধা ছিল না কিছুমাত্র। কত লোক যে তাদের হাতে প্রাণ দিয়েছে তারা নিজেরাও বোধ হয় তার সঠিক হিসাব দিতে পারতো না। এই দুই মানিকজোড় এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

পরবর্তী ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকেই শোনা যাক। ১৮৯২ সালে নভেম্বর মাসের তৃতীয় দিবসে ড্যান ম্যাপ্‌ল্‌ নামে যে কিশোরটি স্নেক ডল্‌স্‌ সেলুনে পদার্পণ করেছিল তার কীর্তিকলাপ স্বচক্ষে দেখেছিল এক বালক ভৃত্য—নাম তার মাইক ম্যাকফিবেন।

কাহিনীর পরবর্তী অংশ মাইকের লিখিত বিবরণী থেকে তুলে দিচ্ছি।

"পানাগারের পিছন দিকে দরজা দিয়ে অন্তর্ধান করলে আর্চি আর নির্বিকারভাবে ড্যান ম্যাপ্‌লের সামনে এগিয়ে এল নেড। আমি তখনই বুঝলাম ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে। সেলুন-রেঁস্তরায় পিস্তলবাজ গুণ্ডারা যখন কোনও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে চায় তখন তারা ফাঁদ পাতে। ফাঁদের নিয়মটা হচ্ছে, দুজনের মধ্যে একজন সামনে এগিয়ে এসে 'শিকার'কে অন্যমনস্ক করে রাখে এবং সেই সুযোগে পিছন থেকে আর একজন তাকে গুলি করে।

আমি বুঝলাম আর্চি দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়ে আছে, সুযোগ পেলেই সে গুলি চালাবে। আমার বুক কাঁপতে লাগল। খুব সহজভাবে ম্যাপ্‌লকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল নেড, তারপর হঠাৎ একটা টেবিলের উপর হাত রেখে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাপ্‌লের দিকে, 'ওঃ! তুমিই তাহলে নতুন ডেপুটি মার্শাল? রাজ্যসরকার তোমাকেই পাঠিয়েছে?'

আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। এখনই পিছনের দরজার কাছে দণ্ডায়মান আর্চির রিভলভার থেকে গুলি ছুটে এসে ম্যাপ্‌লকে শুইয়ে দেবে মেঝের উপর। শুধু আমি নই, অভিজ্ঞ মানুষগুলো সবাই বুঝেছিল ব্যাপারটা, সকলেরই মুখে চোখে ফুটে উঠেছিল হিংস্র প্রত্যাশা—উদগ্র আগ্রহে সকলেই কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগল একটা রিভলভারের গর্জন শোনার জন্য...

হ্যাঁ, গর্জে উঠেছিল রিভলভার। কিন্তু সেটা আর্চির অস্ত্র নয়। আমরা দেখলুম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করছে আর্চি উল্‌ফ, তার হাতের মুঠো থেকে ছিটকে পড়েছে রিভলভার। কখন যে ম্যাপ্‌ল্‌ ডান হাতের দ্রুত সঞ্চালনে কোমর থেকে রিভলভার টেনে নিয়ে আর্চিকে গুলি করেছে আমরা বুঝতেই পারি নি।

আমরা শুধু শুনলাম রিভলভারের গর্জন এবং আহত আচির আর্তনাদ, আমরা শুধু দেখলাম ম্যাপ্‌লের ডান হাতের রিভলভারের নল থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া আর তার বাঁ হাঁতের রিভলভার উদ্যত হয়েছে নেড ক্রিস্টির দিকে।

কোণঠাসা নেকড়ের মতো হিংস্র দন্তবিকাশ করে পিছিয়ে গেল নেড। সে কোমরে ঝুলানো রিভলভারে হাত দেওয়ার চেষ্টা করলে না—চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল।

এইবার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল ওয়াইল্ড হ্যারি। ঐ অঞ্চলের আর একটি কুখ্যাত পিস্তলবাজ গুণ্ডা সে। কোমর থেকে রিভলভার টেনে নিয়ে হ্যারি গুলি করার উপক্রম করলে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রহস্তে গুলি চালিয়ে ম্যাপ্‌ল্‌ তাকে মেঝের উপর পেড়ে ফেলল।

তারপর ঠিক কি হয়েছিল জানি না। ঐ রক্তাক্ত নাটকের মধ্যবর্তী অংশে কে কেমন অভিনয় করেছিল বলতে পারব না। কারণ, হ্যারি লুটিয়ে পড়তেই অনেকগুলো রিভলভার একসঙ্গে গর্জে

উঠল এবং আমি ঝাঁপ খেলাম একটা টেবিলের নীচে। সেখান থেকেই শুয়ে শুয়ে আমি শুনতে পেলাম সগর্জনে ধমকে উঠেছে অনেকগুলো রিভলভার।

প্রায় মিনিট দুই ধরে শুনলাম রিভলভারের গর্জন। তারপর হঠাৎ থেমে গেল সেই শব্দের তরঙ্গ—সব চুপচাপ। খুব সাবধানে টেবিলের তলা থেকে মাথা তুলে দেখলাম স্নেক ডল্‌স্‌ সেলুনের মালিক ড্যান ম্যাপ্‌লের হাতে তুলে দিচ্ছে একটি পূর্ণ পানপাত্র।

পানশালা শূন্য! গুণ্ডার দল সরে পড়েছে।

দোকানের মালিক আর একটা গেলাসে মদ ঢালল, 'এটাও টেনে নাও। এই গেলাসের দাম দিতে হবে না।'

মালিকের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ম্যাপ্‌ল্‌ বললে, 'হঠাৎ এই অনুগ্রহের কারণ কি?'

মালিক বললে, 'অনুগ্রহ নয়। আমি আইরিশ—আয়ারল্যাণ্ডের লোক মনে করে মৃত্যুপথযাত্রীকে পানীয় পরিবেশন করলে পুণ্য হয়।'

—'তার মানে? আমি কি মরতে বসেছি নাকি?'

—'নিশ্চয়। তুমি পাকা খেলোয়াড়—তোমার মতো দক্ষ পিস্তলবাজ মানুষ আমি দেখি নি। কিন্তু তোমার আয়ু ফুরিয়েছে। দু'মিনিট কিংবা খুব বেশী হলে মিনিট কুড়ি তুমি বেঁচে থাকতে পারো।'

'বটে?' এক চুমুকে গেলাসের তরল পদার্থ গলায় ঢেলে শূন্য পানপাত্র টেবিলের উপর রাখল ম্যাপ্‌ল্‌, 'আচ্ছা, আজ চলি।'

দরজাটা লাথি মেরে খুলে ফেলল ম্যাপ্‌ল্‌, খাপে ঢাকা রিভলভার দুটির বাঁটের উপর নেমে এল তার দুই হাত—তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে খোলা দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে গেল...শহরের অন্ধকার পথের উপর মিলিয়ে গেল তার দীর্ঘ দেহ।"

মাইকের লিখিত বিবরণীতে আরও অনেক কিছু আছে। সব ঘটনা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করার জায়গা এখানে নেই। খুব অল্প কথায় পরবর্তী ঘটনার বিবৃতি দিচ্ছি।

স্নেক ডলস সেলুনের মালিক যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তা সফল হয়েছিল বর্ণে বর্ণে। ড্যান ম্যাপ্‌ল্‌ পানশালা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চল্লিশ মিনিটের মধ্যে অজ্ঞাত আততায়ী তাকে আড়াল থেকে রাইফেল ছুঁড়ে হত্যা করেছিল।

ম্যাপ্‌লের হত্যাকাহিনী শুনে ক্ষেপে গেল তাহ্‌লাকুই শহরের সমস্ত মানুষ। এতদিন যারা গুণ্ডাদের ভয়ে থরথর করে কাঁপতো, তারাই আজ রুখে দাঁড়াল গুণ্ডারাজ উচ্ছেদ করার জন্য। দলে দলে শান্তিপ্রিয় মানুষ ছুটে এল শহরের পথে।

হাতে তাদের বিভিন্ন অস্ত্র—রাইফেল! পিস্তল! শটগান!

হত্যাকাণ্ডের পরদিনই আমেরিকা যুক্তরাজ্যের একজন ডেপুটি মার্শাল অকুস্থলে এসে পড়ল, নাম তার হেক ব্রুনার। তাঁর সঙ্গে এল দু'জন যোগ্য সহকারী। হত্যাকাণ্ড যেখানে ঘটেছিল সেখানে

খোঁজাখুঁজি করে তারা আবিষ্কার করলে একটা ব্যবহৃত বুলেটের খোল এবং সেই খোলটার একটু দূরেই পাওয়া গেল একটা 'লাকি চার্ম' বা কবচ জাতীয় বস্তু। স্পষ্টই বোঝা গেল যে রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে ম্যাপ্‌লকে হত্যা করা হয়েছে, ঐ বুলেটের খোলটা হচ্ছে উক্ত রাইফেলে ব্যবহৃত অকেজো টোটা।

ঐ ধরনের বুলেট অনেকেই ব্যবহার করে, কাজেই সেটা থেকে খুনীকে সনাক্ত করা সম্ভব নয়।

কিন্তু কবচটা গোয়েন্দার কাছে মূল্যবান সূত্র।

ক্রুনার তার দুই সহকারীকে বললে, "আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি। এই কবচের মালিকটিকে যদি আবিষ্কার করতে পারি তাহলেই হত্যাকাণ্ডের সমাধান হয়ে যাবে। আমার মনে হয় খুনী আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না।"

ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল হেক ক্রুনার। দু'দিন তার পাত্তা পাওয়া গেল না। আর এই দুটো দিন শহরের কোনও জায়গায় কোনও অপরাধ সংঘটিত হল না। তাহ্‌লাকুই শহরের ইতিহাসে পরপর দু'দিন কোনও দুর্ঘটনা ঘটল না, এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা।

শহরের আশেপাশে পার্বত্য অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসে যে-সব গুণ্ডা নগরবাসীর উপর হামলা করতো তারা পরপর দু'দিন তাদের আস্তানায় গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রইল।

ক্ষিপ্ত জনতার সম্মুখীন হওয়ার সাহস তাদের ছিল না, হাওয়া ঘুরে গেছে!

দু'দিন পরেই সকালবেলা শহরের রাজপথে ঘোড়ার পিঠে আবির্ভূত হল ক্রুনার। এক বিরাট জনতা তাকে ঘিরে দাঁড়াল, 'খবর কি?'

ক্রুনার বললে, "কবচের মালিক হচ্ছে নেড ক্রিষ্টি। যে বুড়ো রেড-ইণ্ডিয়ান এই ধরনের কবচ তৈরী করে তাকে আমি ভালভাবেই জানি। আমি ঐ বুড়োর কাছে গিয়েছিলাম। কবচটা দেখেই সে জিনিসটা সনাক্ত করলো—নেড ক্রিষ্টি ঐ কবচ নিয়েছিল বুড়োর কাছ থেকে। এই তল্লাটে ঐ ধরনের কবচ বুড়ো ছাড়া আর কেউ তৈরী করতে পারে না, তাই ওর কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য। বুড়ো আমাকে বলেছিল যে যতগুলো কবচ সে তৈরী করেছিল সবগুলোতেই সে খোদাই করেছিল একটি একটি সাপের ছবি—কিন্তু ক্রিষ্টির কবচে সে এঁকে দিয়েছিল দু'দুটো সাপ। আমরা যে কবচটা কুড়িয়ে পেয়েছি তাতেও দু'টি সাপের ছবি খোদাই করে আঁকা হয়েছে!"

জনতার ভিতর থেকে একজন চিৎকার করে উঠল, "আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন? চলো—ঐ শয়তান নেড ক্রিষ্টিকে ধরে তার গলায় একটা দড়ি লাগিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া যাক।"

সমবেত জনমণ্ডলী বক্তার প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে গর্জে উঠল, "ঠিক! ঠিক! নেড ক্রিষ্টিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেব! চলো, দেখি কোথায় লুকিয়ে আছে সেই শয়তান।"

ক্রুনার কঠোর স্বরে বললে, "না। আইন তোমরা নিজেদের হাতে নিতে পারো না। আমরা

সবকারের প্রতিনিধি, যা করা কর্তব্য আমরা তাই করব। নেড ক্রিষ্টির আস্তানা কোথায় তোমরা জানো?"

একাধিক কণ্ঠে উত্তর এল, "জানি। র‍্যাবিট ট্র্যাপ।"

"সেটা আবার কোথায়?"

মাইক নামে যে ছোকরা চাকরটি সেলুনের ভিতর ম্যাপলের কীর্তি প্রত্যক্ষ করেছিল সে এগিয়ে এসে জানাল যে র‍্যাবিট ট্র্যাপ জায়গাটা সে চেনে এবং ক্রুনার যদি অনুমতি দেয় তবে সে তার সঙ্গে গিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারে।

ছেলেটিকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে পুলিস দলের সঙ্গে ক্রুনার ছুটল র‍্যাবিট ট্র্যাপ-এর দিকে।

ঘন জঙ্গল আর কাঁটা ঝোপের ভিতর দিয়ে যথাস্থানে এসে পৌঁছে গেল ক্রুনার এবং তার দল। একটা ছোট পাহাড়ের উপর চারদিকে ছড়িয়ে আছে ঘন ঝোপঝাড় এবং তারই মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গার উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি কাষ্ঠ নির্মিত ঘর বা কেবিন—ঐ হচ্ছে নেড ক্রিষ্টির আস্তানা।

ক্রুনারের দল ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। পুলিস বাহিনীর একজন লোক আহত হয়ে ছিটকে পড়ল মাটিব উপর। অন্যান্য পুলিসরা চটপট ভূমিশয্যায় লম্বমান হয়ে আত্মরক্ষা করলে, কেউ কেউ আশ্রয় নিলে পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছোট-বড় পাথরের আড়ালে।

ঘরের ভিতর থেকে দু' দুটো রাইফেল সগর্জনে অগ্নিবৃষ্টি করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রুনারের দলের আরও দু'জন লোক আহত হল। ক্রুনার বুঝল, ঐ ঘরটি হচ্ছে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো—শক্ত কাঠের দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে নেড এবং তার সঙ্গী (খুব সম্ভব আর্চি উল্‌ফ্) পুলিসদলের নিক্ষিপ্ত বুলেট থেকে সহজেই আত্মরক্ষা করতে পারবে, কিন্তু ফাঁকা জায়গার উপর দিয়ে গুণ্ডাদের রাইফেলের সামনে এগিয়ে যাওয়া পুলিসদের পক্ষে অসম্ভব।

সে দলের মধ্যে দু'জনকে ডেকে বললে, "এখনই শহর থেকে জনদশেক বন্দুকবাজ মানুষ

নিয়ে এস। তারাই হবে আজ সরকারের অস্থায়ী প্রতিনিধি। এই কয়জন পুলিস নিয়ে গুণ্ডা দুটোকে শায়েস্তা করা যাবে না।"

ক্রনারের দুই সহকারী তাহ্‌লাকুই শহরের দিকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। বিকালবেলার দিকে তাদের সঙ্গে এল দশজন রাইফেলধারী নাগরিক—তাহ্‌লাকুই শহরের দশটি 'লড়িয়ে মানুষ'।

পুলিস ও নাগরিকদের মিলিত বাহিনী এইবার একযোগে গুণ্ডাদের আক্রমণ করলে। তিন দিক দিয়ে ঘিরে ফেলে কাঠের ঘরটার উপর তারা গুলি চালাতে শুরু করলে এবং গুলিবর্ষণের ফাঁকে ফাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

অসম্ভব। গুণ্ডাদের নিশানা অব্যর্থ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিস এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কয়েকজন গুলি খেয়ে ধরাশয্যায় লম্বমান হল। কাঠের ঘরটা যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরী—জানালার ফাঁক দিয়ে উড়ন্ত মৃত্যুদূতের মতো ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি—কার সাধ্য সেদিকে যায়?

নাঃ, এভাবে হবে না। ক্রনার হতাশ হয়ে পড়ল।

টলবার্ট নামক একজন নাগরিক এইবার সামনে এগিয়ে এল, "ক্রনার! ঐ কাঠের ঘরটাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। তাছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।"

ক্রনার বললে, "কিন্তু এত দূর থেকে ঘরের উপর ডিনামাইট ছুঁড়ে মারা সম্ভব নয়। ডিনামাইট ছুঁড়তে হলে ঘরের কাছাকাছি যেতে হবে আর ঘরের কাছে এগিয়ে গেলেই আমরা গুণ্ডা দুটোর রাইফেলের সামনে পড়ব। গুলি যদি ডিনামাইটের উপর লাগে তাহলে আর দেখতে হবে না—আমাদের পুরো দলটাই দড়াম করে উড়ে যাবে স্বর্গের দিকে! আত্মহত্যা করার অনেক ভাল ভাল উপায় আছে টলবার্ট, ডিনামাইটের মুখে প্রাণ দিতে আমি রাজী নই।"

টলবার্ট বললে, "আমি আর কোপল্যাণ্ড একটা পরিকল্পনা করেছি। আমার মনে হয় গুণ্ডাদের আমরা কাবু করতে পারব।"

সারারাত ধরে সবাই মিলে ঘরটাকে পাহারা দিলে কিন্তু ঘরের সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেউ করলে না। অনর্থক প্রাণ বিপন্ন করার পক্ষপাতী নয় ক্রনার; টলবার্ট এবং কোপল্যাণ্ডের উপর ভরসা করে সে রাতটা নিষ্ক্রিয়ভাবে হাত গুটিয়ে বসে রইল—দেখা যাক ওদের পরিকল্পনা কতদূর ফলপ্রসূ হয়।

পরদিন সকালে 'পরিকল্পনা'র চেহারা দেখে দলসুদ্ধ মানুষের চক্ষুস্থির! একটা ঘোড়ায়-টানা গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে গাদা গাদা কাঠের টুকরো সাজাল টলবার্ট আর কোপল্যাণ্ড, তারপর দুই স্যাঙ্গাতে মিলে সেই কাঠবোঝাই গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল গুণ্ডাদের আস্তানার দিকে।

এককুড়ি ডিনামাইটের স্টিক! ঘরের ভিতর থেকে বৃষ্টির মতো ছুটে এল গুলির পর গুলি—একটা গুলি যদি কোনও রকমে ডিনামাইটের উপর পড়ে তাহলে গাড়িসুদ্ধ মানুষ দুটো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে! দলসুদ্ধ লোকের বুক কাঁপতে লাগল, কিন্তু দুই বন্ধু সম্পূর্ণ নির্বিকার—তারা গাড়ি ঠেলছে তো ঠেলছেই।

ফটফট করে উড়ে যেতে লাগল কাঠের টুকরোগুলো গুলির আঘাতে, গাড়ির একটা চাকা থেকে দুটো কাঠের ডাণ্ডা উড়িয়ে নিলে রাইফেলের বুলেট, কোপল্যাণ্ডের মাথায় আঁচড় বসিয়ে একটা গুলি তার সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিয়ে দিলে, আর একটা গুলি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল টলবার্টের টুপি—তবু তারা নির্বিকারভাবে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে চলল!

দুই বন্ধু যেন আত্মহত্যার সংকল্প নিয়েছে!

আচম্বিতে পাহাড়ের বুক কাঁপিয়ে জেগে উঠল এক ভয়াবহ শব্দের তরঙ্গ, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে কেঁপে উঠল মাটি—ধোঁয়া আর ধুলোর ঝড়ে চারদিক আচ্ছন্ন করে পুলিসদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো বড় বড় কাঠের টুকরো!

ধোঁয়া কেটে গেলে সবাই দেখল, কাঠের ঘরটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। একটু দূরেই গাড়ির আড়ালে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে টলবার্ট আর কোপল্যাণ্ড এবং ভাঙ্গা ঘরের ভগ্নস্তূপের ভিতর রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে নেড ক্রিষ্টি!

একটা রাইফেল সগর্জনে অগ্নি-উদগার করলে।

নেড ক্রিষ্টির প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর।

ক্রনার এসে দাঁড়াল কোপল্যাণ্ড আর টলবার্টের সামনে। গুলির আঘাতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে কোপল্যাণ্ড। টলবার্টও আহত হয়েছে, কিন্তু সে জ্ঞান হারায় নি। মুখ তুলে দুর্বলভাবে সে একবার হাসল, তারপর ক্রনারকে উদ্দেশ করে বললে—

"আমার মাথায় একটা গুলি আঁচড় কেটে চলে গেছে। খুব রক্তপাত হচ্ছে বটে, কিন্তু আমি বিশেষ ভয় পাই নি। তবে ডিনামাইট যখন ফাটছিল তখন সত্যি ভয় পেয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল এই বুঝি উড়ে গেলাম!"

সমস্ত ঘটনাটা পরে জানা গেল। সবকিছু এত দ্রুত ঘটেছিল যে প্রত্যক্ষদর্শীরাও প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। টলবার্ট আর কোপল্যাণ্ড গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে গুণ্ডাদের আস্তানার পনের গজের মধ্যে এসে পড়েছিল এবং সেইখান থেকেই ঘরের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল ডিনামাইট স্টিকগুলো। বিস্ফোরণের আগে বুকে হেঁটে খানিকটা পিছিয়ে আসতে পেরেছিল বলেই তারা বেঁচে গেছে—কী অসীম সাহস!

হত ও আহত মানুষগুলোকে নিয়ে ক্রনার শহরে ফিরে এল।

নেড ক্রিষ্টি মারা পড়েছিল, কিন্তু আর্চি উল্ফ্‌কে ওখানে পাওয়া যায় নি। খুব সম্ভব কোনও গোপন পথে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সে সরে পড়েছিল।

তাহ্‌লাকুই শহরে আর কখনও গুণ্ডার উপদ্রব হয় নি। পুলিস ও জনতার সম্মিলিত আক্রমণের মুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সমাজবিরোধী গুণ্ডার দল।

ভদ্রলোকের বাসযোগ্য হয়ে উঠল তাহ্‌লাকুই শহর।

জনতার প্রতিনিধিকে যারা হত্যা করেছিল, ক্ষিপ্ত জনতা তাদের ক্ষমা করে নি।

না না, পুরাণে বর্ণিত মহিষাসুরের কাহিনী আজ লিখতে বসি নি, আমি যে জীবটির কথা বলছি সে হচ্ছে আফ্রিকা বনরাজ্যের জীবন্ত বিভীষিকা—

নাম তার 'কেপ-বাফেলো'। আফ্রিকার মহিষাসুর!

বন্য মহিষ মাত্রেই হিংস্র ও উগ্র, এমন কি গৃহপালিত মহিষকেও নিতান্ত শান্তশিষ্ট জানোয়ার বলা চলে না। কিন্তু আফ্রিকার কেপ-বাফেলোর মতো এমন ভয়ানক জানোয়ার পৃথিবীর অন্য কোনও অঞ্চলে মহিষগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় না।

মহিষ-পরিবারের অন্তর্গত সব জন্তুর প্রধান অস্ত্র শিং এবং খুর। কেপ-বাফেলো ঐ দুই মহাস্ত্রে বঞ্চিত নয়, উপরন্তু শিরস্ত্রাণধারী যোদ্ধার মতো তার মাথার উপর থাকে কঠিন হাড়ের স্থূল আবরণ (ইংরেজীতে যাকে বলে Boss of the Horns)।

অস্থিময় এই কঠিন আবরণ ভেদ করে শ্বাপদের নখ দন্ত বা রাইফেলের গুপ্ত বুলেট মহিষাসুরের মস্তকে ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করতে পারে না।

নিগ্রো শিকারীরা অনেক সময় বর্শা হাতে মহিষকে আক্রমণ করে। অনেকগুলি বর্শার আঘাতে জর্জরিত হয়ে প্রাণত্যাগ করার আগে মহিষ তার শিং ও খুরের সদ্ব্যবহার করতে থাকে বিদ্যুৎবেগে— অবশেষে এই ধরনের বন্য নাটকের উপসংহারে দেখা যায় নিহত মহিষের আশেপাশে লম্বমান হয়ে পড়ে আছে কয়েকটি হত ও আহত নিগ্রো শিকারীর রক্তাক্ত দেহ।

এই ভয়ানক জন্তুকে হত্যা করার একমাত্র উপযুক্ত অস্ত্র হচ্ছে শক্তিশালী রাইফেল। তবে রাইফেলের অগ্নিবৃষ্টিও সব সময় কেপ-বাফেলোকে জব্দ করতে পারে না—আফ্রিকার অরণ্যে মহিষের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে বহু শ্বেতাঙ্গ শিকারী!

এমন দুর্দান্ত জানোয়ারকে টোনিও নামক নিগ্রো যুবকটি জব্দ করেছিল একখানা বর্শার সাহায্যে!

হ্যাঁ, বন্দুক নয়, রাইফেল নয়, এমন কি মহিষ বা হাতী শিকারের উপযুক্ত দীর্ঘ ফলকবিশিষ্ট বল্লমও তার হাতে ছিল না—শুধুমাত্র একটি মাছমারা বর্শার সাহায্যে ক্ষিপ্ত মহিষের আক্রমণ রোধ করেছিল টোনিও নামধারী নিগ্রো যুবক!

কথাটা নিতান্ত অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে—তাই নয় কি?

নিম্নলিখিত কাহিনীটি পড়লেই বোঝা যাবে সত্য ঘটনার চেহারা অনেক সময় গল্পের চেয়ে আশ্চর্য, গল্পের চেয়ে ভয়ংকর...

সুদান অঞ্চলের পূর্বদিকে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলে হানা দিয়েছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ শিকারী—নাম তাঁর রে ক্যাথার্লি। শিকারীর ভাগ্য খারাপ, তাঁর নিগ্রো পথপ্রদর্শক হঠাৎ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়ল। জিনিসপত্র বহন করার জন্য যে লোকগুলিকে ক্যাথার্লি নিযুক্ত করেছিলেন তারা ছোঁয়াচে অসুখের ভয়ে তল্পিতল্পা ফেলে পালিয়ে গেল।

ক্যাথার্লি বিপদে পড়লেন। শিকারের সরঞ্জামগুলি বহন করার জন্য লোকজন দরকার কিন্তু এই গভীর অরণ্যে তেমন লোক কোথায়? নিরুপায় ক্যাথার্লি শেষ পর্যন্ত 'মডি' জাতীয় নিগ্রোদের সাহায্য নিতে বাধ্য হলেন। মডিরা মৎস্যজীবী অর্থাৎ জেলে, মাছ ধরা তাদের পেশা—শিকারটিকার তারা বোঝে না কিন্তু টাকার মূল্য খুব ভালভাবেই বুঝতে শিখেছে। টাকার লোভে কয়েকজন মডি জাতীয় ধীবর ক্যাথার্লির মোট বহন করতে রাজী হল।

মডিদের দলের মধ্যে একটি যুবকের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন ক্যাথার্লি—ছয় ফুটের উপর লম্বা ঐ দীর্ঘকায় মানুষটির প্রশস্ত স্কন্ধ ও পেশীবহুল দেহ যেন অফুরন্ত শক্তির আধার।

শিকারীর মনে হল মানবের ছদ্মবেশে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে এক কৃষ্ণকায় দানব।

দানব বুঝল ক্যাথার্লি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, দন্তবিকাশ করে সে ইংরেজীতে জানিয়ে দিলে তার নাম 'টোনিও'।

ক্যাথার্লি খুশী হলেন—টোনিও কেবল অসাধারণ দেহের অধিকারী নয়, তার মস্তিষ্কও যথেষ্ট উন্নত। মোটবাহকদের দলের মধ্যে টোনিও হচ্ছে একমাত্র লোক যে ইংরেজী ভাষা বুঝতে পারে এবং বলতে পারে।

কিন্তু সবচেয়ে যে বস্তুটি ক্যাথার্লির বিস্মিত দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল সেটি হচ্ছে টোনিওর হাতের বর্শা। সাধারণ বর্শার মতো কাষ্ঠদণ্ডের সঙ্গে ধারালো লৌহার ফলা আটকে এই অস্ত্রটি তৈরি করা হয় নি—একটি সরল লৌহদণ্ডকে বর্শার মতো ব্যবহার করছিল টোনিও।

ঐ লোহার ডাণ্ডার মুখটা ছিল সরু আর ধারালো। গুরুভার অস্ত্রটিকে অতি সহজেই বহু দূরে নিক্ষেপ করতে পারতো টোনিও এবং তার নিশানাও ছিল পাকা, সহজে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

এমন একটি 'মনুষ্য-রত্ন' পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ক্যাথার্লি, তাঁর প্রধান পথপ্রদর্শকের পদে বহাল হল টোনিও...

কয়েকদিন পরেই ঘটল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

টোনিওকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাথার্লি গিয়েছিলেন পাহাড়ের দিকে শিকারের সন্ধানে। তাঁবুতে যে কয়জন মোটবাহক ছিল তারা মাছ ধরবার জন্য যাত্রা করেছিল নদীর দিকে। সন্ধ্যার সময়ে ক্যাথার্লি টোনিওকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে দেখলেন তাঁবু শূন্য—জনপ্রাণীও সেখানে উপস্থিত নেই।

শিকারী প্রথমে বিশেষ চিন্তিত হন নি। কিন্তু ঘড়িতে যখন নয়টা বাজল তখন তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। আফ্রিকার জঙ্গলে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত কেউ তাঁবুর বাইরে থাকে না—অন্ধকারের অন্তরালে শ্বাপদসংকুল অরণ্য তখন মৃত্যুর বিচরণভূমি...

অবশেষে তাঁবুর কাছে যে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল তারই আলোতে দেখা গেল লোকগুলি ফিরে আসছে।

আসছে বটে তবে স্বাভাবিকভাবে নয়।

মাটির উপর দিয়ে হেঁটে আসছে তিনটি লোক। চতুর্থ ব্যক্তিকে গাছের ডাল দিয়ে তৈরী একটা বিছানার উপর শুইয়ে তার তিন সঙ্গী ঐ শয্যাটিকে বহন করছে।

কাষ্ঠনির্মিত ঐ বিছানা তারা নামিয়ে রাখল ক্যাথার্লির সম্মুখে। শয্যার দিকে দৃষ্টিপাত করে চমকে উঠলেন ক্যাথার্লি—

প্রকৃতির উপহার দুর্ভেদ্য শিরস্ত্রাণ
"BOSS OF THE HORNS"

হাড়গোড়ভাঙ্গা অবস্থায় যে রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডটা কাঠের বিছানার ভিতর পড়ে আছে তার সঙ্গে মনুষ্যদেহের কোনও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল! ক্যাথার্লির মনে হল একটা গুরুভার বস্তুর নীচে মানুষটাকে পিষে ফেলা হয়েছে!

মডিদের ভাষা জানতেন না ক্যাথার্লি। টোনিও সঙ্গীদের কাছে সমস্ত ঘটনা শুনল, তারপর কম্পিতকণ্ঠে ইংরেজী ভাষায় যে কাহিনীটি সে পরিবেশন করল তা হচ্ছে এই—

নদী থেকে মাছ ধরে মোটবাহকেরা ফিরে আসছিল। হঠাৎ একটা কেপ-বাফেলোর

সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। মহিষটা খুব ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। ঐ সময়ে যদি তারা চুপচাপ সরে পড়তো তাহলে বোধহয় কোনও দুর্ঘটনা ঘটতো না। মহিষ কাছে এসে লোকগুলিকে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করছিল। খুব সম্ভব কাছাকাছি এসে কৌতূহল নিবৃত্ত করে সে আবার প্রস্থান করতো—বিনা কারণে সাধারণতঃ কেপ-বাফেলো মানুষকে আক্রমণ করে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ মডিদের মধ্যে একজন মহিষটাকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল। লোকটির নিক্ষিপ্ত অস্ত্র লক্ষ্যভেদ করল বটে কিন্তু মহিষ একটুও কাবু হল না—মডিদের মাছ-মারা বর্শার খোঁচায় ঐ দুর্দান্ত জানোয়ারের কি হবে!

লাঙ্গি নামক যে যুবকটি বর্শা নিক্ষেপ করেছিল আহত মহিষ তার দিকেই তেড়ে এল।

দলের সবাই ছুটে গাছে উঠে পড়ল, কিন্তু লাঙ্গি পালাতে পারল না—ক্ষিপ্ত মহিষ শিং-এর আঘাতে তার পেট চিরে ফেলল। রক্তাক্ত ও বিদীর্ণ উদর নিয়ে ধরাশায়ী হল লাঙ্গি।

মহিষের ক্রোধ তবু শান্ত হল না—সে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর দেহের উপর।

বিপুলবপু মহিষের পায়ের তলায় চূর্ণ হয়ে গেল হতভাগ্যের অস্থি-পঞ্জর। অনেকক্ষণ ধরে অভাগার দেহের উপর চলল মহিষাসুরের তাণ্ডবনৃত্য—অবশেষে ঐ দানব অদৃশ্য হল অরণ্যের অন্তরালে...

গাছের উপর যারা ছিল তারা অনেকক্ষণ নীচে নামতে সাহস করে নি। মহিষের প্রস্থানের পর প্রায় তিন ঘণ্টা পরে গাছ থেকে নেমে এল তিনটি ভয়ার্ত মানুষ এবং গাছের ডাল কেটে একটা বিছানা তৈরী করে মৃত সঙ্গীর দেহটাকে সেই কাষ্ঠনির্মিত শয্যায় শুইয়ে দিলে। তারপর সেই অপরূপ শবাধার বহন করে তারা তাঁবুতে ফিরে আসে...

পরদিন সকালে গুলিভরা রাইফেল হাতে ক্যাথার্লি ঐ খুনী মহিষটার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। নিহত যুবকের বর্শার আঘাতে আহত হয়েছিল মহিষ—ক্ষতস্থান থেকে নিঃসৃত রক্তের চিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চললেন শ্বেতাঙ্গ শিকারী, তাঁর সঙ্গে চলল টোনিও এবং আরও দুজন মডি যুবক।

রক্তের চিহ্ন অনুসরণ করতে করতে নদীর ধরে এসে সকলে দেখল একটা মস্ত বাঁশবনের শেষে ঘন 'পাপিরাস' ঘাসের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে রক্তরেখা—

অর্থাৎ ঐ ঘাসঝোপের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করেছে মহিষ।

সকলেই বুঝল ঐ ঘন ঘাসঝোপের ভিতর পদার্পণ করলে পৈতৃক প্রাণটিকে ওখানেই রেখে আসতে হবে। ক্যাথার্লি সাহসী শিকারী, কিন্তু তিনি শিকার করতে এসেছিলেন, আত্মহত্যা করতে আসেন নি—

বাঁশবনের সামনে ঝোপের মুখোমুখি দাঁড়ালেন শিকারী, তাঁর আদেশে টোনিও এবং তার দুই সঙ্গী পাপিরাস ঝোপে আগুন লাগিয়ে দিলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, ঝোপটাকে ঘিরে নেচে উঠল লেলিহান অগ্নিশিখা...

আচম্বিতে জ্বলন্ত ঝোপ ভেদ করে তিনটি মানুষের সামনে আবির্ভূত হল ক্রুদ্ধ মহিষাসুর!

মহিষ ছুটে এল মানুষগুলির দিকে।

গর্জে উঠল ক্যাথার্লির রাইফেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ গুলি লাগল মহিষের মাথায়—ইস্পাতের মতো কঠিন অস্থি-আবরণের উপর ফেটে গেল রাইফেলের টোটা!

দ্বিগুণ বেগে ধেয়ে এল মহিষ!

একজন মডি সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, তারপর পিছন ফিরে পা চালিয়ে দিলে তীরবেগে। অভাগা জানতো না যে ধাবমান শিকারের দিকেই সর্বাগ্রে আকৃষ্ট হয় হিংস্র পশু—

মহিষ তৎক্ষণাৎ লোকটিকে অনুসরণ করল।

আবার অগ্ন্যুদগার করে গর্জে উঠল ক্যাথার্লির রাইফেল—উপরি-উপরি দুবার।

গুলির আঘাতে মহিষ হাঁটু পেতে বসে পড়ল।

যে লোকটি ছুটে পালাচ্ছিল সে ততক্ষণে প্রায় বাঁশবনের কাছে এসে পড়েছে—পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করে সে দেখল মহিষ ভূতলশায়ী, সে থেমে গেল।

সগর্জনে উঠে দাঁড়াল মহিষ, শরীরী ঝটিকার মতো ধেয়ে এল পলাতক শিকারের দিকে। মডি যুবক আবার ছুটতে শুরু করল, বাঁশবনের অন্ধকারের গর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেল ধাবমান দ্বিপদ ও চতুষ্পদ, শিকার ও শিকারী...

রাইফেল বাগিয়ে ক্যাথার্লি ছুটলেন তাদের পিছনে।

একটা বাঁক ঘুরতেই ক্যাথার্লি দেখলেন মহিষ প্রায় লোকটির ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। আবার গুলি চালালেন শিকারী, তাঁর লক্ষ্য ব্যর্থ হল। পরক্ষণেই মহিষের নিষ্ঠুর শিং দুটো লোকটিকে মাটির উপর ফেলে দিল—ক্যাথার্লি দেখলেন নিগ্রো যুবকের পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করে আত্মপ্রকাশ করেছে এক ভয়াবহ ক্ষতচিহ্ন!

একবার আর্তনাদ করেই লোকটি মৃত্যুবরণ করল।

মহিষ এইবার ক্যাথার্লির দিকে ফিরল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে শিকারী সভয়ে আবিষ্কার করলেন তাঁর রাইফেলে আর একটিও গুলি নেই! কম্পিতহস্তে তিনি তাড়াতাড়ি নূতন টোটা ভরার চেষ্টা করতে লাগলেন...

ক্যাথার্লির সামনে এসে পড়ল মহিষ।

তখনও তিনি টোটা ভরার চেষ্টা করছেন—এখনই বুঝি একজোড়া ধারালো শিং-এর আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় শিকারীর দেহ...

অকস্মাৎ একটি দীর্ঘাকার মানুষ লাফ দিয়ে ছুটে এল মহিষের দিকে—টোনিও!

পিছন দিকে শরীর দুলিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল টোনিও—জীবন্ত বিদ্যুৎরেখার মতো শূন্যে রেখা কেটে ছুটে এল তার হাতের বর্শা এবং মুহূর্তের মধ্যে মহিষের চিবুক ভেদ করে চোয়ালের দুই দিকে ঝুলতে লাগল বর্শার লৌহদণ্ড!

মহিষ ঐ আঘাত গ্রাহ্যই করল না, নীচু হয়ে ক্যাথার্লির উদ্দেশ্যে প্রচণ্ডবেগে চালনা করল ভয়ংকর দুই শৃঙ্গ—

কিন্তু ব্যর্থ হল তার আক্রমণ।

তার চোয়ালে আবদ্ধ বর্শার দুই প্রান্ত আটকে গেল দু'পাশের বাঁশগাছে।

শিং-এর পরিবর্তে তার মাথাটা ধাক্কা মারল শিকারীর দেহে এবং সেই দারুণ ধাক্কায় ছিটকে মাটির উপর চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলেন ক্যাথার্লি।

মহিষ তার শিং দুটিকে নামিয়ে আবার শিকারীর দেহে আঘাত করার চেষ্টা করল।

তার চেষ্টা সফল হল না। চোয়ালে আবদ্ধ সুদীর্ঘ লৌহদণ্ডের দুই প্রান্ত আবার আটকে গেল ধরাশায়ী শিকাবীব দুই পাশে অবস্থিত ঘনসন্নিবিষ্ট বাঁশগাছের গায়ে।

বাব বাব সজোরে ঝাঁকানি দিয়েও ক্রুদ্ধ মহিষ বর্শাটাকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারল না, তার চোয়াল বিদ্ধ করে মুখের দু'পাশে কাঁপতে লাগল টোনিওর বর্শা— এদিকে চার ফুট, ওদিকে চার ফুট।

ক্যাথার্লি তখনও প্রাণের মায়া ছাড়েন নি, কম্পিত হস্তে তখনও রাইফেলের টোটা ভরতে চেষ্টা করছেন।

কিন্তু তাঁর চেষ্টা বুঝি সফল হয় না—

মহিষ হঠাৎ পিছনের দুই পায়ে উঠে দাঁড়াল, এইবার তার সামনের দুই পা প্রচণ্ড বেগে এসে পড়বে শিকারীর বুকের উপর, সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে যাবে শিকারীর বক্ষপঞ্জর—

ঠিক সেই মুহূর্তে ছুটে এল টোনিও, তারপর মহিষের মুখের দু'ধারে বিদ্ধ বর্শাদণ্ডের এক প্রান্ত ধরে মারল হ্যাঁচকা টান!

কী অসীম শক্তি সেই বন্য যুবকের দেহে—দারুণ আকর্ষণে ঘুরে গেল মহিষ, আবার ব্যর্থ হল তার আক্রমণ!

ভীষণ আক্রোশে ঘুরে দাঁড়িয়ে নূতন শত্রুকে আক্রমণ করার উপক্রম করল মহিষাসুর, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথার্লির রাইফেল সগর্জনে অগ্নিবর্ষণ করল।

কর্ণমূল ভেদ করে রাইফেলের গুলি মহিষের মস্তিষ্কে বিদ্ধ হল, পরমুহূর্তেই মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল সেই ভয়ানক জানোয়ারের প্রাণহীন দেহ।

এতক্ষণ পরে ক্যাথার্লি তাঁর রাইফেলে গুলি ভরতে পেরেছেন!

ক্যাথার্লির মতোই আর একজন সাদা চামড়ার মানুষ স্থানীয় নিগ্রোদের অদ্ভুত সাহসের পরিচয় পেয়ে চমকে গিয়েছিলেন। ঐ ভদ্রলোকের নাম কম্যাণ্ডার এ গণ্ডি। তিনি ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একজন সৈনিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পূর্বোক্ত সৈনিক কিছুদিন আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। সেই সময় আফ্রিকার 'অ্যাংকোলে' জাতীয় নিগ্রো শিকারীদের মহিষ শিকারের কৌশল স্বচক্ষে দেখেছিলেন তিনি। মানুষ যে ঠাণ্ডা মাথায় কতখানি সাহসের পরিচয় দিতে পারে, স্নায়ুর উপর তার সংযম যে কত প্রবল হতে পারে, তা দেখেছিলেন কম্যাণ্ডার গণ্ডি—ধনুর্বাণধারী এক অ্যাংকোলে শিকারীর বীরত্ব তাঁকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

তদানীন্তন বেলজিয়ান কঙ্গোর যে অঞ্চলে অ্যাংকোলে জাতি বাস করিত, সেই জায়গাটা প্রধানতঃ বন্য মহিষের বাসভূমি। বামন মহিষ নয়, অতিকায় মহিষাসুর কেপ-বাফেলোর ভয়াবহ উপস্থিতি অরণ্যকে করে তুলেছে বিপজ্জনক। অ্যাংকোলে নিগ্রোদের ভাষায় পূর্বোক্ত অতিকায় মহিষের নাম 'জোবি'। স্থানীয় মানুষ অর্থাৎ অ্যাংকোলে জাতির নিগ্রোরা খুব লম্বা-চওড়া নয়—বেঁটে-খাটো, রোগা ও অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির এই মানুষগুলোকে দেখলে অপরিচিত বিদেশীর পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয় যে, প্রয়োজন হলে ঐ ছোটখাটো মানুষগুলো কতখানি দুঃসাহসের পরিচয় দিতে পারে। আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে নিগ্রোরা ফাঁদ পেতে অথবা মহিষের চলার পথে গর্ত খুঁড়ে মহিষ-শিকারের চেষ্টা করে, কিন্তু অ্যাংকোলে-শিকারী অমন নিরাপদ পন্থায় শিকারকে ঘায়েল করার পক্ষপাতী নয়। কোন্ বিস্মৃত যুগে অ্যাংকোলে জাতির পূর্বপুরুষ আবিষ্কার করেছিল মহিষ-চরিত্রের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য—মরা মানুষকে মহিষ আঘাত করে না। তারপর থেকেই যুগ-যুগান্তর ধরে অ্যাংকোলে শিকারীরা যে পদ্ধতিতে মহিষ শিকার করে থাকে, সেই বিপজ্জনক পদ্ধতির অনুসরণ করার সাহস অন্য কোনও জাতিরই নেই। কম্যাণ্ডার গণ্ডি একবার আংকোলে জাতির মহিষ-শিকারের কায়দা দেখেছিলেন। সমস্ত ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখার পর তিনি বলেছিলেন, সাদা কিংবা কালো চামড়ার অন্য কোন জাতির শিকারী ঐভাবে অপঘাত মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে সাহস করবে না। নিজের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কম্যাণ্ডার সাহেব জানিয়েছিলেন, পৃথিবীর সেরা লক্ষ্যভেদী শিকারী যদি কাছেই রাইফেল বাগিয়ে বসে থাকে, তাহলেও অ্যাংকোলে জাতির পদ্ধতিতে মহিষ শিকার করতে তিনি রাজী নন।

ঘটনাটা এইবার বলছি। একটি ছোটখাটো চেহারার অ্যাংকোলে শিকারী কম্যাণ্ডার গণ্ডিকে তাদের মহিষ-শিকারের পদ্ধতি দেখাতে রাজী হয়েছিল। অবশ্য লোকটি আগে সাহেবের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল যে, কোন কারণেই তিনি উক্ত শিকারীকে বাধা দিতে পারবেন না এবং শোচনীয় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখলেও গুলি চালাবেন না। একটা উঁচু গাছের উপর কম্যাণ্ডার সাহেব যখন বসলেন, তখনই অ্যাংকোলে-শিকারী তার কর্তব্যে মনোনিবেশ করল।

মুক্ত প্রান্তরের উপর এখানে-ওখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল ছোট ছোট হলুদ রং-এর ঘাসঝোপ। ঐ রকম একটি ঘাসঝোপের ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটি। অস্ত্রের মধ্যে তার সঙ্গে ছিল তীর-ধনুক আর একটা ছোট ছুরি।

দুই চোয়ালের বজ্র-দংশনে চেপে ধরলো কর্ণেলকে —

পলকে টারজানের একটি জুতোসুদ্ধ পা ধরে ফেলল রেড।

গাছের উপর থেকে খুব মনোযোগের সৃঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে সাহেব আবিষ্কার করলেন, দূর প্রান্তরের সীমানায় যেখানে এক সারি সবুজ ঘাস আত্মপ্রকাশ করেছে, সেইখানে বিচরণ করছে অনেকগুলো কৃষ্ণকায় চতুষ্পদ মূর্তি—মহিষ!

প্রান্তরের বুকে তৃণ-ভোজনে ব্যস্ত মহিষযূথের পিছনে বাঁ দিকে অবস্থান করছে এক ভীষণদর্শন পুরুষ মহিষ। সাহেব বুঝলেন ঐ জন্তুটাই হচ্ছে দলের প্রহরী এবং অ্যাংকোলে-শিকারীর লক্ষিত 'জোবি'—ওকেই হত্যা করার চেষ্টা করবে ছোটখাটো মানুষটি।

গাছের উপর থেকে সাহেব দেখলেন ঘাসঝোপের ভিতর থেকে হঠাৎ মহিষের খুব কাছেই আবির্ভূত হল একটি মনুয্যমূর্তি—অ্যাংকোলে-শিকারী!

লোকটি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। গাছের উপর থেকে তার শরীরটা সাহেবের দৃষ্টিগোচর হলেও মাটিতে দাঁড়িয়ে মহিষের পক্ষে লোকটিকে দেখা সম্ভব ছিল না। লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে চটপট ধনুক থেকে তীব নিক্ষেপ করে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ধনুকের টংকার-শব্দ সাহেবের কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা সংঘাতের আওয়াজ এবং জান্তব কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি—মহিষের স্কন্ধে বিদ্ধ হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে একটা তীর।

'সর্বনাশ', সাহেব মনে মনে বললেন, 'এইবার তীরবিদ্ধ মহিষ নিশ্চয়ই হাঁক দিয়ে দলকে সংকেত জানাবে। সেই শব্দ শোনামাত্র মহিষের দলটা ছুটে আসবে অ্যাংকোলে-শিকারীর দিকে।'

সেরকম কিছু হল না। আহত মহিষ একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করল, বিরক্তভাবে দুই-একবার মাথা নাড়ল, মনে হল একটা বিরক্তিকর মাছিকে সে তাড়াতে চেষ্টা করছে—তারপর চারদিকে সঞ্চালিত করল তীক্ষ্ণদৃষ্টি—যেন এক গোপন শত্রুকে সে আবিষ্কার করতে চাইছে!

উদ্বেগজনক কয়েকটি মুহূর্ত...মহিষযূথ সরে যাচ্ছে দূরে...সঙ্গীদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে তীরবিদ্ধ মহিষ। সে এখনও বুঝতে পারছে না সঙ্গীদের অনুসরণ করা উচিত, না তাদের ফিরে আসার জন্য হাঁক দেওয়া উচিত। মহিষ তার কর্তব্য স্থির করার সময় পেল না, অ্যাংকোলে-শিকারী তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে আবার তীর ছুঁড়ল, তারপর শুয়ে পড়ল মাটিতে। দ্বিতীয় তীরটা ঘাড়ের উপর বিঁধতেই ক্ষেপে গেল মহিষ। লোকটিকে সে দেখতে পায় নি বটে, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধরা পড়েছে ধনুকের অস্পষ্ট টংকার ধ্বনি—শব্দের দিক্ নির্ণয় করতেও মহিষের ভুল হল না।

যেদিক থেকে শব্দ এসেছে, সেইদিকেই ছুটল মহিষ...কিন্তু সোজা নয়—বৃত্তের আকারে গোল হয়ে ঘুরে জন্তুটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাতাস থেকে শত্রুর গায়ের গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। সাহেব যে গাছটার উপর আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই গাছ আর শায়িত নিগ্রো শিকারীর মধ্যবর্তী স্থানের মাঝামাঝি এসে মহিষ বোধহয় মানুষের গায়ের গন্ধ পেল, সে থমকে দাঁড়াল, বারবার বাতাসে ঘ্রাণ গ্রহণ করল—তারপর আবার কয়েক পা এগিয়ে বাতাস শুঁকতে লাগল...অবশেষে মানুষটাকে সে আবিষ্কার করে ফেলল। ঠিক যে জায়গায় শুয়েছিল নিগ্রো শিকারী, সেই দিকেই ছুটল মহিষ। দিক্ নির্ণয়ে তার একটুও ভুল হয় নি, পদভরে মাটি কাঁপিয়ে সে ধেয়ে এল উল্কা বেগে।

গাছের উপর থেকে সাহেবের মনে হল, ধরাশায়ী মানুষটার উপর এসে পড়েছে একজোড়া

প্রকাণ্ড শিং, এই বুঝি হতভাগ্য শিকারীকে মাটিতে গেঁথে দেয় একজোড়া জান্তব তরবারি। কিন্তু সেই রক্তাক্ত দৃশ্যে সাহেবের দৃষ্টি পীড়াগ্রস্ত হওয়ার আগেই অকুস্থল থেকে একটি ধুলোর মেঘ লাফিয়ে উঠে তাঁর দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করল। একটু পরেই জোর বাতাসের ধাক্কায় সরে গেল ধুলো। সাহেব দেখলেন, অ্যাংকোলে-শিকারী অক্ষত অবস্থায় মাটিতে আর তার সামনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে মহিষ। জন্তুটা অস্থিরভাবে মাটিতে পদাঘাত করছে এবং তার নাসিকা ও কণ্ঠ থেকে উদগীর্ণ হচ্ছে অবরুদ্ধ রোষের ভয়াবহ ধ্বনি।

কম্যাণ্ডার সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখলেন মহিষ পিছন ফিরল। কিন্তু না—অত সহজে রেহাই দিল না যমদূত—ক্ষণিকের জন্য লাফিয়ে সরে গিয়েছিল মহিষ, তৎক্ষণাৎ ঘুরে এসে আবার মানুষটাকে পরীক্ষা করতে লাগল সে।

লোকটি একটুও নড়ছে না, তার ধরাশায়ী দেহে কোথাও জীবনের লক্ষণ নেই। তার সর্বাঙ্গে পড়ছে মহিষের তপ্ত নিঃশ্বাস, কানে আসছে রক্ত-জল-করা গর্জনধ্বনি, খুরের আঘাতে কাঁপছে তার পাশের মাটি—তবু অ্যাংকোলে-শিকারীর দেহ নিস্পন্দ, নিশ্চল!

সাহেব অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, নিজের উপর কতখানি কর্তৃত্ব থাকলে ঐ অবস্থায় মড়ার ভান করে পড়ে থাকা যায়!

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করার পর মহিষ ফিরে গেল। লোকটি তখনও ধরাশয্যা ত্যাগ করার চেষ্টা করল না। ভালই করল, কারণ একটু দূরে গিয়েই আবার ফিরল মহিষ। আগের মতোই শায়িত মনুষ্যদেহের চারপাশে চলল মহিষাসুরের আস্ফালন, পরীক্ষা-নিরীক্ষণ, তারপর আবার ফিরে অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করল জন্তুটা।

সাহেবের সর্বাঙ্গ দিয়ে তখন ঘাম ছুটছে। তিনি এতক্ষণে বুঝেছেন কেন অ্যাংকোলে জাতি এমন বিপজ্জনক পদ্ধতিতে মহিষ শিকার করে। তীরের বিষ মহিষের দেহে প্রবেশ করার অনেক পরে তার মৃত্যু হয়। একশো ফুটের বেশী দূর থেকে তীর ছুঁড়ে মহিষকে কাবু করা সম্ভব নয়—কারণ, দূরত্ব বেশী হলে নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাত করার ক্ষমতা কমে যায়। একশো ফুটের মধ্যে গাছে উঠে মহিষকে আঘাত করাও অসম্ভব—তীরের নাগালের মধ্যে আসার আগেই মহিষের দৃষ্টি বৃক্ষে উপবিষ্ট শিকারীর দিকে আকৃষ্ট হবে এবং সে সবেগে স্থান ত্যাগ করবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাটিতে দাঁড়িয়ে কোনও গোপন স্থান থেকে মহিষকে তীরবিদ্ধ করলে শিকারীর মৃত্যু অনিবার্য; মহিষের তিনটি ইন্দ্রিয়ই শক্তিশালী—চক্ষু-কর্ণ-নাসিকার ত্র্যহস্পর্শ যোগে মহিষ চটপট শিকারীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করে তার দিকে ধাবিত হবে এবং তীরের বিষ মহিষের রক্তে সঞ্চারিত হয়ে তার মৃত্যু ঘটানোর আগেই তীক্ষ্ণ শিং আর খুরের আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত এক মাংসপিণ্ডে পরিণত হবে শিকারীর দেহ! ছুটে পালানো সম্ভব নয়, মানুষ আর মহিষের দৌড় প্রতিযোগিতায় মানুষের জয়লাভের কোন আশাই নেই।

মৃতদেহের প্রতি মহিষের অহিংস মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ না করলে অ্যাংকোলে-শিকারীর

পক্ষে অন্য কোন উপায়ে মহিষ-মাংস সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, সেইজন্যই ধনুর্বাণ-সম্বল অ্যাংকোলে জাতি এমন বিপজ্জনক ভাবে মহিষ শিকারে প্রবৃত্ত হয়।

আচ্ছা, এইবার কাহিনীর পূর্ব সূত্র ধরে দেখা যাক আমাদের পরিচিত অ্যাংকোলে-শিকারীর ভাগ্যে কি ঘটল। মহিষ আরও কয়েকবার শিকারীর কাছে এসে ফিরে গেল—পাঁচ-পাঁচ বার ঐভাবে ছুটোছুটি করার পর মহিষ যখন আরও একবার ঘুরে আসছে, সেই সময় সাহেব দেখলেন জন্তুটা হঠাৎ হাঁটু পেতে বসে পড়ল—তারপর এক ডিগবাজি খেয়ে সশব্দে শয্যাগ্রহণ করল মাটির উপর, আর উঠল না।

সাহেব বুঝলেন মহিষের মৃত্যু হল, এতক্ষণ পরে কার্যকরী হয়েছে তীরের বিষ!

মহিষের মৃতদেহ থেকে প্রায় পনের ফুট দূরে শায়িত একটা নিশ্চল মনুষ্যমূর্তি হঠাৎ সচল হয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর দূরবর্তী মহিষযূথের প্রস্থান পথের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সর্বাঙ্গ থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলল এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো টান করে আড়ষ্টভাব কাটিয়ে নিয়ে বাঁ হাতে আটকানো খাপ থেকে ছুরিটা টেনে নিজ বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর একবার ছুরির ধার পরখ করে নিয়ে অ্যাংকোলে-শিকারী তার পরবর্তী কর্মসূচী অনুসরণ করতে উদ্যত হল।

গাছ থেকে নেমে কম্যাণ্ডার সাহেব যখন লোকটির কাছে এসে পৌঁছালেন, সে তখন অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে 'জোবির' মৃতদেহ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নিতে ব্যস্ত। লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে সাহেবের মনে হল সে যেন খুব সহজভাবে একটা দোকানে বসে কসাই-এর কর্তব্য করছে—তার নির্লিপ্ত আচরণ দেখে কে বলবে একটু আগেই তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিল মূর্তিমান মৃত্যুদূত।

লোকটি মাথা না তুলেই সাহেবের উপস্থিতি অনুভব করল, নিবিষ্ট চিত্তে মৃত পশুর চামড়াতে ছুরি চালাতে চালাতে সে বলল, "একটু পরেই আমার পরিবারের সবাই এখানে এসে পড়বে। সূর্য ডুবে যাওয়ার আগেই এই চমৎকার মাংস তারা ঘরে নিয়ে যাবে।"

সাহেব বললেন, "কিন্তু জোবির বদলে যদি তারা তোমার মরা শরীরটা পড়ে থাকতে দেখত, তাহলে কি হত?"

নির্বিকার ভাবে শিকারী উত্তর দিল, "তাহলে আমার পরিবারের লোকরা ছেঁড়া-খোঁড়া শরীরের টুকরোগুলো নিয়ে গ্রামের পিছনে পুঁতে ফেলত। ঐখানে কোনও খারাপ প্রেতাত্মা যায় না।"

'বুড়ো'—একটি নাম,
নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আতঙ্কের কালো ছায়া...
দল নিয়ে নয়,
সম্পূর্ণ একক ভাবেই সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে
বাস করছিল 'বুড়ো'!
দলের প্রয়োজন ছিল না, বুড়ো একাই একশো!
বৃদ্ধ হলেও তার দেহে ছিল অসাধারণ শক্তি,
পায়ে ছিল বিদ্যুতের বেগ!

বুড়োর প্রসঙ্গে গল্পের অবতারণা করতে হলে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পুমা নামক জন্তুটির বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা দরকার। আমেরিকার অরণ্যময় পার্বত্য অঞ্চলে পুমার প্রিয় বাসভূমি। স্থানীয় বাসিন্দারা পুমাকে বিভিন্ন নামে ডাকে, সবচেয়ে প্রচলিত নামগুলো হচ্ছে—পুমা, কুগার এবং 'মাউন্টেন লায়ন' বা পার্বত্য সিংহ। পুমা অবশ্য সিংহ নয়, যদিও তার চেহারার সঙ্গে কেশরহীন সিংহের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। পুমার গায়ের রং ধূসর, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মস্ত বড় একটা বিড়ালের মতো। বিড়াল জাতীয় অন্যান্য জীব অর্থাৎ বাঘ, সিংহ, লেপার্ড বা নিকটস্থ প্রতিবেশী জাগুয়ারের মতো হিংস্র ও ভয়ানক নয় পুমা। নিতান্ত বিপদে পড়লে সে রুখে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু পলায়নের পথ খোলা থাকলে সে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে। যুদ্ধ-বিগ্রহের পক্ষপাতী সে নয়।

তাকে নিরীহ আখ্যা দিলে সত্যের
বিশেষ অপলাপ হয় না।
মাংসভোজী অন্যান্য শ্বাপদের তুলনায় নিরীহ হলেও
পুমা মাংসাশী জীব।

গরু, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশু তার খাদ্য তালিকার অন্তর্গত। সুযোগ পেলেই স্থানীয় অধিবাসীদের পোষা জানোয়ার মেরে সে শিকারের মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। সেইজন্য পার্বত্য অঞ্চলে অধিবাসীদের কাছে পুমা হচ্ছে চোখের বালির মতোই দুঃসহ।

উপদ্রুত অঞ্চলের পশুপালকরা অনেক সময় পুমাকে দল বেঁধে হত্যা করতে সচেষ্ট হয়—প্রয়োজন হলে তারা পুমার পিছনে লেলিয়ে দেয় শিক্ষিত শিকারী কুকুর। আগেই বলেছি পুমা খুব দুর্দান্ত জন্তু নয়, বরং তাকে শান্তিপ্রিয় ভীরু জানোয়ার বলা যায়। গৃহপালিত পশুকে সে বধ করে উদরের ক্ষুধা শান্ত করার জন্য—কিন্তু শিকারী কুকুরের সাহচর্য সে সভয়ে এড়িয়ে চলে। শিক্ষিত হাউণ্ড কুকুর অতি সহজেই পুমাকে আবিষ্কার করতে পারে। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল—পুমার গায়ের গন্ধ শুঁকে শুঁকে সারমেয় বাহিনী তাকে অনায়াসে গ্রেপ্তার করে ফেলে। বেচারা পুমা গাছে উঠেও রক্ষা পায় না, কুকুরগুলো গাছের তলায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে শিকারীকে পুমার অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। কুকুরের চিৎকার শুনে অকুস্থলে উপস্থিত হয় বন্দুকধারী শিকারী—পরক্ষণেই গাছের উপর থেকে ছিটকে পড়ে গুলিবিদ্ধ পুমার প্রাণহীন দেহ।

পুমা অনেক সময় গাছ থেকে নেমে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ সারমেয় বাহিনীর আক্রমণে তার দেহ হয়ে যায় ছিন্নভিন্ন—দলবদ্ধ শিকারী কুকুরের কবল থেকে পুমার কিছুতেই নিস্তার নেই।

কিন্তু 'ফ্ল্যাটহেড' অঞ্চলের 'বুড়ো' হচ্ছে নিয়মের ব্যতিক্রম। কুকুরদের সে ভয় করে না।

ওঃ! বুড়োর পরিচয় তো দেওয়া হয় নি।

বুড়ো হচ্ছে আমেরিকার ফ্ল্যাটহেড নামক পার্বত্য অঞ্চলের পুরাতন বাসিন্দা—পূর্ণবয়স্ক একটি পুমা।

ঐ এলাকার লোকজন তার নাম রেখেছিল 'বুড়ো'!

সমস্ত এলাকাটায় আতঙ্কের ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছিল বুড়ো নামধারী পুমা। গোশালার ভিতর থেকে লুঠ করে সে নিয়ে যেত নধর গো-বৎস, হত্যা করতো গরুগুলোকে।

এলাকার বিভিন্ন গোশালায় মূর্তিমান মৃত্যুর মতো হানা দিয়ে ঘুরতো ঐ খুনী জানোয়ার। রাতের পর রাত ধরে চলছিল মাংসাশী দস্যুর নির্মম অত্যাচার।

কুকুর লেলিয়ে দিয়েও বুড়োকে জব্দ করা যায় নি। কুকুরদের সে মোটেই ভয় পায় না এবং কুকুরের পশ্চাৎবর্তী শিকারীকে সে খুব সহজেই ফাঁকি দিতে পারে। বুড়োর গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে যখন কুকুরের দল এগিয়ে আসতে থাকে তখনই বুড়ো এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করে। নিজের চলার পথ ধরে হঠাৎ সে পিছন দিকে ঘুরে আসে, তারপর একটা উঁচু গাছের উপর উঠে নীচের দিকে লক্ষ্য রাখে। কিছুক্ষণ পরেই শিকারের দেহের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে করতে অকুস্থলে উপস্থিত হয় কুকুরের দল। যে পথ দিয়ে বুড়ো ফিরে এসেছে সেই পথের মাটি ও বাতাসে তখনও লেগে রয়েছে পুমার গন্ধ—অতএব কুকুরগুলো উপরের দিকে দৃক্‌পাত না করে শিকারের গন্ধ অনুসরণ করে এগিয়ে যায় সামনের দিকে...আচম্বিতে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতোই বৃক্ষশাখা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুড়ো সারমেয় বাহিনীর উপর।

প্রথম লাফের সঙ্গে সঙ্গেই সে একটা কুকুরকে শেষ করে দেয়, তারপর আক্রমণ করে কুকুরের দলটাকে। কুকুরগুলো ঘিরে ফেলে বুড়োকে, কিন্তু অতগুলো কুকুরের মিলিত আক্রমণও তাকে কাবু

করতে পারে না—বুড়োর নখরযুক্ত প্রচণ্ড থাবা বিদ্যুৎবেগে ঘুরতে থাকে সামনে, পিছনে, ডাইনে, বামে।

পশ্চাৎবর্তী শিকারী অকুস্থলে এসে দেখতে পায় তার পোষা কুকুরগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে আর অন্যগুলো আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় চিৎকার করছে আর্তস্বরে!

বিধ্বস্ত রণাঙ্গনে পুমার পদাঙ্ক দেখে শিকারী বুঝতে পারে তার কুকুরগুলোর দুর্দশার জন্যে দায়ী হচ্ছে বুড়ো। কিন্তু আর কিছু করার নেই—আহত কুকুরগুলোকে নিয়ে হতাশ শিকারী ঘরে ফিরে যায়...

এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে একবার নয়, দু'বার নয়, বারংবার!

যে কুকুরগুলো একবার বুড়োর কাছে মার খেয়েছে তারা বুড়োর গন্ধ পেলে আর সেদিক মাড়াতে চাইতো না। অবশ্য বুড়ো নিজেও যে অক্ষত থাকতো তা নয়, তবে সে কোনও বারই খুব সাংঘাতিকভাবে জখম হয় নি। অল্প-স্বল্প আঘাত পেলে সে গ্রাহ্যই করতো না।

ঐ অঞ্চলের পশুপালকরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল বুড়োর অত্যাচারে—গৃহপালিত গরুর মাংস ছিল তার প্রিয় খাদ্য। সব সময় সে যে কেবল ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্যই শিকার করতো তা নয়, হত্যা ছিল তার নেশা।

অনেক সময় দেখা গেছে নিহত গরুর মাংস সে ভক্ষণ করে নি, শুধু আনন্দ লাভের জন্যই সে শিকারকে হত্যা করেছে।

বুড়ো ছিল পাকা শয়তান।

কতবার শিকারীরা তাকে কুকুর নিয়ে ঘেরাও করেছে তার ঠিক নেই। প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে, এইবার আর বুড়োর রক্ষা নেই, কিন্তু প্রত্যেকবারই সে শিকারীদের ফাঁকি দিয়েছে।

ঐ অঞ্চলের শিকারী কুকুরগুলো তাকে ভয় করতো যমের মতো।

ফ্ল্যাটহেড নামক স্থানটিতে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে বীরবিক্রমে বাস করছিল বুড়ো, তাকে বাধা দেওয়ার মতো দ্বিপদ বা চতুষ্পদ সেখানে কেউ উপস্থিত ছিল না।

বুড়োর আর একটা বদনাম ছিল—সে নাকি নরখাদক!

বদনামটা অবশ্য কতদূর সত্যি সেই বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করতো, কারণ—পুমা নরমাংস পছন্দ করে না, পারতপক্ষে মানুষকে সে এড়িয়ে চলতে চায়।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ফ্ল্যাটহেড অঞ্চলে এমন একটি ঘটনা ঘটল যে স্থানীয় বাসিন্দারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হ'ল এই সৃষ্টিছাড়া পুমাটা সুযোগ পেলে মানুষকে হত্যা করে নরমাংস ভক্ষণ করতেও দ্বিধাবোধ করবে না।

ঘটনাটা বলছি—

জর্জ স্টেলর নামে একজন রাখাল একদিন কয়েকটা হারানো গরুর সন্ধানে ঐ অঞ্চলের 'হেল ক্রীক' নামক জায়গায় ঘোড়ায় চড়ে টহল দিতে থাকে।

(ঐ অঞ্চলের রাখালরা অশ্বারোহণে চলাচল করতে অভ্যস্ত। ঘোড়ার পিঠ থেকে ল্যাসো বা দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে তারা পলাতক গরু-বাছুরকে বন্দী করে।)

সাবাদিন জর্জের দেখা পাওয়া গেল না।

গভীর রাত্রে ফিবে এল জর্জের ঘোড়া—তার পৃষ্ঠদেশ শূন্য, আরোহী নেই!

একটি সপ্তাহ ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘোড়ায় চড়ে অনুসন্ধান-পর্ব চালাল, কিন্তু জর্জের পাত্তা পাওয়া গেল না। প্রায় এক সপ্তাহ পরে একটা 'ফার' গাছের নীচে জর্জের অর্ধভুক্ত দেহ পাওয়া গেল। রাইফেলটা তার পাশেই পড়েছিল, তার থেকে একটিও গুলি খরচ হয় নি—অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে নিহত মানুষটি গুলি চালানোর সুযোগ পায় নি।

হ্যাঁ, 'নিহত মানুষ' বললাম—

মৃত্যুর কারণটা খুব স্পষ্ট ছিল, মৃতদেহের আশেপাশে নরম মাটির উপর খুবই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল পুমার পদচিহ্ন!

স্থানীয় অধিবাসীরা বললো, বুড়োই হচ্ছে এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক। ঐ গাছের উপর থেকে লাফ দিয়ে সে ঘোড়ার উপর উপবিষ্ট জর্জের ঘাড়ে পড়েছে এবং ঐখানেই মানুষটাকে হত্যা করে তার মাংস খেয়েছে। ভয়ার্ত অশ্ব ফিরে এসেছিল তার আস্তানায়, 'নরমাংস' ফেলে অশ্বমাংসের দিকে নজর দেয় নি বুড়ো।

ঐ এলাকায় অবশ্য আরও কয়েকটা পুমা ছিল।

কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের অভিমত হচ্ছে, পূর্বোক্ত হত্যাকাণ্ডের নায়ক হওয়ার যোগ্যতা রাখে একমাত্র বুড়ো! সে ছাড়া কোনও পুমা নরমাংসের লোভে মানুষকে আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।

...ঐ ঘটনার পর থেকে মাঝে মাঝে দু'একটি পথিকের নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদ আসতে লাগল। সংবাদগুলো হযতো সম্পূর্ণ সত্য নয়, হয়তো সেগুলো গুজব মাত্র।

কিন্তু স্থানীয় মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল দারুণ আতঙ্ক...

ইতিমধ্যে ফ্ল্যাটহেড অঞ্চলে পদার্পণ করেছিল একটি নতুন মানুষ। তার নাম অ্যালেন বর্ডার। সে বুড়োর কথা শুনল বটে কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব দিলে না। নরখাদক পুমা নরমাংসের লোভে মানুষ মারতে পারে, একথা বিশ্বাস করতে অ্যালেন রাজী হল না। এই বিষয়ে তার বক্তব্য হচ্ছে, মানুষটা হঠাৎ ঘোড়া থেকে কোনও কারণে পড়ে গিয়ে মারা পড়েছিল এবং ঐ মৃতদেহের মাংস খেতেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল একটি পুমা। মানুষ মেরে মাংস খায়, এমন পুমার গল্প তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়।

পরবর্তী জীবনে তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অ্যালেন জেনেছিল, নখদন্তে সজ্জিত শ্বাপদের খাদ্য তালিকার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই—

বন্য পশুর স্বভাব-চরিত্র বিশ্লেষণ করতে যদি ভুল হয় তবে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে সেই ভুলের পরিণাম মারাত্মক হতে পারে।

''বার-এক্স'' নামক র‍্যাঞ্চ বা গোশালায় চাকরি করতে এসেছিল অ্যালেন বর্ডার। তার আসার পর দু'মাস কাটল। ''বার-এক্স'' গোশালার দিকে আকৃষ্ট হল বুড়োর ক্ষুধিত দৃষ্টি।

গ্রীষ্মকাল। ঘোড়ায় চড়ে টহল দিচ্ছে অ্যালেন। হঠাৎ একটা জলাবিহীন শুষ্ক খাড়ির মধ্যে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল—জমির উপর শুধু রক্ত আর রক্ত! আশেপাশে রক্তাক্ত জমিটা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে সে বুঝতে পারল এখানে একটা ছোটখাট লড়াই হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, গুরুভার কোনও বস্তুকে যে মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই বিষয়েও সন্দেহ নেই।

জমির উপর দিয়ে ঐ ভারি জিনিসটাকে আকর্ষণ করার ফলে জমির উপর দাগ পড়েছে গভীর ভাবে। অ্যালেন কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে দাগটাকে অনুসরণ করলে। অপেক্ষাকৃত নরম মাটির উপর সে দেখতে পেল পুমার পায়ের ছাপ।

পদচিহ্নের অনুসরণ করতে করতে সে দেখল, পুমার পায়ের ছাপ হঠাৎ খাড়ির পার্শ্ববর্তী উঁচু পাড়ের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কাঁধের বন্দুক অ্যালেন হাতের উপর নামিয়ে নিল, তারপর খাড়া পাড় বেয়ে সে অতিকষ্টে উপরে উঠল। শুষ্ক নদীগর্ভ থেকে পাকা চল্লিশ ফিট উপরে উঠে সে দেখল তারই গোশালায় পালিত একটি পরিচিত গো-বৎসের মৃতদেহ সেখানে রয়েছে এবং নিহত বাছুরের চারপাশে জমির উপর ফুটে উঠেছে অতিকায় বিড়ালের পাঞ্জার মতো পুমার পদচিহ্ন!

অ্যালেন বুঝল, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী বুড়ো। খুব শক্তিশালী পুমার পক্ষেও একটা বাছুর ঘাড়ে নিয়ে খাড়ির ঢালু পাড় ভেঙ্গে চল্লিশ ফিট উপরে ওঠা সম্ভব নয়। পুমা-শাস্ত্র-বহির্ভূত এমন অসম্ভব কর্ম সম্ভব করার মতো অসাধারণ দৈহিক ক্ষমতা যার আছে সে হচ্ছে বুড়ো।

স্থানীয় অধিবাসীরা ঐ ভয়ংকর জন্তুটার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। বুড়োকে যে মারতে পারবে তাকে ২৫০০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

অ্যালেন ঠিক করলে আজ বুড়োকে হত্যা করে পুরস্কারের টাকাটা সে বাগিয়ে নেবে। সে তৎক্ষণাৎ নিজের আস্তানায় ফিরে গেল এবং দুটো ভালুক-ধরা ফাঁদ নিয়ে এসে মরা বাছুরের দু'পাশে দু'দুটো ফাঁদ সাজিয়ে রাখল।

অ্যালেন দেখেছিল বুড়ো মরা বাছুরটাকে হত্যা করেছে বটে কিন্তু তার মাংস খায় নি! অতএব সেইদিন সন্ধ্যার পরেই যে নিহত শিকারের মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার জন্য বুড়ো অকুস্থলে পদার্পণ করবে, এই বিষয়ে অ্যালেনের সন্দেহ ছিল না কিছুমাত্র।

দু'টি ফাঁদকেই এমনভাবে সাজিয়েছিল অ্যালেন যে হতভাগা বুড়ো যেদিক দিয়েই আসুক না কেন, ফাঁদের ভিতর পদক্ষেপ না করে সে বাছুরের দেহ স্পর্শ করতে পারবে না—একটা না একটা ফাঁদের ভিতর তার পা পড়বেই পড়বে।

বুড়োর অসাধারণ দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিল অ্যালেন। ফাঁদের পা পড়লে সে যে ফাঁদ ভেঙ্গে পলায়ন করার চেষ্টা করবে, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু অ্যালেনের ফাঁদ দুটো বুড়োর চেয়েও শক্তিশালী—গ্রিজলি ভাল্লুকের মতো ভয়ংকর মাংসাশী দানবও ঐ ফাঁদের বজ্র-দংশন চূর্ণ করে পালাতে পারে না। যতই শক্তিশালী হোক, গ্রিজলির তুলনায় বুড়ো তো শিশুমাত্র—অতএব পুরস্কার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে তোফা একটি ঘুম লাগাল অ্যালেন...

তার পরবর্তী দিবসের অভিজ্ঞতা অতি তিক্ত।

বুড়ো মৃত গো-বৎসের ধারে কাছেও যায় নি, র‍্যাঞ্চ থেকে সে নূতন শিকার তুলেছে! বড়দিনের ভোজের জন্যে একজোড়া শূকর শিশুকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করেছিল অ্যালেন। হতভাগা পুমা সেই দুটোকেই ধরে নিয়ে গেছে!

তারপর থেকে বুড়ো নিয়মিত ভাবে অ্যালেনের চাকুরিস্থল "বার-এক্স" গোশালায় হানা দিতে লাগল। রাত জেগে পাহারা দেবার ব্যবস্থা হল, কিন্তু প্রহরীরা বুড়োকে বাধা দিতে পারে না, এক মুহূর্তের জন্যে প্রহরীর চোখে পড়ে অন্ধকারের মধ্যে আরও অন্ধকার একটা সচল ছায়ামূর্তি গিরগিটির মতো এগিয়ে যাচ্ছে বেড়ার ভিতর অবরুদ্ধ গরুগুলোর দিকে...প্রহরীর উদ্যত বন্দুক নিশানা স্থির করার আগেই যেন জাদুমন্ত্রের ভেল্‌কি লাগিয়ে ভূমিলগ্ন সরীসৃপ এক অতিকায় মার্জারের রূপ ধরে লাফিয়ে পড়ে বেড়ার ভিতর অবস্থিত গরুর পালের মধ্যে!

পুমা!!

পরক্ষণেই স্তম্ভিত প্রহরীর শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে ভেসে আসে গরুর পালের ভয়ার্ত চিৎকার ও ধাবমান ক্ষুরধ্বনি!

প্রহরীর অন্ধকারে-অন্ধ দৃষ্টি গরুর পালের ছুটোছুটির মধ্যে পুমার দেহটাকে কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারে না। বেড়ার ভিতর মাংসাশীর আবির্ভাবে আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওঠে গরুর পাল—ভয়ার্ত পশুগুলি দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে থাকে এবং কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই তাদের ধাবমান দেহগুলি অদৃশ্য হয়ে যায় নিকটবর্তী পর্বত ও অরণ্যের অন্ধকার গর্ভে।

বুড়ো তখন তাদের পিছু নেয়। সুযোগ-সুবিধা বুঝে পছন্দসই একটা গরু অথবা বাছুর মারে, তারপর দিনের আলো ফোটার আগেই নিহত শিকারের বিপদজনক সান্নিধ্য ত্যাগ করে নিবিড় অরণ্য অথবা পর্বতগুহার মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। বুড়ো ভারি সেয়ানা—সে জানে, দিনের আলো ফোটার সঙ্গে

সঙ্গে এখানে কুকুর নিয়ে ছুটে আসবে সশস্ত্র মানুষ। কুকুরদের সে ভয় করে না বটে কিন্তু বন্দুকধারী মানুষকে সে এড়িয়ে চলতে চায়; বেশ কয়েকবার গরম-গরম বুলেটের কামড় খেয়ে বুড়ো বন্দুকের মহিমা বুঝে গেছে—প্রকাশ্য দিবালোকে সে কখনও মানুষকে মুখ দেখায় না।

তার পায়ের ছাপ ধরে ধরে শিক্ষিত কুকুর নিয়ে কয়েকবার শিকারীরা তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে। বুড়ো তখন জঙ্গল ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে দুর্গম পার্বত্য ভূমির উপর। মানুষে পক্ষে বিপদসঙ্কুল ঐ সব গিরিপথ বেয়ে পুমার পিছনে ছোটা সম্ভব নয়—সাধারণতঃ এই সব ক্ষেত্রে শিকারীর সারমেয় বাহিনী পুমাকে তাড়িয়ে আনে বন্দুকধারী মনিবের সামনে অথবা তাদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে প্রাণ বিসর্জন দেয় পুমা।

কিন্তু এই অঞ্চলের কুকুরগুলো জানে 'এ পুমা সে পুমা নয়'!

বুড়োকে তারা হাড়ে হাড়ে চেনে!

বন্দুকধারী মানুষের সান্নিধ্য ছেড়ে বুড়োর পিছনে তাড়া করতে কুকুর বাহিনী রাজী হয় না। তারা জানে বুড়ো ভারি পাজি জানোয়ার—তার সামনে গেলে সাংঘাতিক মার খেতে হয়, এমন কি প্রাণহানির সম্ভাবনাও আছে বিলক্ষণ!

সুতরাং প্রভুর আদর, উৎসাহ, তিরস্কার, পদাঘাত, সবকিছু তুচ্ছ করে কুকুরগুলো একেবারে 'নট্ নড়ন-চড়ন নট্ কিচ্ছু' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুতেই তারা বিচলিত হয় না!

বুড়োর গায়ের গন্ধ পেলে খুব বাধ্য কুকুরও হয়ে পড়ে অত্যন্ত অবাধ্য!

অতএব কুকুরের সাহায্যেও হতভাগা পুমাটাকে শায়েস্তা করা গেল না। বুড়ো মনের আনন্দে 'বার-এক্স' গোশালায় হানা দিয়ে গো-মাংসের খাজনা আদায় করতে লাগল রাজার মতো। অর্ধভুক্ত মাংস সে দ্বিতীয়বার স্পর্শ করতে আসে না, কাজেই ফাঁদ পেতেও কোনও লাভ হয় না।

'বার-এক্স' গোশালায় প্রতি রাত্রে হানা দিয়ে ফিরতে লাগল শ্বাপদের ভয়াল হিংসা।

সেদিন দুপুরবেলা গোশালার মালিক ম্যাকগিল এবং অ্যালেন ঘোড়ার পিঠে মাঠেঘাটে টহল দিয়ে ফিরছে হারানো গরুর সন্ধান করতে করতে। এটা তাদের দৈনন্দিন কর্ম। রাত্রে বুড়োর তাড়া খেয়ে বেড়া ভেঙ্গে পালায় গরুর পাল। পরদিন সকাল থেকে খোঁজাখুঁজি করে হতাবশিষ্ট গরুগুলিকে ধরে এনে আবার বন্দী করা হয় বেড়ার মধ্যে।

আবার আসে রাত্রি এবং একই ঘটনার হয় পুনরাবৃত্তি।

সেদিন মধ্যাহ্নেও অন্যান্য দিনের মতোই হারানো গরুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল গো-শালার মালিক এবং অ্যালেন বর্ডার। হঠাৎ অ্যালেনের চোখে পড়ল দূরে একটা উপত্যকার বুকে দাঁড়িয়ে আছে তাদের গোশালার তিনটি গরু। ঘোড়ার লাগাম টেনে দু'জনেই থমকে দাঁড়াল।

জন্তুগুলো দাঁড়িয়ে আছে অরণ্যের শেষ সীমানায় সমতল ভূমির উপর। অশ্বারোহীদের সামনে দিয়ে খাড়া পাহাড়ের প্রাচীর নেমে গিয়ে সমতল ভূমিপৃষ্ঠকে স্পর্শ করেছে। ঐ খাড়া প্রাচীরের উপর উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র নেই—শুধু পাথর, পাথর আর পাথর।

আলগা পাথর বসানো সেই ঢালু জমি বেয়ে ওঠানামা করা খুবই কঠিন এবং বিপদজনকও বটে।

ম্যাকগিল ও অ্যালেন যেখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে এখানে এসেছে, সেই গোশালা থেকেই বিগত রাত্রে পুমার তাড়া খেয়ে পালিয়েছিল ঐ গরু তিনটি এবং যেহেতু উপত্যকায় অবতীর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় কোনও পথ নেই, তাই স্পষ্টই বোঝা যায়, আলগা পাথর-বসানো এই বিপদজনক পাহাড়ী পথ ধরেই নেমে গেছে গরুগুলো!

অত্যন্ত ভয়ার্ত হয়েই যে গরুগুলো ঐ বিপদসঙ্কুল পথ বেয়ে নীচে পৌঁছেছে, একথা বুঝতে অ্যালেনের দেরি হল না। অ্যালেনের মনিবও ব্যাপারটা বুঝেছিল। কিন্তু এখন জন্তুগুলোকে উদ্ধার কবাব উপায় কি?

ঘোড়ার লাগামে টান মেরে দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়েছিল।

গরু তিনটির কাছে যেতে হলে প্রায় আধ মাইল লম্বা দুর্গম পাহাড়ী পথ বেয়ে যাত্রা করতে হবে। রাতের অন্ধকারে নিজের আওতার মধ্যে পেলে তিনটি গরুকেই হত্যা করবে বুড়ো শয়তান। অতএব সকালের জন্য অপেক্ষা করলে চলবে না।

গরুগুলোকে বাঁচাতে হলে এখনই তাদের উদ্ধার করা দরকার।

ম্যাকগিলকে ঘরে ফিরে যেতে বলে অ্যালেন পাহাড়ী পথের উপর দিয়ে গরুগুলোর দিকে অশ্বকে চালনা করলে।

আকাশের বুকে দুলে উঠল সন্ধ্যার ধূসর অঞ্চল পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করছে দিগন্তের শেষ আলোকধারা।

আচম্বিতে হল এক বিপদের সূত্রপাত।

অ্যালেনের বন্দুকটা ঘোড়ার পিঠে বাঁধা ছিল—হঠাৎ বন্ধনরজ্জু আলগা হয়ে সেটা পড়ে গেল মাটির উপর। সঙ্গে সঙ্গে ভরা বন্দুকের গুলি ছুটে গেল, ঘোড়া পায়ের তলায় বন্দুকের নল থেকে সগর্জনে নির্গত হল চকিত অগ্নিশিখা!

ঘোড়া চমকে উঠে লাফ মারল এবং টাল সামলাতে না পেরে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অ্যালেন সশব্দে ও সবেগে অবতীর্ণ হল কঠিন মৃত্তিকার বুকে! ধরাশয্যায় শুয়ে শুয়েই সে শুনতে পেল পাথুরে জমির উপর বেজে উঠেছে ধাবমান অশ্বের পদশব্দ।

ঘোড়া পালিয়ে যাচ্ছে...

অ্যালেন উঠে বসল। তার দেহে কোথাও আঘাত লাগে নি। শরীরের কয়েক জায়গা কেটেকুটে অল্পস্বল্প রক্তপাত হয়েছে বটে কিন্তু আঘাতগুলো মারাত্মক নয়।

বন্দুকটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে অ্যালেন পাহাড়ী পথ বেয়ে হাঁটতে লাগল। এই অঞ্চলের পথঘাট তার পরিচিত—রাস্তাটা সে ভালভাবেই চিনতে পেরেছিল।

কয়েক মাইল পথ ভেঙ্গে পাহাড়ের নীচে নামতে পারলেই সে ঢালু জমিটার উপর পৌঁছে যাবে, সেখান থেকে গোশালায় ফিরে যেতে তার অসুবিধা নেই। গরুগুলোকে অবশ্য উদ্ধার করা

যাবে না, কারণ ততক্ষণে অন্ধকার রজনীর গর্ভে হারিয়ে যাবে দিবসের শেষ আলোকরশ্মি।

ইতিমধ্যেই উপত্যকা আর খাদগুলোর উপর পড়েছে সুদীর্ঘ ছায়ার আবরণ—অন্ধকার হতে আর দেরি নেই।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে অ্যালেন পাহাড়ী পথ বেয়ে পদচালনা করলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যালেনের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিলে ঘন অন্ধকার। তারার আলোতে অস্পষ্টভাবে পথ দেখতে দেখতে সে পা ফেলতে লাগল অতি সন্তর্পণে।

হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যালেন।

তার পিছন থেকে ভেসে এল তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার!

নারীকণ্ঠের আর্তস্বর।

এক মুহূর্তের জন্য ভুল করেছিল অ্যালেন। না, কোনও রমণীর কণ্ঠস্বর নয়—ঐ ভীষণ চিৎকার ভেসে এসেছে পুমার গলা থেকে! নারীকণ্ঠের সঙ্গে পুমার কণ্ঠস্বরের কিছুটা মিল আছে বটে, কিন্তু এমন ভয়াবহ জান্তব ধ্বনি ইতিপূর্বে অ্যালেনের কর্ণগোচর হয় নি।

অ্যালেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। নির্ভরযোগ্য কোনও অস্ত্র তার হাতে নেই। যে মস্ত ছোরাটা সে সর্বদাই সঙ্গে রাখে সেটাও আজ সে ফেলে এসেছে তার টেবিলের উপর। হাতের বন্দুকে ছিল একটি মাত্র গুলি, একটু আগের দুর্ঘটনায় সেই গুলিটাও ছুটে গেছে। তবু খালি বন্দুকটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলে অ্যালেন, টোটা না থাকলেও বন্দুকটাকে অন্ততঃ মুগুরের মতো ব্যবহার করা যাবে...

আবার! আবার সেই চিৎকার!

অন্ধকার রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করে অ্যালেনের পিছন থেকে ভেসে এল সেই উৎকট শব্দের তরঙ্গ!

দারুণ আতঙ্কে অ্যালেনের ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে উঠল—নিশ্চিত মৃত্যুর বার্তা বহন করে তার দিকে এগিয়ে আসছে হিংস্র শ্বাপদ!

দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল অ্যালেন। অন্ধকারের মধ্যে সঙ্কীর্ণ গিরিপথটা আর এখন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, তবু সে একবারও পথের দিকে দৃক্‌পাত করলে না—

আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

আচম্বিতে তার পায়ের তলা থেকে সরে গেল মৃত্তিকার নিরেট স্পর্শ, পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে খসে পড়ল বন্দুকটা তার হাত থেকে।

অ্যালেন অনুভব করলে, তার দেহটা শূন্যপথে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে!

অন্ধের মতো দুই হাত বাড়িয়ে দিতেই তার হাতে কয়েকটা গাছের শিকড় লাগল। শক্ত মুঠিতে শিকড়গুলো চেপে ধরে পতন-উন্মুখ দেহটাকে সে কোনও মতে রক্ষা করলে।

তার পায়ের ধাক্কা লেগে কয়েকটা পাথর পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না—তবু বহু দূরে নীচের দিক থেকে স্খলিত প্রস্তরের যে পতনশব্দ ভেসে এল সেই আওয়াজ থেকেই অ্যালেন বুঝল তার পায়ের তলায় হাঁ করে আছে গভীর খাদ, এখান থেকে পড়ে গেলে বাঁচার আশা নেই। অতি কষ্টে একটু একটু করে সে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। একটু পরে একটা সঙ্কীর্ণ জায়গায় সে পা রাখার অবলম্বন খুঁজে পেল।

হঠাৎ অ্যালেনের সর্বাঙ্গে জাগল অস্বস্তিকর অনুভূতির তীব্র শিহরণ। ঘন অন্ধকার ভেদ করে কিছুই দৃষ্টিগোচর হওয়ার উপায় নেই—কিন্তু সে অনুভব করলে শয়তান বুড়ো তার খুব কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে।

মাথার উপর হিংস্র শ্বাপদ, পায়ের তলায় অতলস্পর্শী খাদ—ভয়াবহ অবস্থা!

অকস্মাৎ দারুণ আক্রোশে পরিপূর্ণ হয়ে গেল অ্যালেনের সমগ্র চেতনা। ভয়ের পরিবর্তে জেগে উঠল ক্রোধ। বিদ্যুৎচমকের মতো তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল—বন্দুকটা তার হাত থেকে খসে পড়েছিল বটে কিন্তু অস্ত্রটা তখনও হাতছাড়া হয় নি।

চামড়ার ফিতা দিয়ে বন্দুকটা আটকানো ছিল তার কাঁধের সঙ্গে, হাত থেকে খসে পড়লেও অ্যালেনের দেহলগ্ন চর্মরজ্জুর বন্ধনে ঝুলছিল বন্দুক।

সে এইবার অস্ত্রটাকে বাগিয়ে ধরে কোট এবং টুপি খুলে ফেলল। বন্দুকের নলের মুখে সে এমনভাবে কোট আর টুপি বসিয়ে দিলে যে উপর থেকে দেখলে নির্ঘাত মনে হবে একটা মানুষ টুপি মাথায় দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর কোট আর টুপি জড়ানো বন্দুকটা সে তুলে ধরলো খাদের মুখে।

আচম্বিতে তার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল—অন্ধকারের কালো যবনিকা ভেদ করে জ্বলছে একজোড়া প্রদীপ্ত শ্বাপদচক্ষু!

পরক্ষণেই অন্ধকারের চেয়েও কালো এক অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল কোট-টুপি-জড়ানো বন্দুকের উপর!

সেই দারুণ সংঘাতে বন্দুকসমেত অ্যালেনের দেহটা আর একটু হলেই ছিটকে পড়তো খাদের ভিতর—

কোনও রকমে টাল সামলে নিয়ে সে দেখল, গিরিপথের উপর থেকে ঠিকরে এসে তার পাশেই

সঙ্কীর্ণ জায়গাটার উপর ভারসাম্য রেখে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে অতিকায় মার্জারের মতো একটা চতুষ্পদ জীব! পুমা!

দারুণ আতঙ্কে অ্যালেনের কণ্ঠ ভেদ করে নির্গত হল এক ভয়াবহ চিৎকার, দুই হাতে বন্দুকটা তুলে ধরে সে আঘাত হানতে উদ্যত হল।

কিন্তু আঘাতের প্রয়োজন ছিল না, পুমার নখগুলো পাথরের উপর ফসকে গেল। জন্তুটা গড়িয়ে পড়তে লাগল নীচের দিকে!

অ্যালেন দেখল—পুমা বারবার নখ দিয়ে পাহাড়ের ঢালু জমি আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করছে! চেষ্টা সফল হ'ল না, মহাশূন্যে ছিটকে পড়ে অনেক নীচে অন্ধকারের গর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই অতিকায় মার্জার।

সকাল হল। নীচের দিকে তাকিয়ে ধরাশায়ী জন্তুটাকে দেখতে পেল অ্যালেন। হ্যাঁ! বুড়োই বটে! জানোয়ার ভয়ানক ভাবে জখম হয়েছে কিন্তু তখনও মরে নি! তার কপিশ-পিঙ্গল চক্ষু দুটি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অ্যালেনের দিকে!

অ্যালেন সবিস্ময়ে দেখল, শ্বাপদের দৃষ্টিতে মৃত্যুযন্ত্রণার চিহ্ন নেই—হিংস্র আক্রোশে দপদপ করে জ্বলছে পুমার দুই প্রদীপ্ত চক্ষু! অ্যালেন চোখ ফিরিয়ে নিলে অন্যদিকে।

অকস্মাৎ ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো অকুস্থলে উপস্থিত হল অ্যালেনের মনিব ম্যাকগিল এবং দুজন রাখাল।

ঘটনাস্থলে তাদের উপস্থিতি খুবই আকস্মিক বটে কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। যে ঘটনার সূত্র ধরে তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তা হচ্ছে এই ঃ

অ্যালেনের ঘোড়া গতরাত্রেই তার আস্তানায় ফিরে গিয়েছিল। আরোহীবিহীন অশ্বের শূন্য পৃষ্ঠদেশ দেখে ম্যাকগিল উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠে, কিন্তু রাতের অন্ধকারে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব নয় বলেই সে অপেক্ষা করতে থাকে আসন্ন প্রভাতের জন্য।

ভোরের আলো ফুটতেই দু'জন রাখালকে নিয়ে ম্যাকগিল খোঁজাখুঁজি শুরু করলে এবং তার অভিজ্ঞ চক্ষু কিছুক্ষণের মধ্যেই খুঁজে পেল পুমার পায়ের ছাপ। শ্বাপদের পদচিহ্ন বিশ্লেষণ করে তারা যখন বুঝল, পদচিহ্নের মালিক হচ্ছে বুড়ো এবং সঙ্কীর্ণ গিরিপথে তার লক্ষিত শিকার হচ্ছে অ্যালেন, তখনই তারা অ্যালেনকে জীবন্ত অবস্থায় ফিরে পাওয়ার আশা ত্যাগ করেছিল। অক্ষত অবস্থায় নিখোঁজ মানুষটিকে দেখে তারা যেমন খুশী হয়েছিল তেমনই আশ্চর্য হয়েছিল।

ম্যাকগিল তার রাইফেল তুলে নীচের দিকে নিশানা করলে। পরক্ষণেই অগ্নি-উদ্‌গার করে গর্জে উঠল রাইফেল।

ম্যাক্‌গিলের সন্ধান অব্যর্থ।

গুলি মর্মস্থানে বিদ্ধ হল, নিঃশব্দে মৃত্যুবরণ করলে বুড়ো।

ফ্ল্যাটহেড অঞ্চলে শেষ হল বিভীষিকার রাজত্ব।

পৃথিবীতে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে যার সঠিক অর্থ বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই ধরনের একটি কাহিনী আমি সংগ্রহ করেছি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে।

যে ভদ্রলোক এই ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি একজন সম্পন্ন ব্যবসায়ী। ভদ্রলোকের মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ড কিন্তু তাঁর ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ছিল আফ্রিকার উগাণ্ডা নামক স্থানে।

ভদ্রলোকের লিখিত বিবরণী থেকে নিম্নলিখিত কাহিনীটি পরিবেশন করছি—

"আমার জমিতে কয়েকজন নিগ্রো শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলাম। একদিন শ্রমিকদের দলপতি আমার সঙ্গে দেখা করে জানালে, গত রাত্রে তাদের দলভুক্ত একজন মজুর হঠাৎ মারা পড়েছে। নিগ্রোদের বিশ্বাস ঘরের মধ্যে কোনও লোক মৃত্যুবরণ করলে প্রতিবেশীদের অকল্যাণ হয়। এই জন্য তারা অধিকাংশ সময়ে মুমূর্ষু রোগীকে জঙ্গলের মধ্যে রেখে আসে। রুগ্ন ব্যক্তি বনের মধ্যেই মারা যায়, মৃতদেহের সৎকার হয় না, হায়না প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদ তার দেহের মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, নির্দিষ্ট স্থানে পড়ে থাকে শুধু চর্বিত কঙ্কালের স্তূপ।

অসুস্থ মজুরটির সম্বন্ধেও তার সহকর্মীরা পূর্বোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিল, কিন্তু দলের সর্দার বাধা দেওয়ায় তাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নি। বিগত রাত্রে ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তি তার কুটীরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। মালিক এখন মৃতদেহ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবেন সেই কথাই জানতে এসেছে সর্দার।

সর্দারের সঙ্গে গিয়ে মৃতদেহটাকে কুটীরের ভিতর থেকে এনে আমার গাড়িতে রাখলাম, তারপর বেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম হাসপাতালের দিকে। মৃত ব্যক্তির শব ব্যবচ্ছেদ করে তার মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করা দরকার—সেইজন্যই আমি হাসপাতালের দিকে যাত্রা করেছিলাম।

কুটীরের মধ্যে আবছা আলো-আঁধারির লীলাখেলা আমার দৃষ্টিকে দুর্বল করে দিয়েছিল, তাই মরা মানুষটাকে তখন খুব ভাল করে দেখতে পাই নি। বাইরে উজ্জ্বল সূর্যালোকে তার মুখ দেখে

আমি তাকে চিনতে পারলাম। মাত্র কিছুদিন আগেই লোকটি আমার কাছে মজুরের কাজ করতে এসেছিল। লোকটিকে আমি হালকা কাজ দিয়েছিলাম, কারণ কষ্টসাধ্য কাজ করার মতো উপযুক্ত শরীর তার ছিল না।

তার একটি পা ছিল ভাঙ্গা, একটি চোখ ছিল অন্ধ এবং অজ্ঞাত কোনও দুর্ঘটনার ফলে তার মুখের উপর থেকে লুপ্ত হয়েছিল নাসিকার অস্তিত্ব, নাকের জায়গায় দৃষ্টিগোচর হত দুটি বৃহৎ ছিদ্র!

তবে লোকটির দেহে বিকৃতি থাকলেও মানুষ হিসাবে সে খারাপ ছিল না। কাজকর্ম সে মন দিয়েই করতো। কিন্তু অন্যান্য শ্রমিকরা তাকে এড়িয়ে চলতো—তাদের ধারণা ছিল বিকৃত দেহের অধিকারী ঐ ব্যক্তি একজন জাদুকর!

যাই হোক, সেদিন মৃত ব্যক্তির লাশটা হাসপাতালে জমা করে দিলাম। কর্তৃপক্ষ বললেন, কয়েকদিনের মধ্যেই তার মৃত্যুর কারণ আমাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ কথা রেখেছিলেন। দিন দুই পরেই তাঁরা আমাকে লোকটির মৃত্যুর কারণ জানিয়ে দিলেন—

উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে পেটের গোলমালে। মৃত ব্যক্তির পেটের ভিতর পাওয়া গেছে কয়েকটা লম্বা লম্বা লোহার পেরেক, কাচের টুকরো এবং অনেকগুলো পাথর! পৃথিবীতে এত রকম খাদ্য থাকতে লোকটা কাচ, লোহা আর পাথর খেয়ে মরতে গেল কেন? খুব সম্ভব জাদুবিদ্যার অনুশীলন করার জন্যই লোকটি ঐ অখাদ্য বস্তুগুলিকে ভক্ষণ করেছিল।

তবে লোকটি জাদুকর হলেও খুব উচ্চশ্রেণীর জাদুকর নয়, জাদুবিদ্যাকে হজম করতে পারে না বলেই তার পেটে কাচ, লোহা আর পেরেক হজম হল না।

পূর্ব বর্ণিত ঘটনার কিছুদিন পরে আমাদের এলাকায় হানা দিল এক অজ্ঞাত আততায়ী। প্রতি রাত্রেই এলাকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভেড়ার আস্তানাগুলোতে হানা দিয়ে অজ্ঞাত হত্যাকারী যথেচ্ছভাবে হত্যাকাণ্ড চালাতে লাগল। মৃত পশুগুলির দেহে অধিকাংশ সময়ে কোনও ক্ষতচিহ্ন থাকতো না, হত্যাকারক শুধু ভেড়ার মাথার খুলি ভেঙ্গে ঘিলুটা খেয়ে পালিয়ে যায়।

আমার মজুররা এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে 'নান্দি ভালুক' নামে এক অতিকায় ভালুককে দায়ী করলে।

আফ্রিকায় ভল্লুক নেই, 'নান্দি ভালুক' নামক জীবের অস্তিত্ব শুধু নিগ্রোদের কল্পনায়। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এই কাল্পনিক জন্তুটির কথা নিগ্রোদের মুখে মুখে ফেরে।

বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্ব নেই।

আমি অনুমান করলাম, এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক হচ্ছে একটি অতিকায় হায়না। মাংসাশী শ্বাপদগোষ্ঠীর মধ্যে ভেড়ার মাথার খুলি কামড়ে ভেঙ্গে ফেলার মতো চোয়ালের জোর একমাত্র হায়নারই আছে। চোয়ালে অসাধারণ শক্তি থাকলেও হায়না খুব ভীরু জানোয়ার, তবে দুই একটি হায়না মাঝে মাঝে দুঃসাহসের পরিচয় দেয়।

আমি ঠিক কবলাম মেষকুলের হন্তারক এই অজ্ঞাত আততায়ীকে যেমন কবেই হোক বধ করতে হবে।

চেষ্টার ক্রুটি হয় নি। ফাঁদ পেতে রেখেছি।

খুনী ফাঁদের ধারে কাছেও আসে নি। বন্দুক হাতে প্রতি রাত্রে টহল দিয়েছি—মারা তো দূরের কথা, হত্যাকাবীকে চোখেও দেখতে পাই নি। অথচ প্রতিদিন সকালে খবর এসেছে এক বা একাধিক মেষ আততায়ীর কবলে মৃত্যুবরণ করেছে।

তবে চোখে না দেখলেও হন্তারক যে একটি হায়না সেই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। কয়েকদিন পরেই একটি ঘটনায় প্রমাণ হল আমার ধারণা নির্ভুল।

আমার জন্য নির্দিষ্ট বাড়িটা তখনও তৈরী হয় নি। সবেমাত্র নির্মাণকার্য চলছিল। আমি একটা ঘাসের তৈরী কুঁড়ে ঘরে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি নিয়ে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলাম। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সঙ্কেত অগ্রাহ্য করে আবার শয্যা গ্রহণ করব কিনা ভাবছি, হঠাৎ একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনলাম আমার বিছানার খুব কাছে। বালিশের তলা থেকে টর্চ নিয়ে জ্বেলে দিলাম।

পরক্ষণেই আমাব চোখেব সামনে তীব্র বৈদ্যুতিক আলোর মধ্যে ভেসে উঠল একটা প্রকাণ্ড হাযনার মূর্তি!

আমি স্তম্ভিত নেত্রে দেখলাম, আমার বিছানা থেকে মাত্র এক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে জন্তুটা—এত বড় হায়না ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়ে নি!

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার গলা থেকে বেরিয়ে এল এক তীব্র চিৎকার ধ্বনি, একলাফে শয্যা ত্যাগ করে ঘরের কোণ থেকে আমি বন্দুকটা টেনে নিলাম। এমনই দুর্ভাগ্য যে শুতে যাওয়ার আগে বন্দুকে গুলি ভরতে ভুলে গিয়েছিলাম। টেবিলের উপর একটা ছোট বাক্সে টোটাগুলো রেখেছিলাম, হাত বাড়িয়ে বাক্সটা খুঁজছি, এমন সময়ে হল আর এক নূতন বিপদ! সাঁ করে ছুটে এল একটা দমকা হাওয়ার ঝটকা, আর সেই হাওয়ার ধাক্কা লেগে কুঁড়ে ঘরের নীচের দিকের ঝাঁপটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল!

(উগাণ্ডার যে অঞ্চলে আমি ছিলাম সেখানকার কুটীরগুলোর দরজায় কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে উপর-নীচে লাগানো থাকতো দুটি ঝাঁপ বা দরজার পাল্লা।)

ঝাঁপের পাল্লাটা বন্ধ হয়ে যেতেই আমি চমকে উঠলাম। অত্যন্ত সঙ্গীন মুহূর্ত—পালানোর পথ বন্ধ দেখে হায়না হয়তো আমাকে এখনই আক্রমণ করবে। ঝাঁপের নীচের অংশটা সে একলাফে টপকে যেতে পারে বটে কিন্তু পলায়নের ঐ সহজ পন্থা তার মগজে ঢুকবে কিনা সন্দেহ।

বুনো জানোয়ার যদি নিজেকে কোণঠাসা মনে করে তাহলে সে সামনে যাকে পায় তার উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জন্তুটার বিরাট দেহেব দিকে তাকালাম।

সত্যি, এটা একটা অতিকায় হায়না।

যদি এক গুলিতে জন্তুটাকে শুইয়ে দিতে না পারি তবে বন্ধ ঘরের মধ্যে হায়নার আক্রমণে আমাব মৃত্যু সুনিশ্চিত। খুব সাবধানে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে আমি বন্দুকে গুলি ভরতে লাগলাম।

হঠাৎ বন্ধ ঘরের মধ্যে হল আর এক চতুষ্পদের আবির্ভাব! আমার বুল-টেরিয়ার 'শ্যাম' বোধ হয় দরজার কাছেই ছিল—নীচের দিকের ঝাঁপটা একলাফে ডিঙ্গিয়ে এসে শ্যাম হায়নাকে আক্রমণ করলে!

শ্যাম সাহসী কুকুর, কিন্তু বোকা নয়।

হায়নার ভয়ংকর দাঁত আর শক্তিশালী চোয়াল সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সচেতন—চারপাশে ঘুরে ঘুরে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকে সে বিব্রত করে তুলল, কিন্তু হায়নার ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে নিজের জীবন বিপন্ন করলে না।

হায়নার দংশন অতি ভয়ংকর, এক কামড়েই সে শ্যামের মাথার খুলি ভেঙ্গে দিতে পারে। বুদ্ধিমান কুকুর তাকে সেই সুযোগ দিলে না।

ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে আমি এক লাথি মেরে দরজার নীচের অংশটা খুলে দিলাম। তৎক্ষণাৎ ঘব থেকে বেরিয়ে হায়নাটা দূরের ঝোপ লক্ষ্য করে ছুটল।

আমি ততক্ষণে বন্দুকে গুলি ভরে ফেলেছি।

জন্তুটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম। নিশানা ব্যর্থ হল।

হাযনার ধাবমান দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল অরণ্যের অন্তরালে।

বেশ কয়েকটা দিন কাটল নির্বিবাদে।

আমরা ভাবলাম খুনী বোধহয় আমাদের আর বিরক্ত করবে না। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার শুরু হল হত্যাকাণ্ড।

প্রতি রাত্রেই একটি কি দুটি ভেড়া হায়নার কবলে মারা পড়তে লাগল।

আমার জেদ চেপে গেল, জন্তুটাকে মারতেই হবে।

প্রতিদিন শেষ রাতে ভোর হওয়ার একটু আগে আমি সমস্ত অঞ্চলটায় টহল দিতে শুরু করলাম। পরপর আটটি রাত কাটল, অবশেষে নবম রাত্রে আমার চেষ্টা সফল হল।

একটু দূরে অবস্থিত উঁচু জমির তলায় ঝোপের ভিতর একটা কালো ছায়া যেন স্যাঁৎ করে সরে গেল!

হয়তো চোখের ভুল।

তবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। না, ভুল হয় নি—

হঠাৎ ঝোপের উপর উঁচু জমির উপর আত্মপ্রকাশ করলে একটা চতুষ্পদ পশু!

নীলাভ-কৃষ্ণ আকাশের পটভূমিকায় উচ্চ ভূমির উপর দণ্ডায়মান হায়নার দেহটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার দৃষ্টিপথে—লক্ষ্যস্থির করে গুলি ছুঁড়লাম।

গুলি লাগল হায়নার পেটে। দারুণ যাতনায় অস্থির হয়ে জন্তুটা নিজের উদর দংশন করতে লাগল। আবার অগ্নিবৃষ্টি করলে আমার বন্দুক, হায়নার মৃতদেহ উপর থেকে আছড়ে পড়ল নীচের জমিতে গুলি এইবার জন্তুটার মস্তিষ্ক ভেদ করেছে।

মৃত হায়নার কাছে এসে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। বিরাট জানোয়ার। জন্তুটার দেহে কিছু খুঁত আছে।

তার পিছনের একটি পা ভাঙ্গা, অজ্ঞাত কোনও দুর্ঘটনার ফলে তার একটি চক্ষু হয়েছে অন্ধ এবং নাসিকার কিছু অংশ লুপ্ত হয়ে গেছে মুখের উপর থেকে।

বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মনে একটা সন্দেহের ছায়া উঁকি মারল, মুহূর্তের জন্য আমার মানসপটে ভেসে উঠল একটি মৃত মানুষের প্রতিমূর্তি!

কিছুদিন আগে যে নিগ্রো মজুরটি মারা গেছে তার সঙ্গে এই জন্তুটার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। পূর্বোক্ত মানুষটিরও ছিল একটি পা ভাঙ্গা, একটি চোখ অন্ধ এবং ভূমিশয্যায় শায়িত এই মৃত হায়নার মতো তার মুখের উপরও ছিল না নাসিকার অস্তিত্ব।

আমার সর্বদেহের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল আতঙ্কের শীতল স্রোত! পরক্ষণেই নিজের মনকে শাসন করলাম—বিকৃত দেহ মানুষ যদি থাকতে পারে তবে তার মতো একটা হায়নাই বা থাকবে না কেন? দৈহিক সাদৃশ্যটা নিতান্তই ঘটনাচক্রের যোগাযোগ।

আমি আস্তানায় ফিরে এসে কয়েকজন শ্রমিককে হন্তারকের মৃত্যুসংবাদ দিলাম। তারা বিলক্ষণ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আমি জন্তুটাকে মাটির নীচে কবর দিতে বললাম—হায়নার চামড়া কোনও কাজে লাগে না।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা মজুরদের আস্তানা থেকে একটা কোলাহল ধ্বনি আমার কর্ণগোচর হল। গোলমালের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য আমি শব্দ লক্ষ্য করে পা চালিয়ে দিলাম।

নির্দিষ্ট স্থানে এসে দেখলাম, মৃত হায়নার দেহটা সেইখানেই পড়ে আছে। জন্তুটার পেট চিরে ফেলা হয়েছে। মৃত পশুটার থেকে একটু দূরে বসে একদল শ্রমিক গান ধরেছে উচ্চৈঃস্বরে। সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ শব্দে বাজছে অনেকগুলো ঢাক!

ঐ সঙ্গে আরও এক অদ্ভুত দৃশ্য আমার চোখে পড়ল। ভিড়ের ভিতর থেকে এক একজন

এগিয়ে এসে হায়নাটার উপর জোরে জোরে ফুঁ দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠছে ঢাকের বাজনা এবং সমবেত কণ্ঠের ঐকতান!

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে মজুরদের সর্দার। সর্দারের কাছে এগিয়ে গিয়ে এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জানতে চাইলাম।

'ওরা হায়নার মৃতদেহ থেকে প্রেতাত্মাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে,' সর্দার উত্তর দিলে। এখন হায়নার দেহে আর প্রেত থাকতে পারবে না। সে চেষ্টা করবে অন্য কোনও দেহকে আশ্রয় করতে। এখানে উপস্থিত মানুষগুলোর মধ্যে হয়তো কারও উপর সে ভর করতে পারে।

সেইজন্য তাকে আমরা তাড়িয়ে দিচ্ছি।

মূর্খ। তোমার দলের লোকগুলো তো একেবারেই বোকা, এদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা নেই, এরা কুসংস্কারের দাস, কিন্তু—

একটু হেসে আমি বললাম, 'কিন্তু তুমি কিছু কিছু লেখাপড়া করেছ, তুমিও কি এইসব সংস্কারে বিশ্বাস করো?'

'না, বাওয়ানা', সর্দার বললে, 'আমার কুসংস্কার নেই। তবে—তবে—মানে—আমি আপনাকে কয়েকটা জিনিস দেখাচ্ছি।'

কথা অসমাপ্ত রেখেই সে একটি মজুরকে ইশারা করলে।

মজুরটি এগিয়ে এল।

সর্দার তার হাত থেকে কতকগুলি জিনিস তুলে নিয়ে আমার চোখের সামনে ধরলে।

কয়েকটা লম্বা লম্বা লোহার পেরেক, কয়েকটা পাথর আর ভাঙ্গা কাচের টুকরো রয়েছে সর্দারের হাতে!

'বাওয়ানা', সর্দার বললে, 'এই জিনিসগুলো পাওয়া গেছে হায়নার পেটের ভিতর!'

আমি কথা বলতে পাবলাম না, অনুভব করলাম আমার ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে উঠেছে কাঁটাব মতো!

সবই কি ঘটনাচক্র?

একটি পা ভাঙ্গা, একটি চক্ষু অন্ধ, মুখের উপর ছিন্ন নাসিকার অংশ—

সবকিছুই কি শুধু ঘটনাচক্রের যোগাযোগ?

অবশেষে এই পাথর, পেরেক আর কাচ?

মৃত মানুষটা কেন ঐ সব বস্তু গলাধঃকরণ করেছিল জানি না, কিন্তু এই সৃষ্টিছাড়া হায়নাটাও বিশেষ করে ঐ অখাদ্য বস্তুগুলিকে উদরস্থ করলে কেন?

আমি এই ঘটনার কোনও সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারি নি। তবে অশিক্ষিত আফ্রিকাবাসীর বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে আজ আর আমি কুসংস্কার বলে অবজ্ঞা করতে পারি না।''

কাহিনীর লেখক কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। তিনি এখানেই সমাপ্তির রেখা টেনে দিয়েছেন।

আফ্রিকার অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যে সব শ্বেতাঙ্গ পর্যটক ও শিকারী ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁদের লিখিত রোজনামচায় অনেক অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। বিস্তীর্ণ আফ্রিকার বুকের উপর ঘুমিয়ে আছে এক রহস্যময় জগৎ।

সভ্য পৃথিবী আজও সেই জাদুপুরীর দরজা খুলতে পারে নি।

পূর্ববর্ণিত ঘটনা-প্রসঙ্গে বলছি প্রেতাত্মার ভিন্ন দেহে আশ্রয় গ্রহণ করার আরও অনেক কাহিনী আফ্রিকাবাসীর মুখে মুখে শোনা যায়। অবশ্য যাবতীয় দুষ্কর্মের জন্য যে সব সময় অলৌকিক শক্তির অধিকারী জাদুকর বা প্রেতাত্মারা দায়ী হয় তা নয়—অনেক সময় পার্থিব জগতের সমাজবিরোধী দুরাত্মার দলও নির্বিচারে নরহত্যা করে অথবা পশুমাংসের লোভে প্রতিবেশীর পালিত পশুকে হত্যা করে বন্য জন্তুর উপর দোষ চাপিয়ে দেয়। প্রেত-আশ্রিত পশু ছাড়া অরণ্যচারী হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণও একটি কঠিন সমস্যা। সিংহ, লেপার্ড প্রভৃতি মাংসাশী শ্বাপদ যখন গৃহপালিত পশু হত্যা অথবা নরমাংসের প্রতি আসক্ত হয় তখন আত্মা, দুরাত্মা ও চতুষ্পদ শ্বাপদের ত্র্যহস্পর্শ যোগের ফলে যে বিচিত্র ধাঁধার সৃষ্টি হয় তার থেকে প্রকৃত অপরাধীকে আবিষ্কার করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে আলোচনা করতে হলে আফ্রিকার 'চিতা-মানুষ' বা 'সিংহ-মানুষ' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত সিংহের মস্তক ও দেহচর্মের আবরণে আত্মগোপন করে নরহত্যায় প্রবৃত্ত হয়। নির্জন স্থানে অসতর্ক পথিককে দেখতে পেলে তারা হতভাগ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নকল সিংহের হাতে আসল সিংহের মতোই বাঁকা বাঁকা নখ বসানো নকল থাবা লাগানো থাকে। নখযুক্ত ঐ নকল থাবা দিয়ে হতভাগ্য মানুষের দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করে। কখনও কখনও হত্যাকাণ্ডের জন্য বিশেষ ধরনের ছোরা ব্যবহৃত হয়। নিহত মানুষের দেহে ক্ষতচিহ্ন দেখে মনে হয় বনবাসী সিংহের নখরাঘাতেই তার মৃত্যু হয়েছে।

সিংহের ছদ্মবেশে এইভাবে যারা নরহত্যা করে তাদেরই বলা হয় 'লায়ন-ম্যান' বা 'সিংহ মানুষ'।

সিংহ-মানুষের মতো 'চিতা-মানুষ'ও একই উপায়ে নরহত্যা করে। তফাৎ শুধু এই যে 'লেপার্ড ম্যান' বা চিতা-মানুষ সিংহের ছদ্ম আবরণের পরিবর্তে চিতাবাঘের ছদ্মবেশ ধারণ করে।

আফ্রিকাবাসীদের বিশ্বাস এই সব নকল সিংহ-মানুষ বা চিতা-মানুষ ছাড়া এমন লোক আছে যারা ইচ্ছা করলেই নিজের নরদেহকে পরিবর্তিত করে হিংস্র শ্বাপদের রূপ ধারণ করতে পারে।

আফ্রিকার স্থানীয় মানুষের এইসব বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে কিছু কিছু ঘটনা দিয়ে বিচার করে হয়তো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব ছিল, কিন্তু আগেই বলেছি, নরখাদক শ্বাপদ, লৌকিক অপরাধী এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী জাদুকরদের গোলোকধাঁধার জটিলতা ভেদ করে প্রকৃত রহস্যের সমাধান করা খুব কঠিন কাজ। প্রসঙ্গতঃ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

উল্লিখিত কাহিনীটি বলেছেন বৃটিশ সরকারের একজন ইংরেজ কর্মচারী, নাম তাঁর এইচ ডবলিউ টেলর।

টেলর সাহেবের লিখিত বিবরণী থেকে সংক্ষেপে কাহিনীটি বলছি ঃ

ইথিওপীয়ান সোমালিল্যাণ্ডের সীমানায় সরকারের কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন টেলর সাহেব। রাজনৈতিক কারণে পূর্বোক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে টহল দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ কার্য চালাতেন—ঐটি ছিল তাঁর কর্তব্য কর্ম।

বনচারী হিংস্র পশুরা তাদের রাজ্যে মানুষের অনধিকার প্রবেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে রাজী হয় নি—তাই গর্জিত রাইফেল আর উদ্যত নখাস্ত্রের সংঘর্ষে বনরাজ্যের শান্তিভঙ্গ হয়েছে বারংবার।

টেলর সাহেবের নিশানা ছিল অব্যর্থ; পশুরাজ সিংহের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বড় আনন্দ পেতেন মিঃ টেলর—তাঁর রাইফেলের গুলি খেয়ে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে স্বর্গের দিকে প্রস্থান করেছিল অনেকগুলো সিংহ।

অন্যান্য হিংস্র জন্তুও তিনি শিকার করেছিলেন কিন্তু বিশেষভাবে তাঁর মন এবং দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছিল পশুরাজ সিংহ।

টেলর যে অঞ্চলে সরকারের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন সেই এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব ছড়িয়ে বাস করছিল এক বৃদ্ধ সিংহ। স্থানীয় নিগ্রোরা তার নাম দিয়েছিল 'লিবা'। লিবা নরখাদক। তবে গৃহপালিত পশুর মাংসেও তার অরুচি ছিল না। স্থানীয় মানুষ তাকে ভয় করতো যমের মতো।

জন্তুটার পদচিহ্ন দেখে খুব সহজেই তাকে সনাক্ত করা যেত। লিবা নামক সিংহটির বাঁ দিকের থাবায় একটা আঙ্গুল ছিল না, খুব সম্ভব কোনও ফাঁদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার সময়ে ঐ আঙ্গুলটাকে সে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল।

নিহত গরু-বাছুরের কাছে লিবার পায়ের চিহ্ন দেখলে স্থানীয় নিগ্রোরা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়তো। ওরা সিংহটাকে কখনও হত্যা করার চেষ্টা করে নি। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেলর সাহেবকে খবর দিলে তিনি নিশ্চয়ই রাইফেল হাতে ছুটে আসতেন এবং নিহত শিকারের আশেপাশে লুকিয়ে থেকে লিবাকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করতেন।

মৃত পশুর মাংস খাওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার অকুস্থলে আবির্ভূত হলেই লিবা পড়তো সাহেবের রাইফেলের মুখে।

কিন্তু নিগ্রোরা কখনও যথাসময়ে হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সরবরাহ করতো না। টেলর খবর পেতেন অন্ততঃ দুই কি তিন দিন পরে—ততক্ষণে লিবা শিকারের মাংস উদরস্থ করে সরে পড়েছে নির্বিবাদে। অনেক চেষ্টা করেও টেলর লিবার সাক্ষাৎ পান নি।

কিন্তু টেলর সাহেব লিবার সংবাদ না রাখলেও লিবা নিশ্চয়ই সাহেবের খবর রাখতো। তখন বর্ষাকাল। বিশেষ কাজে টেলর তাঁর দল নিয়ে টহল দিতে বেরিয়েছেন। টেলর গন্তব্যস্থলে

উপস্থিত হওয়ার আগেই অরণ্যের বুকে উপস্থিত হল রাত্রির নিবিড় অন্ধকার। পরিশ্রান্ত টেলর তবু তাঁবু ফেলার আদেশ দিলেন না—তিনি ভাবছেন কোনও রকমে সামনে আট মাইল পথ অতিক্রম করতে পারলেই তিনি গ্রামের মধ্যে এসে পড়বেন—তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছে কুটিরের মধ্যে অবস্থিত একটি তপ্ত শয্যার লোভনীয় দৃশ্য।

হঠাৎ পিছন থেকে সশস্ত্র আস্কারিদের সর্দার তাঁকে জানিয়ে দিলে একটা সিংহ তাদের পিছু নিয়েছে। সাহেব ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। এখানকার বনে জঙ্গলে অনেক সিংহ আছে সিংহকে ভয় করলে আফ্রিকার বনভূমিতে ঘোরাফেরা করা চলে না। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আট মাইল পথ পাড়ি দেওয়ার উৎসাহ আর রইল না—টেলর তাঁবু খাটাতে বললেন।

সেই রাতেই টেলরের আস্তানায় হল সিংহের আবির্ভাব। গভীর রাত্রে গরু আর উটের দল দড়ি ছিঁড়ে বেড়া ভেঙ্গে ছুটোছুটি করতে লাগল– কয়েকটা জন্তু আবার বন্ধন মুক্ত হয়ে ছুটল জঙ্গলের দিকে...অরণ্যের অন্ধকার কালো যবনিকা ফেলে তাদের দেহগুলিকে ঢেকে ফেলল কিছুক্ষণের মধ্যে।

টেলর অথবা তাঁর দলের লোকজন কোনও বন্য পশুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারলেন না, কিন্তু অনুমানে বুঝলেন একটু আগেই এখানে হয়েছিল সিংহের আবির্ভাব। গৃহপালিত জন্তুদের এই ধরনের আতঙ্কের একটিই কারণ থাকতে পারে—সিংহ!

পশুরাজ অত্যন্ত ধূর্ত। সে এমনভাবে রজ্জুবদ্ধ গরু-বাছুরের কাছে এসে দাঁড়ায় যে মানুষরা সিংহের উপস্থিতি বুঝতে না পারলেও জন্তুগুলো গায়ের গন্ধে পশুরাজের অস্তিত্ব বুঝতে পারে।

ভয়ে পাগল হয়ে জন্তুগুলো দড়ি ছিঁড়ে বেড়া ভেঙ্গে ছুটোছুটি করতে থাকে এবং মানুষের নিরাপদ সান্নিধ্য ছেড়ে ছুটতে ছুটতে এসে পড়ে বন-জঙ্গলের মধ্যে! এই সুযোগেরই অপেক্ষায় সিংহ পছন্দসই একটা মোটা-সোটা গরু অথবা বাছুরকে বধ করে সে শিকারের মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। এখানেও সেই ব্যাপার।

অকুস্থলে লিবার মার্কামারা পায়ের ছাপ খুঁজে বার করলে আস্কারির দল। সেই রাত্রে লিবার অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল, একটি জন্তুকেও সে বধ করতে পারে নি।

রাত্রির পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা সকলেই খুব সতর্ক থাকল। কিন্তু লিবা দ্বিতীয়বার অকুস্থলে পদার্পণ করলে না।

টেলর সাহেব বিরক্ত হয়েছিলেন। পরদিন সকালে তিনি আস্কারিদের জানালেন, এখন তাঁর কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা নেই। তিন-চার দিন এখানে থেকে তিনি লিবার খোঁজ করবেন।

ঐ সময়ের ভিতর অন্ততঃ একবার তিনি নিশ্চয়ই সিংহটাকে রাইফেলের আওতার মধ্যে পাবেন। হতভাগা খোঁড়া সিংহটা এই অঞ্চলে অনেকদিন অত্যাচার করছে, কিন্তু টেলারের দলের উপর ইতিপূর্বে সে হামলা করে নি। টেলর তাকে ছাড়বেন না।

আগে লিবাকে হত্যা করে তারপর অন্য কাজ।

টেলরের সঙ্কল্প শুনে আস্কারিদের সর্দার কয়েকবার ঢোঁক গিলে বললে, "বাওয়ানা! আমরা কর্মচারী—আদেশ পালন করতে আমরা বাধ্য। কিন্তু যদি আমাদের কথা শোনেন তবে বলব লিবার পিছনে তাড়া করে কোনও লাভ নেই। ওকে মারতে পারবেন না।"

ক্রুদ্ধস্বরে টেলর বললেন, "কেন?"

"কারণ লিবা সত্যি সত্যি সিংহ নয়। ও একটা জাদুকর। মন্ত্রের গুণে মাঝে মাঝে সিংহের দেহধাবণ করে। আমরা সবাই ওকে জানি।"

টেলব সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন, "ওকে জানো? কি নাম তার?"

উত্তরে আস্কারিদের সর্দার বললে, এই অঞ্চলে সবাই তাকে চেনে। সে "বায় বাহ" জাতীয় নিগ্রো, নাম তাব আলি।

টেলর বিস্মিত হলেন। আলি তাঁর অপরিচিত নয়। লোকটি বিলক্ষণ সাহসী ও বুদ্ধিমান। গভীর রাত্রে অনেকবার আলি জঙ্গলেব পথ ভেঙ্গে এসেছে তাঁর কাছে আবার অন্ধকারের মধ্যেই ফিরে গেছে। তার হাতে একটা ছোট লাঠি ছাড়া অন্য কোনও অস্ত্র থাকতো না। গভীর রাত্রে শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমির ভিতর দিয়ে অস্ত্র হাতে যাতায়াত করাও বিপদজনক—নিরস্ত্র অবস্থায় অন্ধকার বনপথে পদার্পণ আত্মহত্যারই নামান্তর। কিন্তু আলি রাতের পর রাত নির্ভয়ে বনের পথে যাতায়াত করতো।

সম্বল ছিল তার একটি তুচ্ছ লাঠি!

টেলর আস্কারিদের কথা বিশ্বাস করেন নি।

তবে তিনি কথা দিলেন যে লিবাকে হত্যা করার চেষ্টা তিনি করবেন না।

টেলর বুদ্ধিমান মানুষ—তিনি জানতেন নিগ্রোদের সংস্কার বা বিশ্বাসে আঘাত দিলে অনেক সময় পরিণাম খুব খারাপ হয়। একটা সিংহের জন্য দলের লোকের কাছে অপ্রীতিভাজন হওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল না।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই দৈবক্রমে হঠাৎ আলির সঙ্গে টেলর সাহেবের দেখা হয়ে গেল। আলি তাঁকে খুব প্রশংসা জানিয়ে বললে যে মিঃ টেলর লিবাকে হত্যা করার সঙ্কল্প ত্যাগ করে

বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। সাদা চামড়ার মানুষগুলো সাধারণতঃ নির্বোধ হয় কিন্তু মিঃ টেলর হচ্ছেন নিয়মের ব্যতিক্রম, তাঁর স্বদেশবাসীর মতো তিনি যে মূর্খ নন এই কথা জেনে আলি অতিশয় আনন্দিত হয়েছে।

টেলর সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, "তুমিই কি লিবা?"

আলি উত্তর দিলে না। বাঁ হাতটাকে গভীব মনোযোগেব সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

টেলর দেখলেন আলির বাঁ হাতের একটা আঙ্গুল নেই!

আলি গম্ভীর স্বরে বললে, "আমি আপনার কিছু উপকার করব। আমি জানি কিছুদিন আগেও সিংহেব মুখে আপনার জীবন বিপন্ন হয়েছিল। তাছাড়া সিংহের উপদ্রবে আপনি মাঝে মাঝে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, একথাও আমার অজানা নয়। আমার আদেশে আজ থেকে এই অঞ্চলের সিংহরা আপনাকে বা আপনার দলভুক্ত লোকজনদের কখনও আক্রমণ করবে না। সিংহের সম্মুখীন হলেও আপনার ব্যক্তিগত নিবাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

এমন গম্ভীরভাবে সে কথাগুলো বললে যে তার বক্তব্য বিষয়কে টেলর সাহেব লঘু বিদ্রূপ বলে মনে করতে পারলেন না।

টেলর অবরুদ্ধ হাস্য দমন করলেন, তারপর তিনিও গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমার ঘোড়া, গরু আর অন্যান্য পোষা জানোয়ারগুলি সম্বন্ধেও আমি নিরাপত্তার দাবী করছি।

তুমি সিংহদের নিষেধ করে দিও, তারা যেন আমার পোষা জন্তুগুলিকে রেহাই দেয়।"

আলি প্রতিবাদ করে বললে, "তা কি করে হবে? ঘোড়া, গরু প্রভৃতি জন্তু হচ্ছে সিংহের খাদ্য। আমার সিংহরা তাহলে খাবে কি?"

টেলর বললেন, "পোষা জানোয়ার সিংহের খাদ্য নয়। তারা বুনো জন্তু মেরে খাবে।"

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হল আলি, কিন্তু তারও একটা শর্ত ছিল—

টেলর কোনও কারণেই সিংহ শিকার করতে পারবেন না।

আলির প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন টেলর।

আস্কারিয়া যখন শুনল সিংহের দলপতি আলির সঙ্গে সাহেবের 'সন্ধি' হয়েছে তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল।

টেলর প্রথমে আলির কথার বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু কিছুদিন পরেই যখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে সিংহরা তাঁব দলের মানুষ ও পশু সম্বন্ধে হঠাৎ খুব উদাসীন হয়ে পড়েছে তখন আর আলির কথাগুলো তিনি উড়িয়ে দিতে পারলেন না।

সকালবেলা উঠে অনেকদিনই তাঁবুর কাছে রজ্জুবদ্ধ গরুর পাল ও অশ্বদলের নিকটবর্তী জমির উপব তিনি সিংহের পদচিহ্ন দেখেছেন।

পায়ের ছাপগুলো দেখে বোঝা যায়, সিংহরা খুব কাছে এসে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আবার বনের

আড়ালে সরে গেছে! টেলরের দলের মানুষ কিংবা পশুর উপর তারা হামলা করে নি!

একবার নয়, দু'বার নয়—

বারংবার হয়েছে এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনার পুনরাবৃত্তি। টেলরের বিবরণীতে আলির বিষয়ে আর কোনও মন্তব্য লিখিত নেই। ঐ অঞ্চলের সিংহরা হঠাৎ তাঁর দলের মানুষ ও পশু সম্বন্ধে অহিংস হয়ে যাওয়ায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আলির অলৌকিক ক্ষমতায় তিনি বিশ্বাস করেছিলেন কিনা জানি না।

তবে তিনি তাঁর শর্ত রক্ষা করেছিলেন। টেলর সাহেব পরবর্তীকালে কখনও সিংহ শিকার করেন নি!
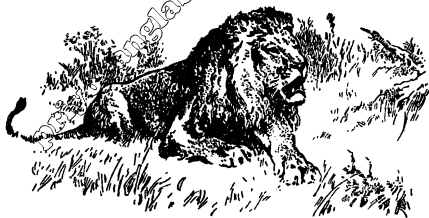
—"না, আমরা যায না, তুমি মালপত্রে হাত দিও না।"

—"সে কি মঁশিয়ে! আপনি লাগেজ নিয়ে এসেছেন, একটু পরেই জাহাজ ছাড়বে! আপনি বলছেন কি?"

—"ঠিকই বলছি। আমি মত পরিবর্তন করেছি। আমার ইচ্ছে হয়েছিল এই জাহাজে যাব, এখন আমার ইচ্ছে নেই, তাই যাব না—বুঝেছ?"

কুলিটি কিছুক্ষণ আশ্চর্য হয়ে মিঃ গিলবার্টের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর দ্রুতপদে আর একটি যাত্রীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মালপত্র তুলে নিয়ে জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

মিসেস গিলবার্ট স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন স্তম্ভিতের মতো, নিজের শ্রবণশক্তিকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না—কি বলছেন তাঁর স্বামী?

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ত্যাগ করে আমেরিকায় গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করার সঙ্কল্প করেছিলেন গিলবার্ট-দম্পতি আর এ নিয়ে বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁদের জল্পনা-কল্পনারও অন্ত ছিল না। কিন্তু টিকিট বুক করে জাহাজে ওঠার কয়েক মুহূর্ত আগে হঠাৎ গিলবার্ট তাঁর মত পরিবর্তন করলেন কেন?

যে কুলিটি তাঁদের মালপত্র বহন করার জন্য এগিয়ে এসেছিল তাকে উদ্দেশ্য করে মিঃ গিলবার্ট যা বললেন তার মর্মার্থ হচ্ছে ঃ তাঁরা যাত্রা স্থগিত রাখছেন; অতএব তাঁদের মালপত্র বহন করার জন্য কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

কুলিকে বিদায় দিয়ে মিঃ গিলবার্ট এইবার তাঁর মালপত্র গুছিয়ে প্যারিসেই ফিরে যাওয়ার উদ্‌যোগ করতে লাগলেন। মিসেস এমিলি গিলবার্ট এতক্ষণ একটিও কথা বলেন নি, এইবার তিনি দারুণ ক্রোধে ফেটে পড়লেন, "জেমস! তোমার এই মত পরিবর্তনের কারণ কি? আমাকে কি তুমি মানুষ বলে মনে করো না? জাহাজের টিকিট কেটে জেটিতে এসে যাত্রার পূর্বমুহূর্তে তুমি যাত্রা স্থগিত করলে! অর্থাৎ আমাকে নিয়ে একটা নিষ্ঠুর কৌতুক করে তুমি বুঝিয়ে দিতে চাও

যে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে আমাকে তোমার ঘর করতে হবে—যেহেতু তুমি অগাধ অর্থের মালিক!"

স্ত্রীর কঠিন তিরস্কারের উত্তরে গিলবার্ট কোনও কথা বললেন না, কেবল একটি কুলিকে ডেকে মালপত্র তুলে নিতে অনুরোধ করলেন, তারপর ধীরপদে এগিয়ে চললেন রাজপথের দিকে একটি ভাড়াটে গাড়ির উদ্দেশ্যে।

চলন্ত গাড়ির ভিতর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন মিসেস এমিলি গিলবার্ট। তিনি যে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাত্র তিন মাস হল প্যারিসে তাঁদের বিবাহ হয়েছে; নববিবাহিতা তরুণী স্বামীর কাছে এমন বিসদৃশ ব্যবহার আশা করেন নি। এতক্ষণ বন্দরের ভিতর আত্ম-সংবরণ করে থাকলেও গাড়ির ভিতর বসে মিসেস গিলবার্ট আর অবরুদ্ধ ক্রন্দনের বেগ সামলাতে পারলেন না। জেমসের নির্দেশ অনুসারে গাড়ি ছুটতে লাগল প্যারিস শহরের একটা হোটেলের দিকে। স্বামীর মুখোমুখি বসে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন তাঁর স্ত্রী এবং নববধূর ক্রন্দনে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বসে রইলেন জেমস গিলবার্ট এক অনড় প্রস্তরমূর্তির মতো।

জাহাজ ধরতে যাওয়ার আগে যে হোটেলে গিলবার্ট-দম্পতি বাস করছিলেন, বন্দর থেকে ফিরে এসে তাঁরা আবার সেই হোটেলেই উঠলেন। গাড়ির মধ্যে এমিলি স্বামীর সঙ্গে একটিও কথা বলেন নি, হোটেলে এসেও তাঁর মৌনব্রত ভঙ্গ হল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরাজ করতে লাগল অসহ্য নীরবতার এক অদৃশ্য প্রাচীর।

কয়েকদিন পরের কথা। কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস ক্রয় করার জন্য 'মার্কেটিং'-এ বেরিয়েছিলেন এমিলি, বিষাদের ছায়া তখনও মিলিয়ে যায় নি তাঁর মন থেকে। নববধূর আশাভঙ্গের বেদনাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের যে পূর্ব-ইতিহাস জানতে হবে তা হচ্ছে এই—

প্যারিসের বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য ও নিদর্শন সংগ্রহ করতে এসেছিলেন আমেরিকার প্রত্নতাত্ত্বিক জেমস গিলবার্ট। ঐখানে অর্থাৎ প্যারিস নগরীতেই এমিলির সঙ্গে জেমসের পরিচয় হয় এবং কিছুদিন পরে তাঁরা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। এমিলির মাতৃভূমিও আমেরিকা, কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি ফ্রান্সে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিবাহের পর নববিবাহিতা তরুণী স্বামীর সঙ্গে মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন এবং সত্যি সত্যিই তাঁদের আমেরিকা যাত্রার দিন যখন স্থির হয়ে গেল তখন যে এমিলি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু জাহাজে ওঠার পূর্বমুহূর্তে জেমস যে ভাবে বিনা কারণে যাত্রা স্থগিত করলেন তাতে মনে হয় স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য তাঁর কাছে নেই—নিজের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য স্ত্রীকে আঘাত করতে বা অপমান করতে তাঁর বিবেকে বাধে না।

কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়।

স্বামীর বিসদৃশ ব্যবহারের কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে না পেলেও জেমসকে নিতান্ত স্বার্থপর নিষ্ঠুর মানুষ বলে ভাবতে পারছিলেন না এমিলি। বিবাহের আগে ও পরে তিনি স্বামীর কাছ থেকে কোনদিনই খারাপ ব্যবহার পান নি। বরং স্ত্রীর প্রতিটি ইচ্ছা-অনিচ্ছার মর্যাদা যে মানুষ

স্নেহের সঙ্গে রক্ষা করে এসেছে সেই লোকটি হঠাৎ এমন অসঙ্গত ব্যবহার কবল কেন এই প্রশ্নই বারবার জেগে উঠেছে এমিলির মনের মধ্যে।

আচম্বিতে নববধূর চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে তাঁর কর্ণমূলে প্রবেশ করল এক হুকারের উচ্চ কণ্ঠস্বর— "টেলিগ্রাম! টেলিগ্রাম! দারুণ খবর! লিংকন জাহাজ ডুবে গেছে! জোর খবর!"

এমিলি চমকে উঠলেন।

লিংকন! ঐ লিংকন জাহাজেই তো তাঁদের আমেরিকা যাত্রা করার কথা ছিল!

দারুণ কৌতূহলী হয়ে এমিলি একটা টেলিগ্রাম কিনে ফেললেন এবং খবরের উপর চোখ বুলিয়ে তিনি হয়ে পড়লেন স্তম্ভিত!

অপ্রত্যাশিতভাবে সামুদ্রিক ঝটিকার আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে ডুবে গেছে লিংকন জাহাজ! একটিমাত্র যাত্রী সাঁতরে বেঁচেছে, আর সকলেরই হয়েছে সলিল সমাধি!

জেমস চুপচাপ বসে ধূমপান করছিলেন, হঠাৎ ঝড়ের মতো তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন এমিলি! পরক্ষণেই জেমস দেখলেন তাঁর কোলের উপর এসে পড়েছে একটি কাগজ, সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুনতে পেলেন স্ত্রীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর—"জেমস! জেমস! এই দেখ টেলিগ্রাম! লিংকন জাহাজ ডুবে গেছে!...আমি অকারণে রাগ কবেছি, দুঃখ পেয়েছি—তুমি নিশ্চয়ই আসন্ন বিপদের কথা জানতে পেরেছিলে। কিন্তু কেমন করে জানলে, জেমস? তুমি কি ভবিষ্যতের কথা জানতে পারো?"

টেলিগ্রামের উপর একবার চোখ বুলিয়ে জেমস স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন, ধীরকণ্ঠে বললেন, "না, এমিলি, ভবিষ্যতেব কথা আমি সবসময় জানতে পারি না। তবে জাহাজে ওঠার পূর্বমুহূর্তে হঠাৎ আমি অনুমান করেছিলাম ঐ জাহাজে উঠলে তার পরিণাম আমাদের পক্ষে অশুভ হবে।"

—"এমন অদ্ভুত অনুমানের কারণ? লিংকন খুব মজবুত জাহাজ। ঝড়ের আঘাতে ঐ জাহাজ কখনও ডুবে যেতে পারে এমন কথা কেউ কল্পনাও করতে পারতো না। এমন অভাবিত দুর্ঘটনার কথা তুমি শুধু অনুমান কবেই সাবধান হযেছিলে?"

—"এমিলি, লিংকন জাহাজ জলমগ্ন হবে কিনা সে কথা আমার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। ঐ সমুদ্রযাত্রা যে আমাদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে না আমি শুধু এই কথাটাই বুঝেছিলাম। যাক্, এসব কথা বলতে আর ভাবতে ভাল লাগছে না। তোমার আপত্তি না থাকলে বরং চলো— একটা নাট্যশালায় গিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে আসি।"

এমিলির আপত্তি ছিল না। প্যারিস শহরে একটি 'অপেরা-হাউস'-এ তখন জনপ্রিয় প্রদর্শনী চলছিল, স্বামী--স্ত্রী সেইখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। হোটেলের একটি ভৃত্যকে ডেকে গাড়ি আনতে আদেশ কবলেন জেমস। একটু পবেই ভৃত্যটি এসে জানাল অশ্বচালিত একটি শকট তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে।

হোটেল থেকে বেরিযে এসে নির্দিষ্ট গাড়িটির সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন জেমস। এমিলি দেখলেন তাঁর স্বামীর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে অশ্বচালকের মুখের দিকে। এমিলি শুনতে পেলেন জেমস অস্ফুটস্বরে স্বগতোক্তি করছেন, "সে কি! এত শীঘ্র!"

গাড়ির চালক অসহিষ্ণুস্বরে বলল, "মঁশিয়ে, তাড়াতাড়ি উঠুন। শুনলাম আপনারা '—' নাট্যশালায় যাবেন। অভিনয় শুরু হতে আর বেশী দেরি নেই, চটপট উঠুন।'

জেমস চালকের কথায় কর্ণপাত করলেন না, তিনি হাত নেড়ে বললেন, "আমরা যায না, তুমি অন্য যাত্রীর সন্ধানে যাও।"

বিস্মিত চালক বলল, 'সে কি মঁশিয়ে! আপনার চাকর যে বললে—"

বাধা দিয়ে জেমস বললেন, "আমার চাকর নয়, হোটেলের চাকর। সে ভুল করেছে। যাই হোক্ তোমার সময় নষ্ট হয়েছে সেজন্য আমি দুঃখপ্রকাশ করছি এবং যতটা সম্ভব তোমার ক্ষতিপূরণ করে দিচ্ছি—"

পকেট থেকে একটি মুদ্রা বার করে জেমস বিস্মিত চালকের হাতে দিয়ে তাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। চালকের ক্ষোভের কারণ রইল না, সে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্য যাত্রীর সন্ধানে যাত্রা করল।

এমিলি এতক্ষণ বোবা হয়ে ছিলেন। এইবার আর তিনি ক্রোধ প্রকাশ করলেন না, লিংকন জাহাজের ঘটনা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়ার কথা নয়! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কি আজ নাটক দেখতে যাব না?"

জেমস বললেন, "নিশ্চয়ই যাব। একটু অপেক্ষা করো, আর একটা গাড়ি এখনই পাওয়া যাবে।"

গাড়ি পাওয়া গেল, তবে 'এখনই' নয়। প্রায় আধঘণ্টা পরে একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গিয়েছিল।

...'অপেরা-হাউস'-এর কাছাকাছি আসতেই স্বামী-স্ত্রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল আকাশের দিকে। রাতের আকাশে অন্ধকার ভেদ করে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে রক্তিম আলোর বন্যা এবং দূর থেকে ভেসে আসছে বহু মানুষের কোলাহল ধ্বনি!

চালক বলল—"আগুন!"

বলার অবশ্য দরকার ছিল না। অন্ধকার রাত্রির কালো যবনিকা ভেদ করে আকাশের গায়ে রক্তরাঙ্গা আলোকধারার এমন হঠাৎ আবির্ভাবের কারণ যে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, সেকথা অনুমান করতে স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

একটু এগিয়ে যেতেই জনতার চাপে গাড়ির গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রীর বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে ফুটে উঠল এক ভয়াবহ অগ্নিময় দৃশ্য!

এমিলি প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বললেন, "জেমস! ঐ নাট্যশালাতেই আমরা সময় কাটাতে এসেছিলাম!"

সত্যি কথা! তাঁরা দুজন যে নাট্যাগারের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, সেই 'অপেরা-হাউস' বেষ্টন করে জ্বলছে এক ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড!

সমবেত জনতার কাছে অনুসন্ধান করে জেমস জানলেন প্রায় আধঘণ্টা আগে হঠাৎ কোনও

অজ্ঞাত কারণে নাট্যশালায় আগুন ধরে যায়। এমন অতর্কিতে এক প্রচণ্ড অগ্নিবন্যা নাট্যাগারে আত্মপ্রকাশ করে যে, দর্শকরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করার সুযোগও পায় না। অনেক হতভাগ্যেরই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে; অনেকে উদ্ধার পেলেও এমনভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে যে তাদের জীবিত থাকার আশা খুব কম। কোনও রকমে প্রাণরক্ষা হলেও ঐসব নরনারীর মুখ ও দেহের উপর থেকে আগুনের বীভৎস দংশন-চিহ্ন কোনদিনই মুছে যাবে না। মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য থেকে তারা হবে চিরজীবনের মতো বঞ্চিত...

স্বামীর হাত ধরে হোটেলে ফিরে এলেন মিসেস এমিলি গিলবার্ট। কিছুক্ষণ দুজনের মধ্যে কোনও কথাবার্তা হল না। আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহ রূপ এমিলিকে প্রায় স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। জেমস তাঁর স্ত্রীর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন।

অবশেষে প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করলেন এমিলি ঃ "জেমস! আজও আমরা অদ্ভুতভাবে রক্ষা পেয়েছি। প্রথম গাড়িটাতে যদি আমরা উঠে পড়তাম তাহলে যথাসময়েই আমরা পৌঁছে যেতাম নাট্যাগারে; এবং ঐ ভয়াবহ আগুনের বেড়াজালে পুড়ে আমাদের মৃত্যু ছিল নিশ্চিত। কিংবা প্রাণে বাঁচলেও সারা জীবন হয়ে থাকতাম মূর্তিমান বীভৎসতার এক কুশ্রী প্রতিচ্ছবি। বলো জেমস, এই অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারটা তুমি নিশ্চয় আগেই জানতে পেরেছিলে?...আমার বিশ্বাস তুমি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তুমি নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা!...চুপ করে রইলে কেন? আমি তোমার স্ত্রী, আমার কাছে কিছুই তোমার গোপন করা উচিত নয়।"

জেমস মুখ তুললেন, "না, এমিলি, কিছুই গোপন করব না। তোমাকে আগে বলি নি, কারণ বললেও তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে না। আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাই তোমার এই ধারণা সত্য নয়, কিন্তু মূর্তিমান অমঙ্গল যখন মৃত্যুদূত হয়ে আমার সামনে আসে তখন আমি তাকে চিনতে পারি। না, কথাটা ঠিক হল না,—বরং বলতে হবে তখন তাকে চেনার ক্ষমতা আমার ছিল, কিন্তু আজ থেকে সে ক্ষমতা আর আমার রইল না।"

উৎকণ্ঠিত স্বরে এমিলি প্রশ্ন করলেন, "কেন? ভবিষ্যতে আবার যদি বিপদ আসে তাহলে কি তুমি জানতে পাববে না?"

—"না, পারব না। কিন্তু জানার প্রয়োজনও আর হবে না। মৃত্যু আরও একবার আমার কাছে আসবে, কিন্তু তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। কারণ সেই মৃত্যু হচ্ছে মানুষের অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক পরিণতি। তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার হেতু নেই এমিলি, আমি আরও অনেক দিন বাঁচব।"

—"তাহলে আমার সন্দেহ সত্য? তুমি ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা রাখো?"

—"না। আগেও বলেছি, এখনও বলছি আমি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নই, ভবিষ্যৎদ্রষ্টাও নই। শোনো, সব কথা তোমায় খুলে বলছি। আজ থেকে কয়েক বৎসর আগে আমি মিশরে গিয়েছিলাম। তুমি জানো আমি প্রত্নতাত্ত্বিক, প্রাচীন মিশরের একটি কবর খুঁড়ে আমি একটি কফিন হস্তগত করি। কফিনের ভিতব ছিল একটি 'ম্যমি'। এমিলি, তুমি নিশ্চয় জানো 'ম্যমি' কাকে বলে?"

—''জানি। প্রাচীন মিশরীয়রা কোনও অজ্ঞাত উপায়ে মৃতদেহকে সংরক্ষণ করত। বিশেষ ধরনের ঔষধ প্রয়োগ করে তারা মৃতদেহকে কবর দিত।

ঐ ওষুধের প্রভাবে মড়ার চামড়া ও মাংস জীর্ণ হয়ে খসে পড়ত না, দেহে প্রাণ না থাকলেও সেই মৃতদেহ তার জীবন্ত চেহারার প্রতিচ্ছবি হয়ে কবরের মধ্যে বিরাজ করত যুগ-যুগান্তর ধরে। অবিকৃত সেই মৃতদেহকে 'ম্যমি' বলা হয়।''

—''ঠিক, ঐ ধরনের একটা ম্যমি হস্তগত করে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম। শবাধার অর্থাৎ কফিনসুদ্ধ ম্যমির দেহটা আমি নিউইয়র্কে নিয়ে যেতে মনস্থ করি। ম্যমিটা যেদিন আমার হাতে এল সেই রাতেই আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের ভিতর আমার সামনে আবির্ভূত হল এক আশ্চর্য মূর্তি। সেই মূর্তির সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে ঝুলছে প্রাচীন মিশরীয় পরিচ্ছদ। তার মুখটা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি; কারণ গোলাকার বলয়ের মতো এক তীব্র আলোকপুঞ্জ অবস্থান করছিল সেই মূর্তির কাঁধের উপর এবং সেই অপার্থিব আলোক-প্রবাহের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল মূর্তির মুখমণ্ডল। সেই অদ্ভুত মূর্তির কাঁধের উপব থেকে জ্বলন্ত আলোব বলয় ভেদ কবে ভেসে এল এক অমানুষিক কণ্ঠস্বর—

'হে বিদেশি! প্রাচীন মিশরের অমর্যাদা কোরো না। জীবিত মানুষের কাছ থেকে যে বিদায় নিয়েছে, তাকে শান্তিতে বিশ্রাম নিতে দাও। যে কবর খনন করে তুমি কফিনটা নিয়ে এসেছ, সেই কবরের ভিতর আবার তুমি ওটাকে রেখে এস। আমার কথা শুনলে তোমার মঙ্গল হবে।'

পরক্ষণেই মূর্তি অদৃশ্য হল আর আমার ঘুমও গেল ভেঙ্গে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে আমি স্বপ্নের কথা চিন্তা করলাম। স্বপ্ন বটে, কিন্তু এমন জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ স্বপ্নের অনুভূতি আমার জীবনে কখনও হয নি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরের দিন স্বপ্নে দৃষ্ট মূর্তির কথা মতো কফিনটা পূর্বোক্ত কবরের মধ্যে রেখে এলাম। সেই বাতে আবাব স্বপ্নের মধ্যে সেই মূর্তি আমার সামনে আবির্ভূত হল। স্বপ্নের মধ্যেই শুনলাম সেই গভীর অপার্থিব কণ্ঠস্বর—'বিদেশি! আমি খুশী হয়েছি! তোমার অন্যান্য দেশবাসীর মতো তুমি নির্বোধ নও! শোনো, তোমার ভাগ্যে অকালে মৃত্যুযোগ আছে। বারবার তিনবার মৃত্যু তোমাকে আক্রমণ করবে। কিন্তু সাবধান থাকলে অকালমৃত্যু তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। যে-মানুষের মুখের উপর তুমি শুষ্ক রক্তবর্ণ ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাবে তার থেকে সর্বদা দূরে থাকবে। জানবে, ঐ রক্তবর্ণ ক্ষতচিহ্নের মানুষ হচ্ছে অশরীরী মৃত্যুর শরীরী প্রতিনিধি। আচ্ছা, আজ বিদায় গ্রহণ করছি, তোমার মঙ্গল হোক'.....

''আমাকে মঙ্গল কামনা জানিয়ে মূর্তি হল অদৃশ্য এবং তার অন্তর্ধানের পর আমার ঘুমও ভেঙ্গে গেল। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি মিশর ত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু মূর্তির সাবধান বাণী কখনও অগ্রাহ্য করি নি। প্রথমে জেটির উপর কুলির মুখে এবং তারপর ঘোড়ার গাড়ির চালকের কপালের উপব আমি দেখেছিলাম লাল ও শুষ্ক ক্ষতচিহ্ন, সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে কি করেছি তা তো তুমি জানো।''

এমিলির দুর্ভাবনা গেল না, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তিনি বলেন, "কিন্তু মাত্র তো দুবার গেছে। এখনও একটা ফাঁড়া আছে।"

জেমস হাসলেন, "না ভয় নেই। বিপদ কেটে গেছে। মিশর ছেড়ে আসার আগে কায়রো শহরেই একদিন লিফট দিয়ে নামতে গিয়ে লিফটম্যানের মুখের উপর দেখলাম মৃত্যুর স্বাক্ষর—রক্তবর্ণ ক্ষতচিহ্ন! আমি তৎক্ষণাৎ থেমে গেলাম এবং আমার সঙ্গে যে বন্ধুটি ছিলেন তাঁকে ধরে রেখে জানালাম আমি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামব, অতএব তাঁকেও আমার সঙ্গী হতে হবে। তোমার মতো বন্ধুটিও আমার উপর রেগে আগুন হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই এক ভীষণ শব্দ। জানা গেল লিফটের কল বিগড়ে যান্ত্রিক খাঁচাটা হঠাৎ আছড়ে পড়েছে নীচে, লিফটের মধ্যে যারা ছিল তাদের মধ্যে একটি প্রাণীও রক্ষা পায় নি! বন্ধুটি খুব আশ্চর্য হয়ে জানতে চেয়েছিলেন আমি কি সত্যিই দুর্ঘটনার কথা অনুমান করতে পেরেছিলাম? আমি অবশ্য তাঁর কৌতূহল নিবারণ করি নি। যাই হোক, বারবার তিনবারই আমি অকাল-মৃত্যুর আক্রমণ এড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি এবং আশা করছি এইবার বেশ কিছুকাল নিশ্চিন্ত হয়ে এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করতে পারব।"

উপরে বর্ণিত কাহিনীটি নিছক গল্প নয়, ঘটনাগুলি বাস্তব জীবনেই ঘটেছিল। তবে স্থান, কাল ও পাত্রপাত্রীদের নাম গোপন করা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস ও আরিজোনার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ তৃণভূমির বুকে বর্তমান কাহিনীর শুরু এবং পাত্র ও অপাত্রদের মধ্যে প্রথমেই যে ব্যক্তি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, সে হচ্ছে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট এক বলিষ্ঠ পুরুষ।

অশ্বারোহী যেখানে অবস্থান করছে, সেখান থেকে কিছুদূরে মাঠের উপর ঘাস খেতে খেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল গরু। গরুর পালের আশেপাশে ঘোড়ার পিঠে চেপে যে লোকগুলো টহল দিচ্ছে, তাদের মুখ-চোখ দেখলেই বোঝা যায় তারা কেউ নিরীহ ভদ্রলোক নয়। ওরা হল আমেরিকার দুর্ধর্ষ 'কাউবয়' বা গো-পালক।

প্রথমেই যে বলিষ্ঠ অশ্বারোহীর উল্লেখ করেছি, সেই মানুষটি ঐ গরুর পালের মালিক এবং কাউবয়দের প্রভু। অশ্বারোহীর নাম 'জন চেসাম'। ঐ অঞ্চলের মানুষজনকে ভয় করত, এড়িয়ে চলত। ভয়টা অহেতুক নয়—জন অত্যন্ত ভয়ানক চরিত্রের লোক, সামান্য কারণেই নরহত্যা করতে সে অভ্যস্ত। তার লক্ষ্মীছাড়া চ্যালা-চামুণ্ডারা ছিল তারই মতো, রাইফেল ও রিভলভারে সিদ্ধহস্ত, প্রভুর আদেশে গুলি চালিয়ে মানুষ খুন করতে তারা একটুও ইতস্ততঃ করত না।

আইন? হ্যাঁ, আইন একটা ছিল বটে—তবে যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে সরকারের আইন নিয়ে আমেরিকাতে কেউ মাথা ঘামাত না। শক্ত মুঠিতে নির্ভুল নিশানায় যে গুলি চালাতে পারত, আইনের প্রতিনিধিরা তাকে স্পর্শও করতে চাইত না। গৃহযুদ্ধের পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার এই ছিল চেহারা।

সেদিন জন চেসামের মেজাজটা বেশ ভাল ছিল। কারণ, কয়েকদিন আগেই তার পোষা গুণ্ডার দল পঞ্চাশটা গরু চুরি করে এনেছে। মাঠের উপর চেসামের নিজস্ব গরুর পালের মধ্যে সেই চুরি করা গরুগুলিও ছিল। পশুপালক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিজস্ব গরুর গায়ে লোহা পুড়িয়ে

নিজেব দলেব প্রতীক চিহ্ন এঁকে দিত। চুরি করা গরুদের গায়েও অন্য প্রতিষ্ঠান বা 'র‍্যাঞ্চ'-এর প্রতীক চিহ্ন ছিল। কিন্তু চেসাম খুব ভালভাবেই জানত যে, সেই চিহ্ন দেখে তার গরুর পালের ভিতর থেকে নিজস্ব গরু সনাক্ত করে নিয়ে যেতে পারে এমন দুঃসাহসী মানুষ ঐ অঞ্চলে নেই। অতএব, রাতারাতি পঞ্চাশটা গরুর মালিকানা লাভ কবে জন চেসাম খুব খুশী হয়ে উঠেছিল।

আচম্বিতে তৃণাবৃত প্রান্তরের বুকে জাগল অশ্বখুরধ্বনি, চেসামের ললাটে জাগল কুঞ্চনরেখা।

মাঠের উপর ঘোড়ার খুরে বাজনা বাজাতে বাজাতে ধুলোর ঝড় তুলে এগিয়ে আসছে একদল অশ্বারোহী!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে চেসাম বুঝতে পারল, এরা কেউ আরিজোনার মানুষ নয়, সকলেই টেক্সাসের অধিবাসী। নবাগত ঘোড়সওয়ারদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল একটি ছোটখাট নিরীহ চেহারার মানুষ।

গরুর পালের দিকে এক নজরে তাকিয়েই ছোটখাট মানুষটি আদেশ দিল, ''আমাদের গরুগুলির চিহ্ন দেখে ওদের আলাদা করে নাও।''

টেক্সানবা বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোরাই গরুগুলিকে তারা দল থেকে তাড়িয়ে আলাদা করে ফেলল।

জন চেসাম এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তাদের কার্যকলাপ দেখছিল, এইবার সে সগর্জনে প্রতিবাদ জানাল।

চেসামের দলের লোকগুলি প্রস্তুত হল লড়াই-এর জন্য। প্রত্যেকেরই কোমরে ঝুলছে রিভলভার, মালিকের আদেশ পেলেই তারা অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।

নবাগতদের আচরণে বোঝা গেল, বিনা যুদ্ধে দাবী ত্যাগ করতে তারাও রাজী নয়। তারাও সশস্ত্র। দুই দলের দুই নেতা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াল।

জন চেসাম তার প্রতিপক্ষের মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তার লম্বা-চওড়া মস্ত শরীরের তুলনায় প্রতিদ্বন্দ্বীর ছোটখাট চেহারাটা নিতান্তই নগণ্য। সেই নগণ্য মানুষটি গম্ভীর স্বরে বলল, ''চেসাম! গরুগুলি আমার, অতএব ওগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি অনেকদিন এখানে আছ, আইন তোমার অজানা নয়।''

নবাগত অশ্বারোহীর দল তাদের নিজস্ব গরুগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে প্রস্থান করার উদ্যোগ করল। জন চেসাম বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না। প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখের দিকে তাকিয়ে সে কি দেখেছিল সেই জানে, কিন্তু কোমরের রিভলভারে হাত না দিয়ে সে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল পিছন দিকে এবং দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অকুস্থল থেকে। চুরি যাওয়া গরুগুলিকে নিয়ে নবাগতরা প্রস্থান করল নির্বিবাদে।

জন চেসামের মতো দুর্দান্ত মানুষও যার কাছে বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করল তার নামও 'জন', তবে 'চেসাম' নয়, 'স্লটার'।

আরিজোনার মানুষ একটি নতুন নাম শুনল—'জন স্লটার'।

জন স্লটাব নামক মানুষটি টেক্সাস অঞ্চল থেকে আরিজোনার 'টম্বস্টোন' শহরের দিকে যাত্রা

করেছিল। ঐ জায়গাটা ছিল পশুপালকদের পক্ষে আদর্শ স্থান। টেক্সাস থেকে স্লটার এসেছিল ঐখানে পশুর ব্যবসা করতে। তার দলে ছিল অনেকগুলি গরু। আরিজোনার বিস্তৃত অঞ্চলে যারা পশুমংসের ব্যবসা করতে 'র‍্যাঞ্চ' বা গোশালা প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অসাধু প্রকৃতির মানুষ। গরু চুরি করে সম্পত্তি বৃদ্ধি করার নিয়মটা ছিল সেখানে নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার। প্রতিবাদ কবলে আসল মালিকের মৃত্যু ছিল অবধারিত, কাজেই কেউ প্রতিবাদ জানাতে সাহস পেত না। জন স্লটার নামে মানুষটি, যে তার নিজস্ব গরু দাবী করার সাহস রাখে, এই খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। জন চেসামের পরে আরও কয়েকটি গুণ্ডা প্রকৃতির লোক স্লটারের গরু চুরি করার চেষ্টা করল। প্রত্যেকবারই হল এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি—হারানো গরুগুলিকে আবিষ্কার করে স্লটার সেগুলোকে আবার নিজের দলে ফিরিয়ে নিয়ে গেল, তার চোখের দিকে তাকিয়ে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পেল না। একদিন স্লটারের দলের লোকরা অন্য প্রতিষ্ঠানের গরুর পালের ভিতর থেকে একশটা চুরি কবা জন্তু উদ্ধার করেছিল।

ঐ অঞ্চলের গুণ্ডাদের কাছে স্লটার হল মূর্তিমান 'চ্যালেঞ্জ'!

অবশেষে একদিন গোলমাল বাধল। গ্যালাঘার নামে এক ভয়ংকর দুর্বৃত্ত ঘোষণা করল স্লটারকে সে হত্যা করবে। কথাটা যথাসময়ে স্লটারের কানে এল। সে কোনও মন্তব্য করল না, কিন্তু সাবধান হল।
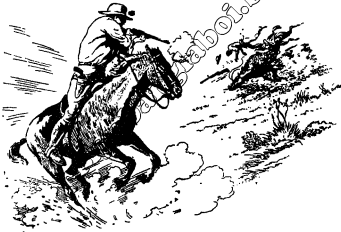
একদিন ঘোড়ার পিঠে চলতে চলতে স্লটার লক্ষ্য করল, গন্তব্যপথের মাঝখানে এমন একটা জায়গা আছে, যেখানে একটা মানুষ অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। সে সন্দেহজনক জায়গাটা পরিহার করে অন্য পথে ঘোড়া চালিয়ে দিল। একটু পরেই বোঝা গেল তাব আশঙ্কা অমূলক নয়। পূর্বোক্ত স্থান থেকে খোলা পথের উপর আত্মপ্রকাশ করল এক অশ্বারোহী।

গ্যালাঘার!

গ্যালাঘারের হাতে ছিল একটা শটগান এবং কোমরের দুই দিকে ঝুলছিল দুটি রিভলভার। শটগান উঁচিয়ে ধরে গ্যালাঘার সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল স্লটারের দিকে। স্লটার রাইফেল ছুঁড়ল। গ্যালাঘারেব ঘোড়া আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, গ্যালাঘার নিজেও ছিটকে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল মাটির উপর। কয়েক মুহূর্ত পরেই গ্যালাঘার উঠে পড়ে শটগান তুলে গুলি চালাল।

আবার গর্জে উঠল স্লটারের রাইফেল, পেটে গুলি খেয়ে ধরাশায়ী হল গ্যালাঘার। মাত্র কয়েকটি মূহূর্ত—আহত বাঘের মতোই লাফিয়ে উঠল গ্যালাঘার এবং দু'হাতে দুটি রিভলভার তুলে ঘনঘন অগ্নিবৃষ্টি করতে লাগল শত্রুর দিকে। স্লটার রাইফেল তুলল, অব্যর্থ লক্ষ্যে রাইফেলের বুলেট গ্যালাঘারের বক্ষ ভেদ করে তাকে মৃত্যুশয্যায় শুইয়ে দিল। রাইফেল নামিয়ে জন স্লটার তার নির্দিষ্ট পথেব দিকে অশ্বকে চালনা করল।

এইসবই হল পথের ঘটনা। যথাসময়ে জন স্লটার এবং তার স্ত্রী গন্তব্যস্থান 'টম্বস্টোন' শহরে এসে উপস্থিত হল। স্লটারের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল, অতএব শহরের অনেক গুণ্ডা বদমাইশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তার দিকে।

একদিন স্লটার স্ত্রীর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এক জায়গায় গরু কিনতে গিয়েছিল। হঠাৎ স্লটারের চোখে পড়ল দুটি লোক ঘোড়া ছুটিয়ে পথের মাঝখানে একটা উচ্চভূমির অন্তরালে আত্মগোপন করল। স্লটার তৎক্ষণাৎ অন্যদিকের একটা ঢালু জমির উপর দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি ছুটিয়ে দিল এবং একটু পরেই এসে পড়ল খোলা রাস্তার মাঝখানে। অশ্বারোহী দুজন অন্তরালেই থেকে গেল, সামনে এসে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ তাদের হল না।

কিছুদিন পরেই স্লটার আবার নিজের আস্তানায় ফিরে এল। ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা গুজব শুনে তার মেজাজ গরম হয়ে উঠল—এডলিল আর ক্যাপ স্টিলওয়েল নামে দুই গুণ্ডা নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে স্লটারের টাকাপয়সা তারা লুঠ করবে।

কোমরে গুলিভরা রিভলভার ঝুলিয়ে জন স্লটার পূর্বোক্ত দুই গুণ্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানিয়ে দিল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তারা যদি শহর ত্যাগ না করে তাহলে স্লটার তাদের হত্যা করবে। এডলিল বিনা প্রতিবাদে স্লটারের বক্তব্য শুনল, কিন্তু স্টিলওয়েল হাত বাড়াল কোমরের রিভলভারটার দিকে।

স্টিলওয়েলের হাত রিভলভারের বাঁট স্পর্শ করার আগেই স্লটারের কোমরের রিভলভার বিদ্যুৎবেগে খাপের আশ্রয় ছেড়ে শত্রুর ললাট লক্ষ্য করে উদ্যত হল! স্টিলওয়েল ভাবতেই পারে নি, এত দ্রুতবেগে কোন মানুষ খাপ থেকে রিভলভার টানতে পারে!

নিজের কোমর থেকে চটপট হাত সরিয়ে এনে স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল স্লটারের মুখের দিকে!

পরেব দিনই দুই স্যাঙ্গাৎ শহর ছেড়ে সরে পড়ল। টম্বস্টোন শহরে আর কোনদিনই কেউ তাদের দেখতে পায় নি।

এইবার আমরা জন স্লটারের পূর্ব ইতিহাস নিয়ে একটু আলোচনা করব। ছোটবেলায় স্লটার ছিল অত্যন্ত রুগ্ন। শক্তির অভাব পূরণ করার জন্য সে রিভলবার ও রাইফেল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র অভ্যাস করতে শুরু করল এবং খুব অল্প বয়সেই সে এমন নির্ভুলভাবে লক্ষ্যভেদ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল যে, পাকা পিস্তলবাজ মানুষও তাকে ঘাঁটাতে সাহস করত না।

পরিণত বয়সে জন স্লটার যখন 'কনফেডারেট আর্মিতে' যোগ দিল, তখন আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

শুরু হয়েছে। এক বছর পরেই সৈন্যবাহিনী থেকে স্লটারকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল, কারণ সে হয়েছিল যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। ঐ অবস্থায় সে ফিরে এসে যোগ দিল 'টেক্সাস রেঞ্জার্স' নামক বেসরকারী বাহিনীতে। ঐ দুর্ধর্ষ বাহিনী এক মাসের মধ্যে যতগুলি লড়াই-এর সম্মুখীন হতো, সরকারী সৈন্যদল সারা বছরের মধ্যেও ততগুলি যুদ্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারত না।

এমন ভয়ানক দলের মধ্যে ছয় বৎসর কাটিয়ে জন স্লটারের স্নায়ু হয়ে উঠল ইস্পাতের মতো কঠিন। তারপরই সে টেক্সাস ত্যাগ করে আরিজোনার টম্বস্টোন শহরের দিকে সস্ত্রীক যাত্রা করেছিল এবং পরবর্তীকালে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, পূর্বেই আমরা তা সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

জন স্লটারের 'র‍্যাঞ্চ' বা গোশালা বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। তার টাকাপয়সা দেখে গুণ্ডারা লুব্ধ হয়ে উঠত বটে, কিন্তু স্লটারেব রিভলভার ও আঙুলের যোগাযোগে যে অত্যন্ত অশুভ ঘটনার উৎপত্তি হয়, বারংবার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে ঐ অঞ্চলের দুর্বৃত্তেরা বুঝতে শিখেছিল, জন স্লটার নামক মানুষটির সঙ্গে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। গুণ্ডাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল স্লটারের পরিচিত, তবে স্লটার তাদের সঙ্গে কথা বলত না, বা কোনও দলীয় কলহের মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাইত না। সরকারের সেনাবাহিনীতে, রেল কোম্পানির মজুরদের মধ্যে এবং টম্বস্টোন শহরের ১৫০০০ শহরবাসীর কাছে মাংস বিক্রয় করে সে আদর্শ ব্যবসায়ীর জীবনযাপন করত, তাকে না ঘাঁটালে সে কোন গোলমালে নাক গলাত না।

কিন্তু গুণ্ডাদের সঙ্গে সংঘর্ষ না হলেও দীর্ঘদিন নিরুপদ্রব শান্তি উপভোগ করার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মায় নি জন স্লটার। জেরোনিমো নামে এক দুঃসাহসী নায়কের নেতৃত্বে 'অ্যাপাচি' জাতীয় রেড-ইণ্ডিয়ানরা শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। মেক্সিকো থেকে অ্যাপাচিরা টম্বস্টোন শহরের উপর হানা দিতে লাগল, বহু মানুষের সম্পত্তি ও গরু-ভেড়া লুণ্ঠিত হল—শান্তিপ্রিয় নাগরিক তো দূরের কথা, পিস্তলবাজ দুর্ধর্ষ গুণ্ডারাও ক্ষিপ্ত অ্যাপাচিদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল না। আগেই বলেছি কিশোর বয়সে জন স্লটার 'টেক্সাস রেঞ্জার্স' নামক বাহিনীতে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, ঐ সময়ে রেড-ইণ্ডিয়ানদের 'কম্যানচো' জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে রেড-ইণ্ডিয়ানদের যুদ্ধ পদ্ধতি শিখে গিয়েছিল। এইবার জেরোনিমোর বাহিনীর বিরুদ্ধে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগল।

কয়েকবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে জেরোনিমো বুঝল, জন স্লটার অতিশয় বিপদজনক ব্যক্তি। স্লটারের নেতৃত্বে তার দলবল অ্যাপাচিদের মেক্সিকো পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল একাধিকবার। ঐ লড়াই চলেছিল প্রায় এক বৎসবেরও বেশী। অবশেষে জেরোনিমোর আদেশে অ্যাপাচিরা স্লটারের এলাকা থেকে হাত গুটিয়ে নিল। বারবার মার খেয়ে জেরোনিমো বুঝেছিল, 'এ বড় কঠিন ঠাঁই!'

জেরোনিমোর বিরুদ্ধে এমন সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল স্লটার যে, তার দিকে সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জেরোনিমো যখন আত্মসমর্পণ করে, সেই সময়ে জন স্লটার ছিল জেনারেল মাইলের সঙ্গী।

স্লটারের কৃতিত্ব এইবার বহু মানুষের ঈর্ষার উদ্রেক করল। অব্যর্থ নিশানার জন্য যারা খ্যাতিলাভ করেছিল, সেই বন্দুকবাজ মানুষগুলি এইবার স্লটারের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। ডাঃ হলিডে

নামে এক দন্ত চিকিৎসক সদম্ভে ঘোষণা করল, স্লটারকে সে শীঘ্রই হত্যা করবে। টম্বস্টোন শহরের মানুষ ঐ ডাক্তারকে যমের মতোই ভয় করত—রিভলভার চালাতে সে ছিল অতিশয় দক্ষ এবং তার মতো ভয়ংকর খুনী সেই অরাজক যুগেও ছিল দুর্লভ।

স্লটার ও তার পত্নীর কানে এল ডাঃ হলিডের ভয়াবহ ঘোষণা। তা সত্ত্বেও একদিন স্ত্রী ভায়োলাকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে স্লটার রওনা হল একটি নৃত্য-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। টম্বস্টোন শহরের খুব কাছেই ছিল ভায়োলার পিতার র‍্যাঞ্চ। অনুষ্ঠানের শেষে স্লটার তার শ্বশুরবাড়ির দিকে গাড়ি চালাল।

মেঘমুক্ত রাতের আকাশে ভাসছে পূর্ণচন্দ্র। পৃথিবীর বুকে উজ্জ্বল প্রতিফলনে ঝলসে উঠছে চাঁদের হাসি, তবল রজতধারার মতো। একটু আগেই শেষ-হয়ে-যাওয়া নাচের স্মৃতি, চাঁদনি রাত, স্বামীর সান্নিধ্য এবং পিতৃগৃহে সাদর অভ্যর্থনার সম্ভাবনা—সবকিছু মিলে ভায়োলার মনটা আজ ভারি খুশী, আর স্লটারের প্রাণেও লেগেছে সেই খুশীর ছোঁয়া।

কিন্তু যতই আনন্দ হোক, সদা সতর্ক স্লটার এক মুহূর্তের জন্যও অসাবধান হয় না।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সে কোমরের রিভলভার হস্তগত করল, কারণ, তার কানে এসেছে ধাবমান অশ্বের খুরধ্বনি!

তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে একটা ঝোপের ভিতর থেকে মুক্ত প্রান্তরের উপর আত্মপ্রকাশ করল ডাঃ হলিডে! ভায়োলা সভয়ে দেখল, ডাক্তারের ডান হাতের মুঠোয় চকচক করছে একটা রিভলভার।

ডাক্তারের ঘোড়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই স্লটারের অশ্বচালিত শকটের পাশে এসে পড়ল। মনে হল, ডাক্তার বুঝি এখনই গুলি ছুঁড়বে—কিন্তু না, ঘোড়া আরোহীকে বহন করে সামনে এগিয়ে গেল, আরোহীর হাতের রিভলভার তবু অগ্নিবর্ষণ করল না।

ভায়োলা চেঁচিয়ে উঠল, "জন! ওর হাতে রিভলভার!"

শান্তস্বরে স্লটার বলল, "জানি। আমার হাতেও একটা আছে।"

ভায়োলা দেখল, তার স্বামীর হাতেও একটা রিভলভার রয়েছে বটে!

ডাঃ হলিডেও স্লটারের হাতের রিভলভার দেখেছে, আর দেখামাত্রই তার সঙ্কল্পের পরিবর্তন ঘটেছে—দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সে স্থানত্যাগ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টম্বস্টোন শহরের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

চারদিকে গুণ্ডাদের অবাধ রাজত্ব। খুন, রাহাজানি, ডাকাতি লেগেই আছে। রাত্রিবেলা তো দূরের কথা, প্রকাশ্য দিবালোকেও ভদ্রলোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ নয়। শেরিফ বেনহাম প্রাণপণ চেষ্টা করেও শহরের শান্তিরক্ষার কার্যে সফল হয় নি।

শহরের মানুষ তখন স্লটারকে শেরিফের পদে নির্বাচিত করল। নূতন শেরিফের কার্যকলাপে নাগরিকরা প্রথম প্রথম বিশেষ উৎসাহ বোধ করে নি। সত্যি কথা বলতে কি, তারা একটু হতাশ হয়েই পড়েছিল। কারণ, স্লটার অন্যান্য শেরিফের মতো চিৎকার করে শপথবাক্য উচ্চারণ করত না, অথবা বিরাট রক্ষীবাহিনী নিয়ে খুনীর পিছনে তাড়া করার চেষ্টাও তার ছিল না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই টম্বস্টোনের মানুষ বুঝল, এই অরাজক শহরের শান্তিরক্ষা করতে হলে যে ধরনের মানুষ দরকার, ঠিক সেই ধবনের মানুষ হচ্ছে জন স্লটার। তাদের নির্বাচনে ভুল হয় নি কিছুমাত্র!

ঘোড়াচুরি বা ডাকাতিব খবর পেলেই নিঃশব্দে ঘোড়ার পিঠে চেপে উধাও হয়ে যেত শেরিফ স্লটার। শহরের আশেপাশে পর্বতসঙ্কুল অরণ্য ছিল সমাজ-বিরোধীদের প্রিয় বাসভূমি। কখনও কখনও সেই পর্বতবেষ্টিত বনভূমির ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেত স্লটার...কয়েকদিন পরেই আবার শহরের রাজপথের উপর শহরবাসীর চোখের সামনে ভেসে উঠত অশ্বারোহী স্লটারের ক্ষীণদেহ, তার সঙ্গে থাকত একটি বা দুটি জিন-লাগানো ঘোড়া, কিন্তু ঐ ঘোড়াগুলির পিঠে কখনই আরোহীর অস্তিত্ব থাকত না! শহরবাসী বুঝত, ঘোড়ার মালিকরা আর কোনদিনই শহরের রাজপথ কলঙ্কিত করবে না—এক বা একাদিক দুর্বৃত্ত গুলি খেয়ে অরণ্যের ভিতরই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে, তাদের ঘোড়াগুলিকে নিয়ে এসেছে শেরিফ জন স্লটার।

অনেক সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গোপনে তদন্ত চালিয়ে অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করত শেরিফ স্লটার। উপযুক্ত প্রমাণ হাতে এলেই সে অপরাধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে দশ দিনের মধ্যে শহর ত্যাগ করার আদেশ দিত। অপরাধী জানত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শহর ছাড়তে রাজী না হলে তাকে পৃথিবীর মায়া ছাড়তে হবে—অতএব সুবোধ বালকের মতোই সে শেরিফের আদেশ পালন করত নির্বিবাদে।

কোন কোন চিন্তাশীল নাগরিক কিন্তু স্লটারের কার্যকলাপ সমর্থন করতেন না। তাঁরা বলতেন, স্লটারকে শেরিফের পদে নির্বাচিত করা হয়েছে, কিন্তু সে অবতীর্ণ হয়েছে একাধারে বিচারক, জুরি এবং ঘাতকের ভূমিকায়!

যে যাই বলুক, টম্বস্টোন শহরে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্লটারের চেষ্টায়। ১৯২২ সালে যখন জন স্লটারের মৃত্যু হয়, তখন তার বয়স প্রায় বিরাশী।

রামায়ণে বর্ণিত কুম্ভকর্ণ ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৬৪ দিনই ঘুমিয়ে থাকত, আর একদিন জেগে উঠে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে আবার আশ্রয় গ্রহণ করত নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে।

হ্যাঁ, সারা বছরে মাত্র একদিনই সে আহার গ্রহণ করত বটে, কিন্তু তার সেই একদিনের আহার্য সংগ্রহ করতে স্বয়ং রাবণ রাজা পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে যেতেন—বাঘ, ভালুক, হাতি, গণ্ডার, মানুষ, বানর প্রভৃতি বিভিন্ন চতুষ্পদ ও দ্বিপদ জীবের রক্তমাংসে ক্ষুধা তৃপ্ত করে কুম্ভকর্ণ আবার ঘুমিয়ে পড়ত এবং সারা বছর ধরে একটি লম্বা ঘুম দিয়ে পরবর্তী বছরের শেষ দিনে আবার জেগে উঠত শূন্য উদরে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে।

এই মূর্তিমান বিভীষিকার জন্ম রাক্ষস-বংশে হয় নি, কুম্ভকর্ণ ছিল ব্রাহ্মণ-সন্তান।

কিন্তু ব্রাহ্মণ-সন্তান হলেও ব্রাহ্মণের সংস্কার ছিল না কুম্ভকর্ণের রক্তে, বিপ্রসুলভ সাত্ত্বিক আহারে সে তুষ্ট থাকতে পারে নি, বিভিন্ন প্রাণীর রক্তমাংসে তৃপ্ত হতো তার ভয়াবহ ক্ষুধা।

পশুজগতে সন্ধান করলে এমন অনেক পশুর সন্ধান পাওয়া যায়, যারা কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রাবিলাসী না হলেও আহারে-বিহারে তার মতোই পূর্বপুরুষের প্রচলিত সংস্কার মেনে চলতে রাজী হয় নি।

এইসব চতুষ্পদ কুম্ভকর্ণ শাকসবজি, ঘাসপাতা প্রভৃতি নির্জীব খাদ্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে হঠাৎ একদিন আহার্য-তালিকা পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করেছে এবং তাদের ক্ষুধিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে রক্তমাংসের দেহধারী সজীব খাদ্যের প্রতি।

কেন এমন হয় বলা মুশকিল। পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যার ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষ যখন এইসব অর্থহীন ঘটনাগুলো ঘটতে দেখে, যুক্তি আর বুদ্ধি দিয়ে ঐ ঘটনাগুলির কার্যকারণ সে যখন বুঝতে পারে না, তখন সে হয়ে পড়ে হতভম্ব।

হ্যাঁ, হতভম্ব হয়ে পড়েছিল জর্জ নুজেন্ট।

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যামেরুন প্রদেশের এক অখ্যাত গ্রামের খুব কাছেই কয়েকটা পায়ের ছাপ তার চোখে পড়েছে, কিন্তু চার আঙ্গুলবিশিষ্ট ঐ গভীর পদচিহ্নগুলির কার্যকারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে হয়ে পড়ছে হতভম্ব।

পায়ের ছাপ চিনতে অবশ্য জর্জের অসুবিধা হয় নি।

চারটি অঙ্গুলিবিশিষ্ট ঐ গভীর পদচিহ্নগুলির মালিক যে একটি জলহস্তী, সে-কথা দাগগুলো দেখেই সে বুঝতে পেরেছিল এবং পায়ের ছাপগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করে সে জানতে পারল যে, জন্তুটা গ্রামের বাইরে ঐ জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ।

কিন্তু কেন? জন্তুটা কি গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করছিল?

ছাগল, গরু, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর মাংসের লোভে গাঁয়ের আশেপাশে ঝোপঝাড়ের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে সিংহ, লেপার্ড অথবা হায়না—গ্রামবাসীদের অলক্ষ্যে তারা গ্রামের মানুষ এবং পশুগুলির উপর নজর রাখে—রাতের অন্ধকারে সুযোগ পেলেই গৃহপালিত পশুর ঘাড় ভেঙ্গে শিকার মুখে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অরণ্যের অন্তঃপুরে।

শুধু গৃহপালিত পশু নয়, অনেক সময় নরমাংসের লোভেও গ্রামের কাছে লুকিয়ে থাকে নরখাদক শ্বাপদ। কিন্তু জলহস্তী নিরামিষভোজী পশু, সে গ্রামের কাছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল কেন?

জর্জ নুজেন্ট এই জন্তুটার অদ্ভুত আচরণের কোনও কারণ বুঝতে পারল না।

সত্যি, ক্যামেরুন অঞ্চলের এই জলহস্তীর আচরণ অত্যন্ত অদ্ভুত। হিপো বা জলহস্তী কখনও কখনও হিংস্র স্বভাবের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ তারা মানুষকে এড়িয়ে চলে। নির্জন নদী এবং জলাভূমি তাদের প্রিয় বাসস্থান। গভীর রাতে জলের আশ্রয় ত্যাগ করে তারা ডাঙ্গায় উঠে আসে এবং জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ঘাস, পাতা, গাছের মূল প্রভৃতি উদ্ভিদজাত পদার্থ উদরস্থ করে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। জলা কিংবা নদী থেকে অনবরত বনের মধ্যে যাতায়াত করার ফলে এই গুরুভার জন্তুগুলির পায়ের চাপে চাপে বনজঙ্গল ভেঙ্গে যায়, বিপুল বপু দানবদের পদচিহ্ন বুকে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে নূতন অরণ্যপথ।

বনের মধ্যে যখন তারা আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, তখন কোনও কারণে ভয় পেলে তারা ঐ পায়ে চলা পথ ধরে ছুটে যায় জলের মধ্যে আত্মগোপনের জন্য—সেই সময় কোনও মানুষ অথবা জানোয়ার যদি তাদের বাধা দেয়, তাহলে তার যে দুর্দশা হয় তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

অতিশয় গুরুভার দেহ নিয়েও জলহস্তী অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে ছুটতে পারে। তার বিকট মুখগহ্বরের মধ্যে যে দাঁতগুলো উদ্ভিদ জাতীয় বস্তু চর্বণ করতে অভ্যস্ত, যুদ্ধের সময় সেই দীর্ঘ দন্তগুলি মৃত্যুর করাল ফাঁদের মতো চেপে ধরে শত্রুর দেহ—কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে হতভাগ্য শত্রুর শরীর রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হয় একজোড়া দন্তভয়াল চোয়ালের প্রচণ্ড পেষণে!

জলহস্তীর স্বভাব-চবিত্র জানত জর্জ নুজেন্ট, তাই গ্রামের সীমানার বাইরে অপেক্ষারত জন্তুটির

পদচিহ্ন দেখে সে আশ্চর্য হয়েছিল—জলহস্তী মানুষের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে, সে তো নিরামিষভোজী, অতএব পশুমাংস বা নরমাংসের লোভে গ্রামের ভিতর হানা দেওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

কিন্তু গ্রামের বাসিন্দা 'বুলা' জাতীয় নিগ্রোরা ভীত হয়ে পড়ল। সারা রাত তারা আগুন জ্বালাতে লাগল এবং বদ্ধদ্বার কুটিরের মধ্যে প্রেতাত্মার রোষদৃষ্টি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নানারকম ক্রিয়াকলাপ করল।

এত কাণ্ড করা সত্ত্বেও পরের দিন সকালে গ্রামের কাছে আবার সেই পায়ের ছাপ দেখা গেল! অর্থাৎ পদচিহ্নের মালিক জ্বলন্ত আগুন বা মন্ত্রতন্ত্রের পরোয়া করে না কিছুমাত্র।

ভীষণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল বুলাদের গ্রামে। তাদের ধারণা হল এটা কোন পশুর পায়ের ছাপ নয়—পশুর দেহ ধারণ করে তাদের গ্রামে হানা দিতে চায় এক দুষ্ট প্রেতাত্মা!

বুলারা ঢাকের শরণাপন্ন হল, আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা ঢাকের সাহায্যে দূর দূরান্তরে খবর পাঠিয়ে দেয়। ঢাকের আওয়াজ শুনেই তারা বুঝতে পারে বাদক কী বলতে চায়।

বুলারা ঢাক বাজাতে শুরু করল।

ঢাকের আওয়াজ যে-সব গ্রামে পৌঁছে গেল, সেইসব গ্রামের অধিবাসীরা বুঝল, বুলাদের গ্রামে এক প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়েছে। তারা আবার ঢাক বাজিয়ে দূরের গ্রামবাসীদের পাঠিয়ে দিল ঐ দুঃসংবাদ—বাতাসে ভর করে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল ঢাকের 'টেলিগ্রাফ'—

'সাবধান! সাবধান! বুলাদের গ্রামে হানা দিয়েছে এক প্রেতাত্মা!'

জর্জ ভীত হয়ে পড়ল। সে অবশ্য বুলাদের মতো প্রেতাত্মার ভয়ে কাতর হয় নি, তার ভয়ের কারণ অন্য।

'একিন' নামক গ্রামে বাস করত জর্জ নুজেন্ট। সে ব্যবসায়ী, ঐ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের সঙ্গে তার ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ফল থেকে তৈরি নানা ধরনের খাদ্য, গজদন্ত ও উদ্ভিদ্জাত দ্রব্য নিয়ে আসত বিভিন্ন গ্রামের মানুষ 'একিন' গ্রামের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী জর্জের কাছে এবং ঐসব জিনিসের ব্যবসা করে জর্জের লাভের অঙ্ক ফেঁপে উঠছিল ভালভাবেই।

কিন্তু ঢাকের আওয়াজ যখন জানিয়ে দিল একিন গ্রামে প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটেছে, তখন ভিন্ গাঁয়ের মানুষ আর জিনিসপত্র নিয়ে ঐ গ্রামে আসতে রাজী হল না। অতএব আমদানির অভাবে জর্জের ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

একদিন সকলবেলা গ্রামের মধ্যে ভীষণ গোলমাল শুরু হল—আর্তনাদ, চিৎকার এবং ঢাকের ঘনঘন কর্কশ শব্দে চমকে উঠল জর্জ নুজেন্ট। কুঁড়েঘরের আস্তানা ছেড়ে বাইরে ছুটে এসে জর্জ দেখল, নদীতীরে অবস্থিত বাগানগুলি থেকে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে অনেকগুলি বুলা জাতীয় স্ত্রীলোক—তাদের মধ্যে একজন নাকি দানবের কবলে পড়েছে!

রাইফেলটা টেনে নিয়ে জর্জ চলল বাগানের দিকে। তার সঙ্গী হল কয়েকজন বর্শাধারী যোদ্ধা।

নদীর তীরবর্তী গাছগুলির নীচে একটা সচল পদার্থ সকলের চোখে পড়ল। জর্জ গুলি চালাল। তৎক্ষণাৎ সেই সজীব বস্তুটি পলায়ন করল দ্রুতবেগে।

আর একটু এগিয়ে যেতেই জর্জ এবং যোদ্ধাদের দৃষ্টিপথে ধরা দিল এক ভয়াবহ দৃশ্য—রক্তধারার মধ্যে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে একটি তরুণীর মৃতদেহ।

দেখলেই বোঝা যায়, কর্দমাক্ত মাটিতে চেপে ধরে মেয়েটির শরীর ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে টুকরো টুকরো করে।

পৈশাচিক কাণ্ড!

জর্জের সঙ্গে ছিল বুড়ো হাফোর্ড, সে দেখিয়ে দিল মেয়েটির একটা হাত নেই, হত্যাকারী হাতটাকে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। মৃতদেহের চারপাশে কাদামাখা মাটির উপর খালি জল আর জল—সেই ঘোলাটে জলের মধ্যে হত্যাকারীর পায়ের ছাপ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

জর্জ ভেবেছিল, হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী একটি কুমির। কিন্তু মেয়েরা আর্তকণ্ঠে জানিয়ে দিল, "কুমির নয়, স্বয়ং শয়তান ঐ মেয়েটিকে হত্যা করেছে।"

মেয়েদের ঘোষণা শুনে সমবেত জনতা জর্জের দিকে দৃষ্টিপাত করল।

জর্জ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। শ্বেতাঙ্গদের প্রতি বুলাদের অসীম শ্রদ্ধা। তারা আশা করছে জর্জের রাইফেল এবার শয়তানকে শাস্তি দেবে। জনতা কথা কইছে না বটে কিন্তু তাদের চোখগুলো যেন নীরব ভাষায় বলছে, "তুমি থাকতে শয়তান আমাদের গাঁয়ে হানা দেবে? নারীহত্যা করবে? বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও।"

জর্জ স্থির করল, যেমন করেই হোক এই খুনে জন্তুটাকে মারতে হবে। মানুষ হিসাবে এটা তার কর্তব্যও বটে, তাছাড়া এখানে লাভ-লোকসানের প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। জন্তুটাকে মারতে পারলে ভিন্ গাঁয়ের লোক জিনিসপত্র নিয়ে একিন গ্রামে আবার যাতায়াত শুরু করবে, আবার জমে উঠবে জর্জের ব্যবসা।

তবে, ব্যাপারটা সহজ নয় খুব।

জর্জ বুঝেছিল, শয়তানকে শিকার করতে গিয়ে সে নিজেও হঠাৎ শয়তানের শিকারে পরিণত হতে পারে।

বড় বড় বঁড়শিতে পচা মাংসের টোপ গেঁথে নদীতে ফেলে দেওয়া হল। সেগুলো সাধারণ বঁড়শি নয়, এই বঁড়শি গলায় আটকালে বড় বড় কুমির পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে যায়।

কিন্তু বঁড়শির টোপ বঁড়শিতেই রয়ে গেল, মাংসলোলুপ কোনও দানব সেই ফাঁদে ধরা দিতে এল না।

এইবার জর্জ অন্য উপায় অবলম্বন করল।

বাগানের শেষ সীমানায় নদীর কাছে গাছের সঙ্গে একটা ছাগল বেঁধে রাইফেল হাতে জর্জ সারারাত জেগে পাহারা দিল। অন্ধকার রাত্রি—রাইফেলের নলের সঙ্গে বাঁধা ছিল বিশেষ ধরনের বিজলি বাতি বা 'ফ্ল্যাশ লাইট'।

কিন্তু জর্জের রাত্রি জাগরণই সার, কোন জানোয়ারই ছাগমাংসের লোভে অকুস্থলে পদার্পণ

করল না। পরের দিন জায়গাটা ভাল করে দেখা হল—নাঃ, আশেপাশে কোথাও নেই কোন ভয়ঙ্করের পদচিহ্ন।

তখন নদীর জলে ভাসল 'ক্যানো' (এক ধরনের নৌকা) এবং সেই ভাসমান নৌকার উপর বসে রাইফেল হাতে সমস্ত নদীটাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করল জর্জ।

ঐ সময়ে চারটি কুমির তার গুলিতে মারা পড়ল।

অনুসন্ধানপর্ব চলল পর পর দু'দিন। তৃতীয় দিবসে আবার বুলাদের গ্রামের কাছে দেখা দিল সেই বিরাট পদচিহ্নগুলি!

একজন স্থানীয় শিকারীকে নিয়ে জর্জ পায়ের ছাপগুলিকে অনুসরণ করল।

অসংখ্য 'লায়ানা' লতার বেড়াজালের নীচে হামাগুড়ি দিতে দিতে পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল জর্জ এবং নিগ্রো শিকারী।

অবশেষে স্যাঁতসেঁতে ঝোপজঙ্গল ভেদ করে তারা এসে যেখানে থামল, সেখানে একটা মস্ত জলাভূমির উপর মাথা তুলেছে অনেকগুলো 'ম্যানগ্রোভ' গাছ।

সেই গাছের সারির শেষ সীমানায় এসে দাঁড়াল দুই শিকারী। জলাশয়ের তীরে এক জায়গায় অল্প জল জমেছিল—নিগ্রো শিকারী হঠাৎ সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

জর্জ সচমকে লক্ষ্য করল, সেখানে অগভীর জলের ভিতর শুয়ে আছে প্রকাণ্ড কুমির। এত বড় কুমির কখনও তার চোখে পড়েনি! হলুদ, কালো আর গাঢ় সবুজ রঙের বিচিত্র সমাবেশ ছড়িয়ে আছে জলবাসী সরীসৃপটার সর্বদেহে, বিকট হাঁ-করা মুখটা ভেসে আছে জলের উপর, দুই চক্ষু অর্ধনিমীলিত, কিন্তু ক্রুর দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর।

এটা নিশ্চয়ই নরখাদক—জর্জ রাইফেল তুলে নিশানা স্থির করল। সেই মুহূর্তে নিগ্রো শিকারী অস্ফুট স্বরে কিছু বলে উঠল, আর চমকে রাইফেল নামিয়ে নিল জর্জ।

জলার বুকে তখন এক ভয়াবহ নাটকের সূচনা দেখা দিয়েছে!

জলার উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে একটা জলহস্তী কুমিরের দিকে। অগভীর জলাশয়ের তলদেশে মাটির উপর পা ফেলে এত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সেই বিশালকায় পশু যে, জলের উপর সামান্য দুই-একটা ঢেউ ছাড়া অন্য কোন আলোড়নের চিহ্ন বা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

তার মস্ত বড় শরীর জলের
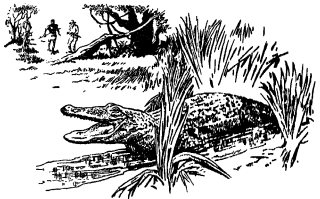
তলায় অদৃশ্য, জলার বুকে ভেসে উঠেছে শুধু নাসিকার অগ্রভাগ, দুই কর্ণ এবং একজোড়া শূকর-চক্ষু।

ধীরে, অতি ধীরে উঠে দাঁড়াল জলহস্তী—জলাশয়ের তীরে—তার বেগুনী রঙের চামড়া থেকে ঝরে পড়ছে জলের ধারা।

অতি সাবধানে, মন্থর গতিতে এগিয়ে গেল জলহস্তী কুমিরটার দিকে।

সে যখন কুমিরের থেকে প্রায় পাঁচ গজ দূরে এসে পড়েছে, তখন সরীসৃপের উন্মুক্ত মুখগহ্বর বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

কুমির এবাব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

বিকট হাঁ করে তেড়ে এল জলহস্তী, দীর্ঘ একটি স্ব-দন্তের আঘাতে সে কুমিরকে চিত করে ফেলে দিল। কুমির সামলে ওঠার আগেই আবার সগর্জনে তেড়ে এল জলহস্তী, বর্শাফলকের মতো সুদীর্ঘ দন্ত দিয়ে খোঁচা মারতে লাগল কুমিরের দেহে এবং সামনের দুই পায়ের সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চেপে ধবার চেষ্টা কবতে লাগল বারবার।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর দুই চোয়ালের ফাঁকে ধরা পড়ল জলহস্তীর সামনের একটি পা।

পবক্ষণেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল জলহস্তী, কুমিরের পেটের উপর সামনের আর একটি পা চাপিয়ে সে এমন চাপ দিল যে সরীসৃপের শক্ত চোয়ালের বজ্রদংশন হয়ে গেল শিথিল।

শত্রুব উন্মুক্ত মুখগহ্বরের ভিতর থেকে ঝটকা মেরে নিজের পা ছাড়িয়ে নিল জলহস্তী, তারপর এক কামড়ে ছিঁড়ে ফেলল কুমিরের পিছনের একটি ঠ্যাং!

কুমিরের প্রকাণ্ড শরীর পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে লাগল, কাঁটা বসানো লোহার চাবুকের লাঙ্গুল বারংবাব আছড়ে পড়ল শত্রুর উদ্দেশে।

কিন্তু জলহস্তী কাবু হল না!

বিদ্যুৎবেগে কুমিরের চারপাশে একপাক ঘুরে সে আক্রমণ করল। মুহূর্তের মধ্যে কুমিরের দেহটাকে কামড়ে ধরে সে শূন্যে তুলে ফেলল।

দুই দ্বিপদ দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছিল সেই ভয়াবহ দ্বৈরথ যুদ্ধ।

একটা মস্ত বড় কুকুরের মুখে ইঁদুর যেমনভাবে ঝুলতে থাকে, ঠিক তেমনিভাবেই কুমিরটা ঝুলছিল জলহস্তীর মুখ থেকে।

জলহস্তীর দুই চোয়াল নির্মম দংশনে চেপে বসল শত্রুর দেহে। ছটফট করে উঠল কুমির। তার সমস্ত শরীর একবার ধনুকের মতো বেঁকে সিধে হয়ে গেল, ভয়ঙ্কর মুখটা ফাঁক হয়ে আত্মপ্রকাশ করল বীভৎস দন্তের সারি।

জর্জ আর স্থানীয় শিকারী শুনতে পেল, কুমিরের গলা থেকে বেরিয়ে আসছে হিস্ হিস্ শব্দ!

কুমিরটাকে মুখে নিয়ে জলহস্তী জলার মধ্যে নেমে গেল।

দারুণ আতঙ্কে জর্জের শরীর হয়ে পড়েছিল অবশ, তার ঘামে ভেজা আঙুল- গুলো শক্ত মুঠিতে

আঁকড়ে ধরেছিল রাইফেল—কিন্তু ট্রিগার টিপে গুলি চালানোর ক্ষমতা তার ছিল না।

"খাচ্ছে! ও খাচ্ছে!" ফিসফিস করে বলল নিগ্রো শিকারী।

একটু দূরেই একটা ঘন ঘাসজোপেব ভিতর থেকে ভেসে এল কড়মড কড়মড় শব্দ—যেন একটা প্রকাণ্ড জাঁতাকলের মধ্যে ভেঙ্গে যাচ্ছে এক অতিকায় দানবের অস্থিপঞ্জর!

হিপো চিবিয়ে খাচ্ছে কুমিরের শরীরটাকে।

অতি সাবধানে নিঃশব্দে পিছিয়ে এল জর্জ। ঐ ঝোপের মধ্যে পদার্পণ করার সাহস তার হল না—উদ্ভিদভোজী জলহস্তী যখন মাংসলোলুপ হয়ে ওঠে, তখন তার আহারে বাধা না দিয়ে সরে পড়াই ভাল।

গ্রামবাসীরা নিগ্রো শিকারীর মুখে সব ঘটনা শুনল, তারা কোন মতামত প্রকাশ করল না। কিন্তু নিজের ভীরুতার জন্য জর্জ নিজেকেই ধিক্কার দিল। সে বুঝেছিল, জন্তুটাকে মারতে না পারলে গাঁয়ের মানুষ তার উপর আর শ্রদ্ধা রাখবে না। স্থানীয় অধিবাসীদের শ্রদ্ধা হারিয়ে বুলাদের গ্রামে বসে ব্যবসা চালানো অসম্ভব।

ব্যবসার কথা ছেড়ে দিলেও জর্জের আত্মসম্মানে ভীষণ আঘাত লেগেছিল। নিজের ভীরুতাকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিল না।

জর্জের কাছে যে রাইফেলটা ছিল, সেটা বিশেষ শক্তিশালী নয়। ওরকম হালকা রাইফেল নিয়ে মাংসলোলুপ দানবটার সম্মুখীন হওয়া দস্তুরমতো বিপজ্জনক। তবু জর্জ স্থির করল, ঐ অস্ত্র নিয়েই সে জলহস্তীর মুখোমুখি দাঁড়াবে—হয় সে জন্তুটাকে মারবে, আর না হয়তো নিজেই মরবে, জীবন বিপন্ন হলেও আর পালিয়ে আসবে না। 'হয় মারো, নয় মরো', এই হল তার সঙ্কল্প।

কুমির এবং জলহস্তীর লড়াই-এর পর দু'দিন কেটে গেছে। জর্জ বুঝল, এতক্ষণে জলহস্তীটা নিশ্চয় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে, অতএব এখন সে আবার শিকারের সন্ধান করবে।

জর্জ চিন্তা করতে লাগল কেমন করে জন্তুটাকে মারা যায়। জর্জের রাইফেল খুব শক্তিশালী নয়। তাই জন্তুটাকে মারতে হলে তার দেহের সবচেয়ে দুর্বল স্থানে আঘাত হানতে হবে।

জলহস্তীব কর্ণমূলে অব্যর্থ সন্ধানে গুলি বসাতে পারলে তার মৃত্যু নিশ্চিত, শরীরের অন্যান্য স্থানে হালকা রাইফেলের গুলি চালিয়ে তাকে কাবু করা সম্ভব নয়।

ঝোপজঙ্গলের মধ্যে জন্তুটাকে গুলি করলে ফলাফল হবে অনিশ্চিত। কানের গোড়ায় গুলি করতে হলে জলহস্তীকে নদী কিংবা জলাভূমির বুকে ফাঁকা জায়গায় পাওয়া দরকার।

বুলাদের সর্দার এবং স্থানীয় শিকারী (যে লোকটি পূর্ববর্তী অভিযানে জর্জের সঙ্গী ছিল) এবারের অভিযানে জর্জের সঙ্গী হতে রাজী হল।

একটা হালকা ক্যানো নৌকা ভাসিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল শিকার অভিযানে। এই ধরনের নৌকাগুলিকে ইচ্ছা করলে খুব দ্রুত চালানো যায়।

জোয়ারের বিপরীত মুখে অনেকক্ষণ নৌকা চালিয়ে নদীর ধারে কাদার মধ্যে তারা একটা কুমির দেখতে পেল।

জর্জ কুমিরটাকে গুলি করে মারল, তারপর মৃত সরীসৃপের দেহটাকে সবাই মিলে পূর্ববর্তী জলাভূমির তীরে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

টোপ প্রস্তুত। এবার শুধু অপেক্ষা করার পালা।

নদীর স্রোত যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকে গিয়ে নদীর মাঝখানে খুঁটি বসিয়ে নৌকার নোঙর করা হল। তারপর শিকারীরা অপেক্ষা করতে লাগল।

সর্দারের মাথা ঝুঁকে পড়ল নিদ্রার আবেশে, কিন্তু নিগ্রো শিকারীর দুই চোখের তীব্র দৃষ্টিতে তন্দ্রার আভাস ছিল না কিছুমাত্র—কাঠের মূর্তির মতো স্থির হয়ে সে বসে রইল নৌকার পশ্চাৎভাগে।

জর্জ তার সঙ্গে কথা কইল না, রাইফেল বাগিয়ে ধরে সে অপেক্ষা করতে লাগল নীরবে।

আফ্রিকার প্রখর সূর্য জ্বলতে লাগল মধ্যাহ্নের আকাশে, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল মশার উপদ্রব। কুমিরের মৃতদেহটা ফুলে উঠল, বাতাসে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল বিশ্রী দুর্গন্ধ। কয়েকটা মাংসলোলুপ 'টিক' পাখি উড়ে বসল মরা কুমিরের উপরে—এমন 'চমৎকার' গন্ধের কারণ অনুসন্ধান করতে বাতাসে ডানা মেলে উড়ে এল একটা মস্ত বড় মাছ শিকারী চিল।

শব্দহীন মৃত্যুপুরীর মতো নিস্তব্ধ নদীবক্ষে অগ্নিবৃষ্টি করতে লাগল আফ্রিকার মধ্যাহ্ন সূর্য, তরল পিতলের গলিত স্রোতের মতো জ্বলে জ্বলে উঠল রৌদ্রস্নাত জলধারা আর অসহ্য তৃষ্ণায় শুষ্ক হয়ে গেল জর্জের কণ্ঠ, পিপাসায় তার প্রাণ করতে লাগল ছটফট ছটফট...

অপরাহ্ন। দূর গ্রাম থেকে ভেসে এল মানুষের কণ্ঠস্বর। জলাভূমির বুকে উঠল আলোড়নের শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে জাগল এক গর্জনধ্বনি। আবার সব শান্ত, নীরব।

আচম্বিতে জর্জের দেহে জেগে উঠল এক অস্বস্তিকর অনুভূতি।

ঘুমন্ত সর্দার হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল, তার চোখে নেই তন্দ্রার আবেশ।

নৌকায় উপবিষ্ট নিগ্রো শিকারীর দীর্ঘ দেহ টান হয়ে গেল ধনুকের ছিলার মতো।

তারা কেউ কথা কইল না, তীব্র অনুভূতি তাদের হঠাৎ জানিয়ে দিয়েছে কিছু একটা ঘটছে।

শিকারীর দুই চক্ষুর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ হল নদীর তীরে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করল জর্জের চক্ষু, সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ছুটে গেল বিদ্যুৎ-তরঙ্গ!

নদীর ধারে তাদের নৌকা থেকে প্রায় দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই ভয়াবহ মাংসভুক জলহস্তী!

জর্জ রাইফেল তুলল।

জলহস্তী বিকট হাঁ করে গর্জে উঠল, বজ্রপাতের মতো সেই গভীর গর্জনধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

পরক্ষণেই অগ্নি-উদ্গার করল রাইফেল।

নদীর ঢালু পাড় বেয়ে ধেয়ে এল জলহস্তী। তার প্রকাণ্ড দেহ সশব্দে এসে পড়ল নদীর জলে।

আবার গুলি ছুঁড়ল জর্জ।

এক ঝটকায় নৌকার নোঙর খুলে ফেলল নিগ্রো শিকারী, আর তৎক্ষণাৎ সজোরে দাঁড় চালিয়ে দিল বুলাদের সর্দার। বন্ধনহীন নৌকা স্যাঁৎ করে পাক খেয়ে ঘুরে গেল স্রোতের মুখে।

নদীর জলে ডুব দিয়ে ভেসে উঠল হিপো, মস্ত বড় হাঁ করে তেড়ে এল নৌকার দিকে—হিংস্র আক্রোশে উন্মুক্ত মুখের গহ্বর থেকে উঁকি দিল বাঁকা তলোয়ারের মতো দুই দীর্ঘ শ্বদন্ত।

আবার গর্জে উঠল জর্জের রাইফেল, একটা দাঁত গুলির আঘাতে ভেঙ্গে গেল সশব্দে।

জলহস্তী আবার ডুব দিল।

হঠাৎ জর্জের হৃৎপিণ্ডটা দারুণ আতঙ্কে বুকের মধ্যে লাফিয়ে উঠল—নিগ্রো শিকারী আর সর্দার ক্যানোটাকে মুহূর্তের মধ্যে টেনে আনল সেইখানে, ঠিক যেখানে ডুব দিয়েছে জলহস্তী।

কিন্তু তারা ভুল করে নি, শিকারের অভিজ্ঞতা জর্জের চাইতে তাদের বেশি—ক্যানোটা যেখান থেকে সরে এসেছিল, ঠিক সেই জায়গায় রক্তাক্ত দেহ নিয়ে ভেসে উঠল জলহস্তী।

এক মুহূর্ত দেরি হলে দানবটার করাল মুখগহ্বরের মধ্যে ধরা পড়ত নৌকা; তারপর কি ঘটত কল্পনা করতেই জর্জের বুক কেঁপে উঠল।

জর্জ আবার গুলি চালাল। মনে হল লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে। চটপট দাঁড় চালিয়ে ক্ষিপ্ত জলহস্তীর নাগালের বাইরে ক্যানোটাকে নিয়ে গেল সর্দার এবং নিগ্রো শিকারী—কোনমতে নিশানা স্থির করে আর একবার রাইফেলের ঘোড়া টিপল জর্জ।

গুলি লেগেছে কিনা বোঝা গেল না, জন্তুটা আত্মগোপন করল জলের তলায়। জর্জ দেখল তার রাইফেলে অবশিষ্ট আছে আর একটি মাত্র টোটা। সে চিৎকার করে সঙ্গীদের সাবধান করে দিল।

কিন্তু নিগ্রোদের আদিম রক্তে তখন জেগে উঠেছে হত্যার নেশা—তারা সজোরে দাঁড় চালিয়ে নৌকা ছুটিয়ে দিল এবং মুহূর্ত পরেই নৌকাটা তীরের কাছে মাটিতে আটকে গেল।

ঠিক সেই সময়ে যদি জলহস্তী আবার আক্রমণ করত, তবে ক্যানোর আরোহীদের আর পলায়ন করার পথ ছিল না, দীর্ঘ দন্তের হিংস্র নিষ্পেষণে শিকারীদের দেহ হয়ে যেত ছিন্নভিন্ন।

একটু পরেই কর্দমাক্ত জলে রক্তের আলপনা ছড়িয়ে ভেসে উঠল জলহস্তী। মাঝ নদীতে ছিল জন্তুটা, আর নৌকাসুদ্ধ আরোহীরা তখন আটকে গেছে তীরবর্তী কর্দমাক্ত ভূমিতে—ভয়াবহ অবস্থা!

রাইফেলে একটি মাত্র গুলি ভরা থাকলেও জর্জের বুক-পকেটে কয়েকটা টোটা তখনও অবশিষ্ট ছিল। পকেট হাতড়ে টোটা খোঁজার সময় কিংবা ধৈর্য ছিল না—একটানে পকেট ছিঁড়ে জর্জ তিনটি টোটা হাতে নিল, তারপর রাইফেলে গুলি ভরে ফেলল কম্পিত হস্তে।

কিন্তু ততক্ষণে হিপো আবার অদৃশ্য হয়েছে জলের তলায়, কাজেই জর্জ গুলি চালাতে পারল না।

নৌকাটা তখন টলমল করে দুলছে।

অনেকটা জল ঢুকেছে ভিতরে, ক্যানোর তলদেশ অর্ধাংশ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে নদীর জলে। মধ্যাহ্নের নির্জন নদীবক্ষ এখন আর নিস্তব্ধ নয়, রাইফেলের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে অনেকগুলো ক্যানো নৌকা ছুটে এসেছে ঘটনাস্থলে—ক্যানোর আরোহী স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস, সাদা মানুষের জাদুবিদ্যা নিশ্চয় নদীর দানবকে কাবু করে ফেলেছে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নিগ্রো শিকারী, "জলহস্তী জল থেকে উঠেছে। একটু দূরে জলাভূমির তীরে যে মরা কুমিরটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা আছে, জন্তুটা সেই দিকেই এগিয়ে চলেছে।"

খুব সাবধানে লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছুঁড়ল জর্জ।

জলহস্তীর মাথার উপর ফুটে উঠল রক্তধারার চিহ্ন, কিন্তু সে গুলির আঘাত গ্রাহ্য করল না। মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে ধেয়ে গেল কুমিরের মৃতদেহটার দিকে—তপ্ত বুলেটের দংশন তার কাছে মশক দংশনের চাইতে গুরুতর নয়!

জন্তুটার কর্ণ ও গণ্ডদেশের মাঝখানে নিশানা করে জর্জ রাইফেলের ঘোড়া টিপল।

এইবার বোধহয় দানবের মর্মস্থানে রাইফেলের গুলি কামড় বসাল—পিছন ফিরে সশব্দে সে নেমে পড়ল নদীর জলে, পরক্ষণেই কর্দমাক্ত জলধারার মধ্যে লাল রক্তেব ফোয়ারা ছড়িয়ে সে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সারারাত ধরে অনেকগুলো ক্যানো ভাসিয়ে নদীর জলে পাহারা দিল নিগ্রোরা। পরের দিন সকালে জলহস্তীর মৃতদেহ ভেসে উঠল নদীর জলে। জন্তুটাকে নৌকার সঙ্গে বেঁধে বুলারা দাঁড় চালাতে শুরু করল, কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকগুলো বলিষ্ঠ বাহুর আকর্ষণে মৃত দানবের দেহটা এসে পড়ল বুলাদের গ্রামের কাছে।

জর্জ দেখল, মৃত জলহস্তীর দেহে রয়েছে সাত-সাতটা বুলেটের ক্ষতচিহ্ন, তার মধ্যে তিনটি বুলেট জন্তুটাব মস্তিষ্ক ভেদ করে ভিতরে ঢুকে গেছে।

এই মারাত্মক আঘাতগুলো অগ্রাহ্য করে জন্তুটা নদীর জলে আত্মগোপন করেছিল এবং তার মৃত্যু হয়েছে অনেক দেরিতে—কী কঠিন জীবনীশক্তি!

জলহস্তীর পেট চিরে দেখা গেল তার মধ্যে রয়েছে চার-চারটি পিতলের ব্রেসলেট জাতীয় অলঙ্কার ও একটি গ্রীবাবন্ধনী।

ঐ সব অলঙ্কার ব্যবহার করে বুলাদের মেয়েরা—অর্থাৎ একাধিক হতভাগিনীর দেহ উদরস্থ করেছে জলবাসী দানব।

কমলের পরিচয় পেয়েছিলাম অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে। পরিচয়টা অবশ্য একতরফা; যে-রাতে আমি তার প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলাম, সেই রাতে আমি ছিলাম তার সম্পূর্ণ অপরিচিত, এমন কি সে আমায় তখন দেখতেও পায় নি।

ব্যাপারটা খুলেই বলছি।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন কলকাতার বিভিন্ন স্থানে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে প্রায়ই যাত্রাগানের আসর বসত এবং কোথাও যাত্রার আসর বসার খবর পেলেই আমি যথাস্থানে হাজির হতাম প্রবল উৎসাহের সঙ্গে। এই রকম এক যাত্রার আসরেই কমলের দেখা পেয়েছিলাম।

প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার ঘটনা। দক্ষিণ কলকাতার এক যাত্রার আসরে গিয়ে দেখি প্রচুর দর্শকের সমাগমে আসর বেশ জম-জমাট। আমার একটু দেরি হয়েছিল, গিয়ে দেখি যাত্রা শুরু হয়েছে। বহুদিন আগেকার কথা, পালার নামটা ঠিক মনে নেই, তবে 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' বা 'দুর্যোধনের উরুভঙ্গ' জাতীয় কোন ব্যাপার হবে।

আগেই বলেছি, আমার যথাস্থানে পৌঁছাতে একটু দেরি হয়েছিল, গিয়ে দেখি যাত্রা শুরু হয়ে গেছে — কুরুরাজ দুর্যোধন গদা হাতে এক ভয়ংকর জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন। আশেপাশে তাঁর স্বপক্ষের এবং বিপক্ষের রথী মহারথীরা সকলেই উপস্থিত, আচম্বিতে রঙ্গমঞ্চ কম্পিত করে গদাহস্তে ভীমের প্রবেশ।

উক্ত গদার আকৃতি ভীমসেনের চাইতেও বেশী দ্রষ্টব্য ছিল, তাই লক্ষ্যবস্তুর চাইতেও উপলক্ষ্য, লোকের—বিশেষ করে ছেলে-ছোকরাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল।

ভীমসেন আসরে প্রবেশ করেই সগর্জনে এক বক্তৃতা দিলেন। দুর্যোধনের চাইতে তাঁর বক্তৃতা আরও জোরালো হয়েছিল। ভাষাটা ভাল মনে নেই, তবে গম্ভীর গর্জিত কণ্ঠের 'পামর', 'নরাধম' প্রভৃতি চোখা চোখা বিশেষণগুলি কিছু কিছু মনে পড়ছে—

তারপরই এক অভাবিত ঘটনা!

ভীমসেন গদা আস্ফালন করে এদিক-ওদিক পদচালনা করছেন, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার আসর কাঁপিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে ভীমকণ্ঠের বাণী।

অকস্মাৎ এক দারুণ চিৎকারে ভীমসেনকে এবং সমগ্র আসরকে চমকে দিয়ে দুর্যোধন এক প্রচণ্ড লাফ মারলেন। মানুষ যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এত উঁচু লাফ মারতে পারে তা জানতাম না! তবে যে সে মানুষ তো নয়, স্বয়ং দুর্যোধন—দ্বাপর যুগে মহাভারতের মহাকায় মানুষদের চমকে দিয়েছিলেন, তাঁরই এক প্রতিনিধি কলিযুগের কলিকাতায় মানব দেহের কয়েকটি তুচ্ছ নমুনাকে চমকে দেবেন তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

কিন্তু লম্ফ প্রদান করে ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে তিনি যা করলেন তাতে স্বয়ং দুর্যোধনও বোধহয় কিঞ্চিৎ ভড়কে যেতেন। মহাভারতের দুর্যোধন অস্ত্রচালনা ও বাগ্‌যুদ্ধে বিশেষ পটু ছিলেন বটে, কিন্তু নৃত্যকলায় তাঁর পারদর্শিতার কথা বেদব্যাস কোথাও উল্লেখ করেন নি—কিন্তু যাত্রার দুর্যোধন আচম্বিতে এক পা শূন্যে তুলে এমন এক অদ্ভুত নৃত্য শুরু করে দিলেন যে, পেশাদার নর্তকীও সেই দৃশ্য দেখলে কুরুরাজের ভারসাম্য রক্ষার প্রশংসা না করে থাকতে পারত না।

এই অভূতপূর্ব এবং অভাবনীয় দৃশ্যে আমরা সকলেই ভড়কে গিয়েছিলাম, এমন কি স্বয়ং ভীমসেনও হয়ে পড়েছিলেন স্তম্ভিত!

হঠাৎ নাচ থামিয়ে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ভীমের দিকে কটাক্ষ করলেন, "ইস্টুপিড! পাষণ্ড! বর্বর। নরাধম! তোকে যা বারণ করেছিলাম তুই করলি? তবে এই দ্যাখ্"—

সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনের হাতের গদা ছুটে এল ভীমের মস্তক লক্ষ্য করে!

এমন অতর্কিতে আক্রান্ত হলে অনেক বীরপুরুষই ধরাশায়ী হতো, কিন্তু দুর্যোধনের প্রতিপক্ষও নিতান্ত সাধারণ মানুষ নন—স্বয়ং ভীমসেন।

বিদ্যুদ্বেগে মাথা সরিয়ে আত্মরক্ষা করে ভীম তাঁর গদা চালালেন দুর্যোধনের দিকে এবং আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে নিজের গদা দিয়ে সেই গদাকে প্রতিহত করে দুর্যোধন করলেন প্রতি-আক্রমণ!

ঠক, ঠক, ঠকাস, ঠাঁই প্রভৃতি ভীষণ শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল যাত্রার আসর। এতক্ষণ বাদে দর্শকরাও আত্মস্থ হয়ে তাঁদের নিজস্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, অর্থাৎ ঘন ঘন হাততালি ও প্রশংসাসূচক ধ্বনিতে দুই যোদ্ধাকেই উৎসাহ দিতে শুরু করেছেন। আসরের অন্যান্য অভিনেতারা কিন্তু ভীম ও দুর্যোধনের দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিশেষ উৎসাহিত হতে পারেন নি, বরং তারা লড়াই থামাতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দুই মহাবীরের ঘূর্ণিত গদার ঘন ঘন আস্ফালন তুচ্ছ করে কেউ এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ একজন (খুব সম্ভব শ্রীকৃষ্ণ, ঠিক মনে নেই) এগিয়ে এসে দুর্যোধনকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলেন এবং তৎক্ষণাৎ কুরুরাজের গদাঘাতে ঠিকরে ধরাশয্যা অবলম্বন করলেন।

নারায়ণের সাক্ষাৎ অবতার শ্রীকৃষ্ণকে ধরাশায়ী করে দুর্যোধন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, পরক্ষণেই তাঁর হাতের গদা প্রচণ্ড বেগে এসে পড়ল ভীমসেনের দক্ষিণ উরুদেশের উপর—'বাপরে', বলে ভীম বসে পড়লেন দুই হাতে উরু চেপে ধরে!

ঘন ঘন হাততালিতে যাত্রার আসর সরগরম! যদিও মূল মহাভারতে কোথাও দুর্যোধনের গদাঘাতে শ্রীকৃষ্ণের পতন বা ভীমসেনেব উরুভঙ্গ প্রভৃতি বিপর্যয়ের কথা লেখা নেই, কিন্তু সমবেত দর্শকমণ্ডলী

মহাভারতের এই নতুন পালা উপভোগ করছিল অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে। দুর্যোধন তখনও আস্ফালন করছিলেন, "হতভাগা, পাজি, ইস্টুপিড! তোকে একশবার সাবধান করে দিয়েছি, তবু কথা শুনলি না? এখন বোঝ ঠ্যালা—কেমন লাগে?"

হঠাৎ কুরুপক্ষের এক যোদ্ধা বিশ্বাসঘাতকতা করল। বিকর্ণের ভূমিকায় যে লোকটি অভিনয় করছিল সে হঠাৎ দুর্যোধনের কোমর জড়িয়ে ধরল এবং সচকিত দুর্যোধন নিজেকে মুক্ত করে নেওয়ার আগেই নিতান্ত কাপুরুষের মতো পাণ্ডবপক্ষের চার মহাবীর অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল ও সহদেব দুর্যোধনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে কাবু করে গদাটি তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল! ভীমসেন অবশ্য এই অসম যুদ্ধে যোগদান করেন নি; তার কারণ অবশ্য নীতিবোধ নয়, তিনি তখনও উরু চেপে ধরে কাতরোক্তি করছিলেন, উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল না!

সহোদর ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিপক্ষের যোদ্ধাদের কাপুরুষের মতো হীন ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়ে দুর্যোধন যেসব বাক্যবাণ প্রয়োগ করতে শুরু করলেন সেগুলো কুরু অথবা পাণ্ডবপক্ষের কোনও মানুষের পক্ষেই আদৌ সম্মানজনক নয়! দর্শকরা কিন্তু ততক্ষণে দুর্যোধনের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে গেছে, ঘন ঘন হাততালি দিয়ে তারা কুরুরাজের প্রতি তাদের সহানুভূতি ও আনুগত্য প্রকাশ করছে বারংবার!

এইবার আসরে প্রবেশ করলেন যাত্রাদলের অধিকারী, দুর্যোধনের মুখের উপর তর্জনী আস্ফালন করে তিনি বললেন, "ওরে রাস্কেল! তুই কোন্ আক্কেলে ভীমকে গদার বাড়ি মারলি? গদাযুদ্ধ তো এখন হওয়ার কথা নয়, গদাযুদ্ধ হবে শেষ দৃশ্যে—সব ভুলে গেলি? তাছাড়া দুর্যোধনের গদাঘাতে ভীমের উরুভঙ্গ কে কবে শুনেছে রে ছুঁচো?"

দুর্যোধন বললেন, "ও আমার পা মাড়িয়ে দিল কেন? আমি বারবার সাবধান করে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম আমার পায়ে কড়া আছে, কড়াতে যেন না লাগে। হতভাগা ভোঁদা বক্তিমে করতে করতে আমার পায়ের কড়ার উপরই পা চাপিয়ে দিল!"

অধিকারী বললেন, "তাই বলে তুই মারবি? মহাভারতের কোন্ অধ্যায়ে দুর্যোধনের পায়ে কড়ার কথা আছে শুনি? তুই পায়ের কড়া গজাতে দিলি কেন? কড়া কেটে ফেললি না কেন? উল্লুক! বোম্বেটে! শয়তান!"

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে অধিকারী দুর্যোধনের গণ্ডদেশে করলেন প্রচণ্ড চপেটাঘাত!

দুর্যোধন তখন চার পাণ্ডবের বাহুপাশে বন্দী, তবু নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন এবং তাঁর যে গদাটি বিশ্বাসঘাতক বিকর্ণ সম্প্রতি হস্তগত করেছিল সেই গদাটির দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন সতৃষ্ণ নয়নে!

দর্শকরা তখন প্রবল উৎসাহে দুর্যোধনকে সমর্থন জানাচ্ছে। একটি অল্পবয়সী ছেলে তারস্বরে ঘোষণা করল যে, একটিবার গদা হাতে পেলে মহাবীর দুর্যোধন যে কুরুপাণ্ডবের সম্মিলিত বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দেবেন এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কিন্তু অধিকারী ও অভিনেতারা 'সপ্তরথীবেষ্টিত' দুর্যোধনের লড়াই দেখতে রাজী ছিলেন না, দর্শকদেব একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও কুরুরাজকে তাঁর গদা ফেরত দেওয়া হল না, যাত্রাও গেল ভেঙ্গে।

পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর কেটে গেছে। আমি তখন কলকাতাব এক চিত্র-পরিবেশক অর্থাৎ ফিল্ম ডিসট্রিবিউটার অফিসে কাজ করি। অফিসের মালিক একদিন জানালেন যে উক্ত অফিসে তিনি একটি লোককে নিয়োগ করতে চান। লোকটি তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোকের সুপারিশ নিয়ে এসেছিল, তাই ইচ্ছে না থাকলেও লোকটিকে চাকরি দিতেই হবে। তবে কাজের অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হলে কয়েক মাস পরে তাকে ছাঁটাই করে দেওয়া যেতে পারে। ঐ লোকটিকে আমার সঙ্গেই দেখা করার নির্দেশ দিয়েছেন মালিক, আমি যেন তাকে কাজ বুঝিয়ে দিই।

যথা আজ্ঞা। মালিক যেদিন আমাকে সব কথা জানালেন তার পরের দিনই লোকটির আসার কথা। আমার অফিসে দশটার মধ্যে হাজিরা না দিলেও চলে। অতএব নির্দিষ্ট দিনে বেরিয়ে পড়লাম বারোটার পর।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন ব্রিটিশ-অধিকৃত কলকাতা শহরে এত লোক সমাগম হয় নি। দুপুরবেলা ট্রামে-বাসে বিশেষ ভিড় হতো না, তাই যাত্রীদের আকর্ষণ করার জন্য ট্রাম কোম্পানী 'মিড ডে ফেয়ার' নামক অল্প মূল্যে টিকিট দেবার একটি রীতি প্রচলিত করেছিল। দুপুর বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত ট্রামের প্রথম শ্রেণীতে ছ' পয়সার বদলে তিন পয়সা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে চার পয়সার বদলে দু' পয়সার টিকিট কিনে যাত্রীরা ভ্রমণের অধিকার অর্জন করতে পারতো।

আগেই বলেছি আমার অফিসে হাজিরা দেওয়ার সময় সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না, খুব কাজ না পড়লে অধিকাংশ সময়েই অফিস যাওয়ার সময়ে আমরা 'মিড ডে ফেয়ার' নামক প্রচলিত রীতির সুযোগ গ্রহণ করতাম।

নির্দিষ্ট দিনে বারোটার ট্রামে উঠে আমি একটি তিন পয়সার টিকিট কিনে ফেললাম। যাত্রীর সংখ্যা ছিল খুবই কম, কাজেই কনডাকটর যখন একটি যাত্রীর সামনে গিয়ে বারবার টিকিট চাইতে লাগল তখন নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তার দিকে।

যাত্রীটি কিন্তু কনডাকটরের কথায় প্রথমে কর্ণপাত করলেন না। একটি খবরের কাগজ খুলে ধরে এমনভাবে তিনি মগ্ন হয়ে গেছেন যে মনে হয় কাগজের ছাপার অক্ষরের বাইরে কোনও কিছুই তিনি দেখতে বা শুনতে চান না।

খবরের কাগজের প্রতি যাত্রীটির গভীর অনুরাগ ট্রাম-কনডাকটরের মনে বিরক্তিকর সঞ্চার করল—

"ও মশাই, টিকিট নিয়ে তারপর কাগজ পড়ুন।"

ভদ্রলোক খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বললেন, "টিকিট হয়ে গেছে।"

কনডাকটর বলল, "কোথায়? দেখি?"

ভদ্রলোক এইবার কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে নিজের পায়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন—"ঐ যে।"

সবিস্ময়ে দেখলাম ভদ্রলোকের চটিপরা পায়ের দুই আঙুলের ফাঁকে ধরা রয়েছে একটি ট্রামের টিকিট।

কনডাকটর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানাল টিকিটটা হাতে নিয়ে দেখাতে হবে।

ভদ্রলোক শান্তভাবে জানালেন, ট্রাম কোম্পানীর আইন অনুসারে টিকিট কিনতে এবং কনডাকটর দেখতে চাইলে সেই টিকিট তাকে দেখাতে তিনি বাধ্য; কিন্তু উক্ত টিকিট হাতে করে দেখাতে হবে কি পায়ে করে দেখাতে হবে সে বিষয়ে ট্রাম কোম্পানীর কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই।

কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর কনডাকটর ভদ্রলোকের সামনে থেকে সরে গেল। ভদ্রলোকও সেই টিকিটটা পায়ের আঙুলে ধরে রেখেই আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করলেন।

অফিসে যাওয়ার পথে একটা দোকানে আমার একটু কাজ ছিল। ঐ দোকানে নেমে কাজটা সেরে নিলাম, তারপর অফিসে ঢুকলাম। বেশী দেরী হয় নি, দোকানের থেকে আমার অফিস মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। অফিসে গিয়ে নিজের আসন গ্রহণ করতেই বেয়ারা এসে জানাল এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি নাকি প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কার্ডের উপর লেখা নামটা পড়লাম—'কমল বিশ্বাস।' মালিক যে লোকটিকে সাময়িকভাবে নিয়োগ করার কথা বলেছিলেন তারও নামও কমল বিশ্বাস—অতএব বেয়ারাকে ডেকে ভদ্রলোককে নিয়ে আসতে বললাম।

যে মানুষটি আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখে চমকে উঠলাম। আরে! এই ভদ্রলোকই তো ট্রামের ভিতর একটু আগে এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন! একটু তাকিয়ে থাকতেই ভদ্রলোককে বেশ পরিচিত মনে হল, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না তাঁকে কোথায় দেখেছি।

ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, "আমার নাম স্যার কমল বিশ্বাস। আমাকে বাবু বলেছিলেন যে —"

বাধা দিয়ে বললাম, "ঠিক আছে। আমার নাম মহীতোষ রায়। আমাকে স্যার বলার দরকার নেই। মালিক আপনার কথা বলে গেছেন, আসুন আপনাকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

ভদ্রলোককে তাঁর টেবিলে বসিয়ে আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, "আচ্ছা কমলবাবু, আপনি পা দিয়ে টিকিট দেখাচ্ছিলেন কেন? হাতে করে দেখালেই পারতেন। কনডাকটরও মানুষ, তাকে ওভাবে অপমান করা আপনার উচিত হয় নি।"

কমলবাবু চমকে উঠলেন, "ও! আপনি ঐ ট্রামেই ছিলেন!"

একটু থেমে মুখ নীচু করে তিনি বললেন, "বিশ্বাস করুন, অপমান করার ইচ্ছে আমার ছিল না। হাতে নিয়ে টিকিট দেখাতে গেলেই তিন পয়সা 'গচ্চা' দিতে হতো, তাই—"

—"তার মানে?"

—"আজ্ঞে গড়িয়াহাটা থেকে উঠেছিলাম। হঠাৎ এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে রাসবিহারীর মোড়ে নামতে হল। সেই ট্রামের টিকিটটা সঙ্গে ছিল। অন্য একটা ট্রামে উঠে ওই টিকিটটা পায়ের আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরে কাগজ পড়তে শুরু করলাম। জানতাম, কনডাকটর পায়ে হাত দিয়ে টিকিট দেখবে না, তাই—"

অবাক হয়ে গেলাম! লোকটা তো দারুণ ধূর্ত! আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎচমকের মতো আর একটি দৃশ্য ভেসে উঠল আমার মানসপটে—এতক্ষণে মনে পড়েছে ভদ্রলোককে কোথায় দেখেছি!

হেসে বললাম, "চাকরি করতে এলেন কেন? যাত্রাদলে অভিনয় করতে ভাল লাগল না?"

কমলবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "আপনি আমার অভিনয় দেখেছেন বুঝি?"

মাথা নেড়ে জানালাম 'হ্যাঁ'।

তারপর সেই ভীম ও দুর্যোধনের দ্বৈরথঘটিত যাত্রাগানের উল্লেখ করতেও ভুললাম না। "হেঁ, হেঁ, হেঁ," কমলবাবু লজ্জিত হলেন, "পায়ে একটা কড়া ছিল স্যার। ওটাতে লাগলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যেত। ভোঁদা—মানে, যে ভীম সেজেছিল—তাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলাম, তবু হতভাগা ঐ কড়ার উপর এমনভাবে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল যে রাগে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম....."

একটু থেমে, একটু চুপ করে থেকে কমলবাবু বললেন, "তারপর থেকেই আমি যাত্রার দল ছেড়ে দিয়েছি।"

প্রায় একটা বছর কেটে গেল। কমল বিশ্বাস কাজকর্ম ভালই করে, ফাঁকিও দেয় না। আমাদের মধ্যে তখন অপরিচিতের ব্যবধান ঘুচে গেছে, কমলের সাহচর্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে দস্তুরমতো লোভনীয়।

একদিন কমল হঠাৎ বলল, "ওহে মহীতোষ, চলো দিনকয়েক বাইরে থেকে ঘুরে আসি।"

—"কোথায়?"

—"মধুপুর। আমার এক বন্ধুর পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ী আছে ওখানে। বন্ধুটির নাম সুশীল, সে দিনকয়েকের জন্য হাওয়াবদল করে আসতে চায়। চলো, আমরাও ঐ সঙ্গে ঘুরে আসি। বাড়ীভাড়া তো লাগবে না, আর তুমি বললে মালিক ছুটি দিতে রাজী হবেন! কাজকর্ম বিশেষ নেই এখন, আর তোমার অনুরোধ মালিক ফেলতেও পারবেন না।"

সত্যি কথা। আমার কাজকর্মে অফিসের মালিক আমার উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। আমি ছিলাম তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র।

পনেরো দিনের ছুটি মঞ্জুর করে নিয়ে কমল এবং তস্য বন্ধু সুশীলের সঙ্গে মধুপুর চলে গেলাম। সুশীলের পুরো নাম হচ্ছে সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। ট্রেনের মধ্যেই বেশ আলাপ জমে গেল

এবং 'আপনি' ও 'বাবু' প্রভৃতি অধিকন্তু বিসর্জন দিয়ে আমরা বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম অতি অল্প সময়ের মধ্যেই।

মধুপুর গিয়ে নির্দিষ্ট বাড়ীটা খুঁজে নিতে খুব বেগ পেতে হল না। পুরানো দোতলা বাড়ী, দেখাশুনা করে একটা মালী। সে আমাদের ঘরদোর খুলে সব ব্যবস্থা করে দিল। বাড়ীটা বেশ বড়, পরিচর্যার অভাবে তার অবস্থা বেশ জীর্ণ। নীচের একটা ঘর পরিষ্কার করে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করলাম।

স্টেশনের কাছাকাছি একটা হোটেলে আমরা সেদিন খেয়ে নিলাম। ঠিক করলাম, যে-কয়দিন আছি ঐ হোটেলেই খাব, রান্নার হাঙ্গামা করব না। আমরা যে বাড়ীটায় ছিলাম তার আশেপাশে সমস্ত জায়গাটার একটা বর্ণনা দেওয়া দরকার। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, তখনকার ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে বর্তমান মধুপুরের বিশেষ মিল থাকার কথা নয়। কারণ এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান মধুপুরের চেহারায় অনেক পরিবর্তন এনেছে বলেই আমার বিশ্বাস।

স্টেশনের নিকটবর্তী এলাকা অর্থাৎ শহর অঞ্চল ছাড়িয়ে চলে গেছে একটা সুদীর্ঘ পথ। ঐ পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে বহু অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। বিরাট বিরাট সেই প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলির অবস্থা নিতান্তই জীর্ণ-শীর্ণ এবং সেই অতিবৃহৎ অট্টালিকাগুলির সম্মুখবর্তী উদ্যানের স্থান অধিকার করে আত্মপ্রকাশ করেছে ঘন ঝোপজঙ্গল, এমন কি কোনও কোনও বাড়ীর ভিতর থেকে ইষ্টক-অবরোধ ভেদ করে মাথা তুলেছে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ। ঐ বৃহৎ অট্টালিকা-অরণ্য ছড়িয়ে রয়েছে বড় পথের দু'পাশে এবং তাদের মধ্যবর্তী গলিপথগুলি বিলুপ্ত হয়েছে সবুজ প্রান্তরের উপর। আমরা যে বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেটা ছিল একটা মাঠের উপর এবং সেখানে যেতে হলে দুটি অট্টালিকার মধ্যবর্তী একটা গলিপথ অতিক্রম করতে হোত।

স্টেশনের কাছে পূর্বোক্ত হোটেলে আমরা সকালে চা ও দুপুরে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিতাম। দুপুরবেলা হোটেল থেকে ফিরে এসে আমরা দাবা খেলতাম। দুপুর পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে থাকতাম বটে কিন্তু বিকাল হতেই আমি সঙ্গীদের সাহচর্য ছেড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তাম। কমল ও সুশীল স্টেশনে গিয়ে পরিচিত মানুষের সন্ধান করতো, আর আমি যেতাম ফাঁকা মাঠের দিকে মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্য গ্রহণ করতে। কলকাতা শহর থেকে এখানে এসে স্টেশনের জনাকীর্ণ স্থানে আবার কলকাতার মতোই শহরের পরিবেশ উপভোগ করতে আমার ভাল লাগতো না। অতএব বিকাল হলেই আমি হয়ে পড়তাম নিঃসঙ্গ, একক।

অনেক সময় কবরখানায় বেড়াতে গেছি। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে সেই জনহীন স্থানে দাঁড়িয়ে আমি যেন এক অন্য জগতের সাড়া পেতাম। ভাষার সাহায্যে সেই অদ্ভুত অনুভূতিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করব না। সে ক্ষমতাও আমার নেই—তবে এইটুকু বলতে পারি গোরস্থানে আমি কোনদিন ভয় পাই নি, তবে রোমাঞ্চ অনুভব করেছি বটে।

হ্যাঁ, ভয় পেয়েছিলাম—

কিন্তু কবরখানায় নয়, কবরখানা থেকে ফেরার পথে।

তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।

হাতে ঘড়ি ছিল না, মনে হয় রাত সাড়ে সাতটা কি আটটা হবে। শহরের বাইরে ঐ সব জায়গায় একটু রাত হলেই মনে হয় গভীর রাত্রি। তবে রাত বাড়লেও আমার অস্বস্তির কারণ ছিল না, জ্যোৎস্নার কল্যাণে রাতের অন্ধকার আমার দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিতে পারে নি, চাঁদের আলোতে সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম...দুটি বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যবর্তী সরু পথ অবলম্বন করে এগিয়ে গেলাম, এখনই সামনে পড়বে পরিচিত প্রান্তর এবং সেই প্রান্তর পথ অতিক্রম করলেই বাড়ী। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি, একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর হোটেলের দিকে যাত্রা করব উদরের ক্ষুধা শান্ত করার জন্য।

হঠাৎ চমকে থেমে গেলাম—

কোথায় এসেছি? ভুল হয়েছে, এ তো আমার পরিচিত পথ নয়!

বেশ কিছু দূরে মুক্ত প্রান্তরের উপর অবস্থিত একটি জলাশয়ের অপর প্রান্তে যে বাড়ীটি দাঁড়িয়ে আছে সেটিও দ্বিতল বটে কিন্তু আমাদের পরিচিত গৃহ নয়!

একটু নজর দিয়ে দেখলাম দোতলা বাড়ী হলেও সেই বাড়ীর ছাদের উপর এককোণে একটা ছোট ঘর দেখা যাচ্ছে—চিলেকোঠা।

বাড়ীটি অন্ধকার, কিন্তু চিলেকোঠার একটি মাত্র জানালায় আলোর আভাস!

জ্যোৎস্না-আলোকিত উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর সেই জলাশয় এবং নীলাভ-কৃষ্ণ রাত্রির আকাশের পটভূমিতে দ্বিতল গৃহের একটি মাত্র ঘরের আলোক-উজ্জ্বল বাতায়ন আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করল—মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেইদিকে এগিয়ে গেলাম নিজেরই অজ্ঞাতসারে!

আর তৎক্ষণাৎ আমার অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে এক তীব্র অনুভূতি আমাকে সাবধান করে দিল। আমি বুঝলাম ঐ বাড়ীতে গেলে আর ফিরে আসতে পারব না!

একেই কি বলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়?

জানি না, তবে এক অদম্য আকর্ষণে আমার পা দুটো যেন আমাকে বারবার ঠেলে দিতে চাইছিল সেই বাড়ীর দিকে। তবু জোর করে আত্মসংবরণ করলাম। কিন্তু স্থানত্যাগ করতে পারলাম না। পিছন ফিরতে গেলেই মনে হচ্ছিল আমি যেন এক পরম কামনার ধন ফেলে রেখে চলে যাচ্ছি, অদ্ভুত এক মানসিক যাতনাবোধ করছিলাম—মনে হচ্ছিল নিতান্ত প্রিয়জনকে যেন বিদায় দিচ্ছি আমার জীবন থেকে।

হঠাৎ মনে হল, এইখানে দাঁড়িয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে যদি বন্ধুদের নিয়ে আসি তাহলে তো নির্ভয়ে ঐ বাড়ীটার কাছে যেতে পারি আর তিনজন একসঙ্গে থাকলে ভয়ের কোনও কারণ থাকবে না, অতএব পিছন ফিরে যে পথে এসেছি সেই পথেই আবার পদচালনা করতে উদ্যত হলাম!

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভয় পেলাম।

দারুণ আতঙ্কে আমার পা দুটি নিশ্চল হয়ে গেল!

না, কোনও ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখি নি।

যে পথের উপর দিয়ে আমি মাঠে এসে পৌঁছেছিলাম, সেই পথের দু'ধারে অবস্থিত দু'টি বিশাল অট্টালিকার জীর্ণ প্রাচীরের উপর দিয়ে দুই বাড়ীর গাছপালা অজস্র ডালপালা হাত বাড়িয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে, তার ফলে ঘন পত্রপল্লবশোভিত বৃক্ষশাখার নীচে পথটার উপর বিরাজ করছে এমন এক ঘনীভূত অন্ধকার যে চাঁদের আলো পর্যন্ত সেই উদ্ভিদের নিবিড় আবরণ ভেদ করে পথের উপর প্রবেশ-অধিকার পায় নি।

অন্ধকার-আবৃত সেই পথ এবং মাথার ওপর ঝাঁকড়া গাছপালার নিবিড় সমাবেশের দিকে তাকিয়ে এক দারুণ আতঙ্ক অনুভব করলাম। আমি বুঝলাম ঐ পথের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, আমার অনুভূতি আমাকে বলে দিচ্ছে ঐ পথের উপর অবস্থান করছে এমন এক ভয়ঙ্কর যার অস্তিত্ব আমি অনুভব করতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু তাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না! পিছন ফিরে বাড়ীটার দিকে চাইলাম। যাব নাকি? এগিয়ে যাব ঐ বাড়ীর দিকে? ওখানে আশ্রয় চাইব?

একটু এগিয়ে গেলাম। দারুণ আকর্ষণবোধ করছি, মনে হচ্ছে ছুটে যাই ঐ বাড়ীর দিকে। কিন্তু তবু অবচেতন মনে অনুভব করলাম ওখানেই রয়েছে আমার মৃত্যু, যত মোহ যত আকর্ষণই বোধ করি না কেন, ঐ বাড়ী হচ্ছে আমার মরণ-ফাঁদ! কোনও যুক্তি নেই এমন চিন্তার, তবু বারবার মনে হতে লাগল মোহময় ঐ মরণ-ভবনকে পিছনে ফেলে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে ঐ পথের দিকে—ভয় দেখানো ভয়ঙ্করকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে পারলে ঐ পথই হবে আমার প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়!

তবু সেদিকে পা বাড়াতে পারলাম না। যতবার পা বাড়াই ততবারই দারুণ আতঙ্কে পিছিয়ে আসি। হঠাৎ ভীষণ ক্রোধে আমার চৈতন্য যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল কেন? কেন যেতে পারব না ঐ পথে? কোন অমঙ্গলের অদৃশ্য ছায়া প্রাণরক্ষার একমাত্র পথ থেকে সরিয়ে আমাকে ঠেলে দিতে চায় ঐ মরণ-ভবনের দিকে?

দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে আমি এগিয়ে গলিপথ ধরে। একটু এগিয়ে যেতেই আবার ভয় পেলাম, দারুণ ভয়!

অপার্থিব সেই আতঙ্কের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মনে হল আমার ঠিক পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছে এক অশুভ জীব, যার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, কিন্তু যাকে চোখে দেখা যায় না! প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল এক দৌড়ে ঐ পথটা পার হয়ে চলে যাই, কিন্তু নিজেকে সংবরণ করে স্বাভাবিকভাবেই হাঁটতে লাগলাম। জানতাম ছুটতে গিয়ে যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই তাহলে আর আমার উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকবে না এবং চলৎশক্তি রহিত হয়ে যদি ঐখানে পড়ে থাকি তাহলে যে জীবটির অস্তিত্ব আমি অনুভব করতে পাচ্ছি তার কবলেই যে আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই...আমি বলছি আর অনুভব করছি

আমার ঠিক পিছনেই সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে অমঙ্গলের অদৃশ্য ছায়া....অবশেষে আর আত্মসংবরণ করতে না পেরে ঘুরে দাঁড়ালাম—নাঃ! কেউ নেই!

আচম্বিতে দারুণ আতঙ্ক আমার চেতনাকে গ্রাস করল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি তীরবেগে ছুটলাম গলিপথ ধরে বড় রাস্তার দিকে।

না, পড়ে যাই নি; কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এসে পড়লাম বড় রাস্তার উপর আর ঠিক সেই মুহূর্তে নারীকণ্ঠের ঐকতান সঙ্গীত প্রবেশ করল আমার শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে।

সাঁওতাল মেয়েরা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে বড় রাস্তা ধরে!

আঃ! গান যে কত মধুর সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম। জীবনে অনেক ভাল ভাল গায়কের গান শুনেছি, কিন্তু কয়েকটি অশিক্ষিত সাঁওতাল রমণীর কণ্ঠসঙ্গীত সেই রাতে আমাকে যেমন আনন্দ দিয়েছিল তেমন আনন্দ কখনও গান শুনে পাই নি। নীরব মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে সেই সঙ্গীত যেন জীবনের অস্তিত্ব ঘোষণা করল আমার সম্মুখে!

দুই বাড়ীর মাঝখানে গাছপালার আচ্ছাদনের নীচে যে অন্ধকার-আচ্ছন্ন পথটা পার হয়ে এলাম সেইদিকে দৃষ্টিপাত করে আবার সেই অশুভ ও অদৃশ্য অমঙ্গলের অস্তিত্ব অনুভব করলাম। ঐ সঙ্গে আমার অনুভূতিতে ধরা পড়ল আর এক সত্য ঃ

অদৃশ্য অমঙ্গলের কায়াহীন আত্মা এই বড় রাস্তার উপর আসতে পারে না, ঐ গলিপথই হচ্ছে তার অধিকারভুক্ত এলাকা!

পিছন ফিরে সবেগে পা চালিয়ে দিলাম নিজের আস্তানার দিকে। এবার আর ভুল হল না। বাড়ী এসে দেখলাম কমল ও সুশীল দাবা খেলছে। সব কথা খুলে বলে আমি তাদের আমার সঙ্গে ঐ বাড়ীতে যেতে অনুরোধ করলাম। ভেবেছিলাম 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর আশায় দু'জনেই আমার সঙ্গে ঐ বাড়ীর দিকে যেতে রাজী হবে, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম তারা কেউ সেই বাড়ীর দিকে পা বাড়াতে রাজী নয়!

দু'জনেরই অভিমত হচ্ছে, বিদেশে বেড়াতে এসে ভূতের কবলে পড়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমি জানালাম ওখানে কোনও ভূত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি এবং আমার সম্মুখে উপবিষ্ট দুই মূর্তিমান অদ্ভুতের চাইতে বড় কোনও ভূত সেখানে থাকতে পারে বলে মনে হয় না। ওরা কোনও কথা বলল না, চুপ করে দাবা খেলতে লাগল। আমি তখন 'ভীরু', 'কাপুরুষ' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করে দুই বন্ধুর আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করলাম। আশা ছিল, সুশীল রাজী না হলেও কুরুরাজ দুর্যোধনের আধুনিক প্রতিনিধির স্থান যে-মানুষটি অধিকার করেছিল অন্ততঃ সেই কমল বিশ্বাস আমার ধিক্কার শুনে অপমান বোধ করে আমার সঙ্গে যেতে রাজী হবে। কিন্তু আশা সফল হল না, আমার দুর্বাক্যগুলি দুর্যোধনের একদা-প্রতিনিধি অবলীলাক্রমে হজম করলেন এবং দাবার চাল দিতে দিতে আমাকে লক্ষ্য করে যেসব উপদেশ বর্ষণ করলেন তার সারমর্ম হচ্ছে ঃ কোনও বুদ্ধিমান মানুষই বিদেশে বেড়াতে এসে ভূতের সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ প্রকাশ করে না, অতএব আমার মতো নির্বোধের দুর্বাক্যে বিচলিত হয়ে সঙ্কল্প ত্যাগ করার পাত্র

যে কমল বিশ্বাস নন এই পরম সত্যটি উদঘাটন করে উক্ত নামধারী মানুষটি আবার দাবার চালে মনোনিবেশ করলেন।

আমি খুবই হতাশ হলাম। কিন্তু একা ওখানে যাওয়ার আমার সাহস ছিল না, তাই সে রাতে কৌতূহল দমন করে সুবোধ বালকের মতোই নৈশভোজন শেষ করে শয্যার বুকে আশ্রয় গ্রহণ করলাম।

পরের দিন খুব সকালে উঠে সেই বাড়ীটার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কি আশ্চর্য! কোথাও সেই বাড়ী অথবা পূর্বদৃষ্ট জলাশয়টির অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারলাম না!

এই ঘটনার পর আরও সাত দিন আমরা মধুপুরে ছিলাম। ঐ সাত দিনের মধ্যে প্রত্যেক দিনই আমি অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু ঐ বাড়ী আর জলাশয় আমার দৃষ্টিপথে একদিনও ধরা দিল না! খুবই আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নেই।

এলাকাটা ছিল খুব ছোট, আর অট্টালিকাগুলির মধ্যবর্তী পথগুলি কিছু অগুনতি নয়, কিন্তু সবগুলি গলিপথ ও পথের শেষে অবস্থিত প্রান্তরগুলির উপর তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েও আমি ঈপ্সিত বস্তুর দর্শন পেলাম না!

যাদের কাছে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছি, তাদের মধ্যে অনেকেই বলে ওটা হচ্ছে 'ইলিউসন' বা 'চোখের ভুল'। আমার ধারণা অন্যরকম। আমার বিশ্বাস ঐ বাড়ী আর জলাশয় দিনের আলোতে আমি খুঁজে পাই নি বটে, কিন্তু রাতের অন্ধকারে যদি অনুসন্ধান করতাম, তাহলে নিশ্চয়ই ঐ বাড়ীব সাক্ষাৎ লাভ করতাম। নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাত্রিকালে ঐ বাড়ীর খোঁজ করার সাহস আমার হয় নি, তাই রহস্য আমার কাছে রহস্যই রয়ে গেল।

'ইলিউসন' বা 'চোখের ভুল' প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আমার মনঃপূত নয়। আমি নেশাগ্রস্ত হই নি, সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সুস্থ দেহে চাঁদের আলোতে অন্ততঃ দশ মিনিট ধরে মরীচিকা দেখার মতো অসুস্থ মন বা চোখ আমার তখনও ছিল না, এখনও নেই।

প্রাচীন যুগে তো বটেই, বর্তমানে বিংশ শতাব্দীতেও দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বিবরণ নিতান্ত বিরল নয়। মধ্যযুগের ইউরোপে তো দ্বন্দ্বযুদ্ধ দস্তুরমতো জনপ্রিয় ছিল। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন হওয়ার পর তলোয়াবের সঙ্গে বন্দুক বা পিস্তল নিয়ে ডুয়েল বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়াই রীতি প্রচলিত হয়। একসময়ে এই দ্বৈরথ যুদ্ধ বিরাট সম্মানের ব্যাপার ছিল, বিভিন্ন দেশের রাজকীয় আইনও দ্বন্দ্বযুদ্ধের সমর্থন করত। পরে অবশ্য সব দেশেই ডুয়েল বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ বেআইনি বলে ঘোষিত হয়।

তবু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী কাল পর্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের ঘটনা প্রায়ই ঘটত। ঐ ঘটনাগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাদের উদারতা, বীরত্ব প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাওয়া যেত, আবার কয়েকটি ঘটনা হিংস্র পাশবিকতায় কলঙ্কিত। কখনও কখনও রক্তাক্ত ভীষণতার পরিবর্তে দ্বৈরথ-রণ হাস্যরসের উদ্রেক করত, একথাও সত্যি। বিভিন্ন যুগে সংঘটিত এইসব বিচিত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধের ইতিহাস থেকে কয়েকটি ঘটনা পরিবেশন করছি। আশা করি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রথমেই পরিবেশন করছি উনবিংশ শতকের স্যাডি আর গ্যালাস ম্যাগ নামে কুখ্যাত দুটি মেয়ের দ্বৈরথ রণের কাহিনী। মেয়েদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিংবদন্তীর অ্যামাজন নামক নারীজাতি ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রানী বডিসিয়া, জোয়ান অব আর্ক প্রভৃতি রমণী পুরুষের মতোই বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং আমাদের দেশের ইতিহাসও চাঁদ সুলতানা, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি বীরাঙ্গনার কাহিনীতে সমুজ্জ্বল—

অতএব দ্বন্দ্বযুদ্ধের ইতিহাসে মেয়েদের নাম এমন কি অসম্ভব ব্যাপার?

ভূমিকা শেষ করে এবার কাহিনীর আসরে নামছি। ১৮৬০ সাল, নভেম্বর মাস; আমেরিকার গৃহযুদ্ধ যখন শুরু হওয়ার উপক্রম করছে, সেই সময় নিউইয়র্ক শহরে 'ফোর্থ ওয়ার্ড' নামে এক বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল।

না, গৃহযুদ্ধ নয়—গৃহযুদ্ধের বিষয়ে সেখানকার সমাজবিরোধীদের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। পূর্বোক্ত এলাকার চোর, গুণ্ডা, খুনী আর জুয়াড়ীদের উত্তেজনার বিষয়টা ছিল গ্যালাস ম্যাগ আর স্যাডি নামে দুটি মেয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। মেয়ে দুটি ছিল দুর্দান্ত দুই গুণ্ডাদলের নেত্রী, তাই কেবলমাত্র সমাজবিরোধীরাই উক্ত দ্বৈরথ সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করছিল।

লডাই-এর প্রকাশ্য কারণ হচ্ছে এক গুণ্ডার সর্দার—স্লবারি জিম। তাকে বিবাহ করার জন্য

উন্মুখ মেয়ে দুটি দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাধ্যমেই মীমাংসার পথ বেছে নিয়েছিল। তবে আসল কারণটা অন্য। মুখে প্রকাশ না করলেও বিরোধের সত্যিকার কারণ কারও অজ্ঞাত ছিল না। লড়াইতে যদি ম্যাগ জিততে পারে, তাহলে স্যাডি তার শার্লটন স্ট্রীটের গুণ্ডার দল নিয়ে ম্যাগের দলে ভিড়ে যাবে, এটাই ছিল অবধারিত সত্য। বলাই বাহুল্য, স্যাডি আর তার দলবলকে বিজয়িনী ম্যাগের আধিপত্য স্বীকার করে নিতে হবে এবং স্লবারি জিমকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করার অধিকারও স্যাডির থাকবে না। পক্ষান্তরে স্যাডি জিতলে জিম স্যাডির বিশ্বস্ত স্বামী হয়ে তার বিশাল দল নিয়ে স্ত্রীর গুণ্ডাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করবে।

অর্থাৎ ঐ এলাকায় আধিপত্য বিস্তারই মূল উদ্দেশ্য। আর সেইজন্যই স্লবারি জিমকে দলে টানার দরকার মনে করেছিল পরস্পরবিরোধী দুই গুণ্ডদলের দুই নেত্রী। বিয়ের ব্যাপারটা নিতান্তই অজুহাত, একটা মিষ্টি ছুতো ছাড়া আর কিছু নয়।

এইবার দুই দলনেত্রীর পরিচয় দিচ্ছি। প্রথমেই শুরু করছি গ্যালাস ম্যাগকে নিয়ে। গ্যালাস ম্যাগ খাঁটি ইংরেজ। তার দেহের উচ্চতা ছয় ফুট অতিক্রম করেছে, ওজন ২১০ পাউণ্ড। মাগের কোমরে একদিকে ঝুলত একটা প্রকাণ্ড পিস্তল, আর একদিকে ভীষণ দর্শন একটি কাঠের গদা। ম্যাগের একটা মদের দোকান ছিল। সেই দোকানের মধ্যে কোন হতভাগা খরিদ্দার যদি গোলমাল বাধাত, তাহলে তার রক্ষা ছিল না। ম্যাগের গদার বাড়ি পড়ত খরিদ্দারের মাথায়, সে হতো ধরাশায়ী! পরক্ষণেই তার কান কামড়ে ধরে টানতে টানতে তাকে দরজা পর্যন্ত নিয়ে বাইরে বার করে দিত ম্যাগ। ঐ সময়ে লোকটা বাধা দিলে ম্যাগ দাঁত দিয়ে লোকটার কান কেটে ফেলত! তারপর সেই কান সাজিয়ে রাখত একটা কাচের পাত্রে। এইভাবে ঐ পাত্রটির মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছিল বহু মানুষের ছিন্ন কর্ণ! ম্যাগের ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে সেই কানগুলোকে সাজিয়ে রাখা হতো মদ্য পরিবেশন করার জন্য নির্দিষ্ট টেবিলের ঠিক পিছনেই।

স্যাডি ছিল ছিপছিপে হালকা গড়নের তরুণী। ৩০৪নং ওয়াটার স্ট্রীটে অবস্থিত জন অ্যালেনের নাচঘরে সে যখন নাচত, তখন নর্তকীদের মধ্যে সে ছিল অন্যতমা সুন্দরী। পরে অবশ্য নাচ ছেড়ে দিয়ে সে গুণ্ডাদলের নায়িকা হয়। স্যাডির গুণ্ডাদলের নায়িকা হওয়ার ইতিহাস বড় বিচিত্র, কিন্তু এখানে সে প্রসঙ্গ আর তুলব না। ম্যাগের মতোই স্যাডির কোমরে ঝুলত পিস্তল, তবে গদা সে রাখত না। কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে একটা ছোট জাহাজ নিয়ে সে জলপথে ডাকাতি করত। দস্যু সমাজে ম্যাগের চাইতে তার প্রতিপত্তি কম ছিল না। স্যাডির লড়াই করার কায়দা অদ্ভুত—হঠাৎ মাথা নীচু করে প্রতিপক্ষের পেটে সজোরে ঢুঁ মেরে তাকে ফেলে দিত, তারপর ভূপতিত শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাথা মাটিতে ঠুকতে থাকত বারংবার। শত্রু বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত স্যাডি তাকে ছাড়ত না।

লড়াই-এর দিনে আবহাওয়া ছিল চমৎকার। ভিড় জমেছিল যথেষ্ট। যে দোকানটা লড়াই-এর আখড়া হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল, সেই দোকানের নাম 'দেয়ালের গর্ত'। অদ্ভুত নামের ঐ আস্তানার অধিকারিণী ছিল গ্যালাস ম্যাগ।

গুণ্ডাদের দুটি দলই সেখানে ভিড় জমিয়েছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখার জন্য। স্লবারি জিম নামে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি একটি কাঠের পাটাতনের উপর স্থান গ্রহণ করেছিল।

লড়াই-এর সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছিল মধ্যাহ্নে। কিন্তু দুপুরের অনেক আগে থেকেই উৎসাহী জনতা সেইখানে ভিড় জমিয়েছিল। দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলাফল নিয়ে বাজি ধরা হচ্ছিল। একসময় হঠাৎ দুই নেত্রীর সমর্থকদের মধ্যে লড়াই লাগার উপক্রম। কয়েকজনের মধ্যস্থতায় আবার শান্তি স্থাপিত হতেও দেরি হল না। পুলিসের ভয় ছিল না। পুলিসকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ঐ সময়ে কোন কারণেই তাদের দোকানে ঢুকতে দেওয়া হবে না। পুলিস তাই দোকানের এলাকার ধারে-কাছে ছিল না, চুপ করে বসেছিল থানার মধ্যে।

সাড়ে এগারটার সময়ে দুই নারীযোদ্ধা অকুস্থলে উপস্থিত হল। টেবিলে ভর দিয়ে তারা পরস্পরকে জরিপ করছিল জ্বলন্ত চক্ষে। জ্যাক দি র‍্যাট নামে এক কুখ্যাত গুণ্ডা এসেছিল স্যাডির মধ্যস্থ হিসাবে, ম্যাগের তরফ থেকে অনুরূপ অংশ গ্রহণ করেছিল সো ম্যাডেন নামে আর এক হতচ্ছাড়া খুনী। দুই মধ্যস্থের পরামর্শের ফলে স্থির হল লড়াইতে পিস্তল ব্যবহার করা চলবে না, গ্যালাস ম্যাগ তার গদা ব্যবহার করতে পারে এবং স্যাডি ইচ্ছা করলে অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করতে পারে একটা হুইস্কির বোতল।

নির্দিষ্ট অস্ত্র দুটি পানাগারের প্রধান টেবিলের পিছনে রেখে দেওয়া হল। যুযুধান দুই নারী স্লবারি জিমের দিকে তাকিয়ে মধুর হাসি বিতরণ করল, তারপর পরস্পরের দিকে তাকাল জ্বলন্ত চক্ষে। উত্তেজনা বাড়ল সমবেত দর্শকদের মধ্যে।

অতঃপর শুরু হল বাগযুদ্ধ। রক্ত গরম না হলে লড়াই জমবে কেন?

"ম্যাগ," বিদ্রূপজড়িত স্বরে স্যাডি বলল, "তুমি একটা হোঁৎকা চর্বির পুঁটলি ছাড়া কিছু নও।"

"তোমার উপর থেকে যখন আমি হাত সরিয়ে নেব," ম্যাগ পরিষ্কার ইংরেজিতে শুদ্ধ উচ্চারণে বলল, "তখন তোমার রক্তমাংস দিয়ে লোকে ইঁদুরের টোপ তৈরি করবে। বুঝেছ স্যাডি?"

ম্যাগ হাত বাড়িয়ে তার গদা টেনে নিল, স্যাডি তুলল হুইস্কির বোতল। তারপর ঘরের মধ্যে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল যুযুধান দুই নারী।

হঠাৎ পরস্পরকে লক্ষ্য করে তারা এল। প্রথম রক্তদর্শন করল স্যাডি। লঘুচরণে বিড়ালীর মতো গদার আঘাত এড়িয়ে বোতল তুলল স্যাডি। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে বোতলের দিকে তাকাল ম্যাগ। স্যাডি কিন্তু বোতল চালাল না, অন্য হাতটা বাড়িয়ে ম্যাগের গাল আঁচড়ে দিল। লম্বা লম্বা ধারাল নখের আঘাতে ম্যাগের গাল বেয়ে নামল রক্তের স্রোত। স্যাডির সমর্থকবৃন্দ উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

স্যাডি একটু পিছিয়ে গেল। ম্যাগ আবার গদা চালাল। স্যাডি সরে গিয়েও সম্পূর্ণভাবে আঘাত এড়িয়ে যেতে পারল না, গদা তার মাথা ছুঁয়ে ছিটকে গেল। মুহূর্তের জন্য স্যাডির পা টলে গেল। ম্যাগ এলোপাথাড়ি গদার বাড়ি মারতে শুরু করল। স্যাডি আর দাঁড়াতে পারল না, প্রচণ্ড প্রহারে জর্জরিত হয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর। সঙ্গে সঙ্গে স্যাডিকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল ম্যাগ, তার হাঁ-করা মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা দাঁতগুলো হিংস্র আগ্রহে এগিয়ে এল স্যাডির

ম্যাগলের ডান হাতের রিভলবারের নল থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া।

কুমিরের দেহটাকে কামড়ে ধরে সে শূন্যে তুলে ফেলল।

কানের দিকে। কিন্তু হালকা গড়নের স্যাডি চটপট গড়িয়ে সরে গেল শত্রুর নাগালের বাইরে, পরক্ষণেই তার হাতেব বোতল ম্যাগের মাথার খুলিতে পড়ে চুরমাব হয়ে ভেঙ্গে গেল। ম্যাগের মাথা বেয়ে নেমে এল গরম রক্তের ধারা। মার খেয়ে ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয় ম্যাগ, সে স্যাডির শার্ট চেপে ধরে একটানে ছিঁড়ে ফেলল। দুটো দলই উল্লাসে চিৎকার করে দলনেত্রীদের সমর্থন জানাল।

ম্যাগ টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। স্যাডি মাথা নীচু করে ছুটে এল ম্যাগের দিকে। সেই টুঁ পেটে লাগলে ম্যাগ সেখানেই শুয়ে পড়ত। শেষ মুহূর্তে কোনরকমে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করল ম্যাগ। নিজের গতিবেগ সামলাতে না পেরে স্যাডি গিয়ে পড়ল একটা কাঠের মূর্তির উপর। গুরুভার কাষ্ঠমূর্তি এতটুকু নড়ল না, মাথায় চোট পেয়ে মেঝের উপর শয্যাগ্রহণ করল স্যাডি, তার চৈতন্য তখন প্রায় অবলুপ্ত।

ম্যাগের অবস্থাও ভালো নয়, মাথার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে ভীষণভাবে—তবু নিজেকে সামলে নিয়ে আহত বাঘিনীর মতো স্যাডির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁ কানটা কামড়ে ধরল ম্যাগ, তারপর সেই অবস্থাতেই তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল দরজার দিকে। দুই হাতে প্রাণপণে চড়-ঘুষি চালিয়েও স্যাডি নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। দরজার উপর দাঁড়িয়ে ম্যাগ যখন প্রহারে জর্জরিত স্যাডিকে বাইরে ফেলে দিল, তখন তার মুখের মধ্যে চলে এসেছে স্যাডির কান!

ম্যাগ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কানটা হাতে তুলে নাড়তে নাড়তে জানিয়ে দিল, দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে জয়লাভ করেছে।

ম্যাগের সমর্থকবৃন্দ আনন্দে ফেটে পড়ল। হই-হট্টগোল, চিৎকার। স্লবারি জিম পাটাতনের 'সিংহাসন' থেকে নেমে এসে গ্যালাস ম্যাগকে অভিনন্দন জানাল। সমবেত দর্শকদের মধ্যে যারা স্যাডির উপর বাজি ধরেছিল, তারা বিষণ্ণ বদনে টাকা গুনে দিল বিজয়ী পক্ষের হাতে।

দোকানঘরে যখন নরক গুলজার হচ্ছে, সেই সময় কিড বার্ণ, স্ন্যাচেম আর জ্যাক নামে স্যাডির দলভুক্ত তিনটি গুণ্ডা নেত্রীর আহত কর্ণের পরিচর্যা করে ক্ষতস্থান বেঁধে দিল, তারপর তাকে সযত্নে কাঁধে তুলে নিজেদের আস্তানার দিকে যাত্রা করল।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের আসরে যবনিকা পড়লেও কাহিনী এখানেই শেষ নয়। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, লড়াই-এর পর কয়েকদিনের মধ্যেই ম্যাগ আর স্যাডির মধ্যে দারুণ বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে উঠল এবং

দুজনে মিলে স্লবাবি জিমকে হত্যার চক্রান্তে লিপ্ত হল। প্যাটসি নামে এক দুর্ধর্ষ খুনী গুণ্ডাকে বলা হল জিমকে হত্যা করতে। কিন্তু স্লবারি জিম পাকা শয়তান, তাকে খুন করতে গিয়ে প্যাটসি নিজেই খুন হয়ে গেল জিমের হাতে। জিম বুঝল, এখানে থাকলে মৃত্যু অবধারিত। সে পালিয়ে গিয়ে সৈন্যদলে যোগ দিল। পরে সে কনফেডারেট পদাতিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন হয়েছিল। এদিকে পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধে গ্যালাস ম্যাগের দলে বারোটা গুণ্ডা মারা পড়ল, সাতান্ন জন ধরা পড়ে গারদে ঢুকল। আচম্বিতে দলের এমন ভয়াবহ বিপর্যয়ে গুণ্ডামিতে ইস্তফা দিল গ্যালাস ম্যাগ। ফলে সমগ্র এলাকায় গুণ্ডাদের একমাত্র রানী হয়ে বসল স্যাডি। পুলিসের সঙ্গে দীর্ঘকাল লড়াই করে স্যাডি তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। পুলিসকে ফাঁকি দিতে পারলেও মহাকালের বিধানকে লঙ্ঘন করতে পারে নি স্যাডি; ১৮৯২ সালে হাডসন নদীতে পাওয়া গেল তার মৃতদেহ। মৃত্যুকালে স্যাডির বয়স হয়েছিল ষাট। ঐ বয়সেও তার দেহের গড়ন ছিল অতিশয় বলিষ্ঠ।

ঊনবিংশ শতকে সংঘটিত আর একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধের ঘটনা বলছি। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ। টেক্সাস অঞ্চলে একটি পানাগারের ভিতর বসে তাসের জুয়া খেলছে একটি অল্পবয়সী কিশোর ও জনৈক প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ। পুরুষটি ঐ এলাকার একটি কুখ্যাত জুয়াড়ী ও দুর্ধর্ষ গুণ্ডা—নাম, বেন স্টারডিভ্যান্ট। কিশোবটির নাম ল্যাটি মোর।

খেলা চলছে, ছেলেটি হেরে যাচ্ছে বার বার। তীব্র উত্তেজনায় তার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত, বার বার বাজি হারছে বটে, কিন্তু খেলা ছেড়ে ওঠার নাম করছে না।

হঠাৎ পানাগারের দরজা ঠেলে একটি লোক ভিতরে প্রবেশ করল। খেলোয়াড়দের উপর একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে আগন্তুক একটু চমকে উঠল—কিশোরের পিতার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠভাবে পবিচিত। ছেলেটি তাকে চিনতে না পারলেও নবাগত মানুষটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বন্ধুপুত্রকে সনাক্ত করতে পেরেছিল। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আগন্তুক বুঝল, ল্যাটি মোরকে অসৎভাবে ঠকিয়ে বাজির টাকা জিতে নিচ্ছে জুয়াড়ী বেন। অনভিজ্ঞ কিশোরের চোখে পাকা জুয়াড়ীর জুয়াচুরি ধরা পড়ছে না, পরমানন্দে ল্যাটি মোরকে ঠকিয়ে তার টাকাগুলো পকেটস্থ করছে বেন স্টারডিভ্যান্ট।

নবাগত মানুষটি কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে খেলা দেখল, তারপর ধীরপদে এগিয়ে এসে কিশোর ল্যাটি মোরের কাঁধে হাত রাখল, "তুমি আমায় চিনতে পারবে না, কিন্তু তোমার বাবা পারবেন। আমি তোমার পিতৃবন্ধু। তোমার তাস নিয়ে আমাকে একটু খেলতে দাও।"

ল্যাটি মোর সম্মত হয়ে জায়গা ছেড়ে দিল, তার স্থান গ্রহণ করল আগন্তুক। কিছুক্ষণ খেলার পর দেখা গেল বেন জুয়াচুরি করে যে টাকাগুলো ল্যাটি মোরের কাছ থেকে জিতে নিয়েছিল, সেই টাকা আবার নবাগত মানুষটি জিতে নিয়েছে। শুধু তাই নয়—সর্বসমক্ষে বেন স্টারডিভ্যান্টের অসাধু আচরণের কথা প্রকাশ করে দিল আগন্তুক। টাকাগুলো অবশ্য সে পকেটস্থ না করে ল্যাটি মোরকে ফিবিয়ে দিয়েছিল, সেই সঙ্গে কিছু উপদেশ, "সাবধান! ভবিষ্যতে কখনও জুয়া খেলবে না।"

মুখের শিকার ছিনিয়ে নিলে বাঘ যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, বেন স্টারডিভ্যান্টের অবস্থাও হল সেইবকম। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে সে ছোরা বার করে আগন্তুককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাল।

বেচারা স্টারডিভ্যান্ট! সে ভাবতেও পারে নি যে-লোককে সে ছোরার 'ডুয়েল' লড়তে চ্যালেঞ্জ

করছে, সেই লোকটি হচ্ছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জিম বোয়ি! ছোরার লড়াইতে জিমের সমকক্ষ কোন যোদ্ধা সে সময়ে ছিল না।

জিম আত্মপরিচয় দিল না। ছোরা নিয়ে সে দ্বন্দ্বযুদ্ধের উদ্‌যোগ করল। লড়াই শুরু হল 'মেক্সিকান ডুয়েল' নামক রীতি অনুসারে। তখনকার দিনে ছোরা হাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়ার যে-সব পদ্ধতি ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর 'মেক্সিকান ডুয়েল'। ঐ পদ্ধতি অনুসারে লড়াই করার আগে যোদ্ধাদের বাঁ হাত দুটি পরস্পরের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয় এবং লড়াই শুরু করার নির্দেশ পাওয়া মাত্র দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ডান হাতের ছোরা দিয়ে আঘাত হানতে থাকে নির্মমভাবে।

পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে লড়াই চলল কিছুক্ষণ ধরে। কয়েকবার নিজের ছোরা দিয়ে প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করল জিম, তারপর হঠাৎ বিদ্যুদ্বেগে আঘাত করল শত্রুর ডান হাতের উপর। শাণিত ছুরিকা মুহূর্তের মধ্যে যেন স্টারডিভ্যান্টের দক্ষিণ হস্তে বিদ্ধ হল, দারুণ যাতনায় ছুরি খসে পড়ল তার হাত থেকে। জিমের হাতের ছোরা আবার ঝলসে উঠল। কিন্তু না—প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহে নয়—দুই যোদ্ধার বাঁ হাত আটকে যে দড়ির বাঁধন শক্ত হয়ে বসেছিল, সেই দড়িটাকে দংশন করল জিমের অস্ত্র।

অসহায় বেনকে অনায়াসে হত্যা করতে পারত জিম, কিন্তু তা না করে উদারভাবে শত্রুর হাতের দড়ি কেটে তাকে মুক্তি দিল। জিমের সঙ্গে যারা ছোরা হাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমেছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র বেন ছাড়া কোন মানুষই পৃথিবীর আলো দেখার জন্য জীবিত ছিল না। বেন স্টারডিভ্যান্ট ছিল ভাগ্যবান পুরুষ।

জেফারি হাডসন ছিল ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লসের অতিশয় স্নেহের পাত্র। অতি ক্ষুদ্রকায় বামন হলেও জেফারি ছিল সাহসী মানুষ। একবার রাজার বাগানে কয়েকটি ক্রীড়ারত শিশুকে যখন একটি অতিকায় টার্কি পাখি আক্রমণ করেছিল, সেইসময় তরবারি হাতে পাখিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জেফারি হাডসন। ঐ টার্কি পাখির দৈহিক আয়তন জেফারির চাইতে বড় ছিল, কিন্তু নিপুণ হাতে তলোয়ার চালিয়ে পাখিটাকে হত্যা করে হাডসন সেদিন শাণিত নখচঞ্চুর আক্রমণ থেকে বিপন্ন শিশুদের রক্ষা করেছিল।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মতোই মর্যাদাবোধ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল জেফারি হাডসন। একদিন ক্রফ্‌ট্‌স্ নামে জনৈক অফিসার হাডসনকে নিয়ে একটু মজা করার চেষ্টা করল হাডসন ক্ষেপে গেল, সে ক্রফ্‌ট্‌স্‌কে আহ্বান করল দ্বন্দ্বযুদ্ধে।

এতটুকু একটা পুঁচকে মানুষ—রাজার খাবারের বাটির মধ্যে যে আত্মগোপন করে বসে থাকতে পারে—তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ? ক্রফ্‌ট্‌স্ তো হেসেই আকুল। হাসতে হাসতেই সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য নির্ধারিত স্থানে যোগ দিতে এল জেফারি হাডসন। ক্রফ্‌ট্‌স্‌ও এসেছিল, তবে তার সঙ্গে তলোয়ার কিংবা পিস্তল ছিল না—অস্ত্র হিসাবে সে বাগিয়ে ধরেছিল একটা জল দেবার পিচকারি!

দ্বিতীয়বার অপমানে হাডসন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তার সঙ্গে ছিল একজোড়া পিস্তল—একটা পিস্তল সে ক্রফ্‌ট্‌সের দিকে ছুড়ে দিয়ে তাকে অস্ত্র ব্যবহার করতে অনুরোধ করল।

এবাব আর পায়ে হেঁটে নয়, অশ্বপৃষ্ঠে পিস্তল হাতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের সম্মুখীন হল। বামন জেফারি হাডসনের পিস্তল থেকে নিক্ষিপ্ত বুলেট যখন ক্রফ্‌ট্‌সের বক্ষভেদ করল, তখনও তাব মুখ থেকে হাসির রেখা মিলিয়ে যায় নি। হাসতে হাসতেই মৃত্যুবরণ করেছিল অফিসার ক্রফ্‌ট্‌স্‌।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস নগরীব আকাশে এক আশ্চর্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে যোগদানকারী দুই যোদ্ধার নাম যথাক্রমে মসিয়ঁ দ্য গ্র্যাণ্ড প্রী ও মসিয়ঁ লে পিক। কোন কারণে পূর্বোক্ত দুই ভদ্রালোকের মধ্যে মতান্তর ঘটেছিল, যার ফলে তাঁরা স্থির করলেন বেলুনে উঠে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাধ্যমে তাঁদের কলহের মীমাংসা করবেন।

খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মতো। যখনকার কথা বলছি সেই সময় ইউরোপের মানুষ, বিশেষ করে ফবাসীরা, কথায় কথায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমে পড়তেন। কাজেই ঐ দুই ভদ্রলোকের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যাপারটা এমন কিছু অভিনব ছিল না। কিন্তু আকাশে বেলুন উড়িয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরিকল্পনা ইতিপূর্বে কারও মাথায় আসে নি। অতএব নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে সেই চমকপ্রদ ও অভূতপূর্ব দ্বৈবথের ফলাফল দর্শন করার জন্য ভিড় করল এক বিপুল জনতা।

কিছুক্ষণেব মধ্যেই যোদ্ধাদের নিয়ে আকাশে উড়ল দুটি বেলুন। প্রত্যেক বেলুনের মধ্যে যুযুধানদের সঙ্গে ছিলেন একজন করে মধ্যস্থ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অট্টালিকাগুলোর মাথা ছাড়িয়ে বেলুন দুটি বেশ উপরে উঠে গেল। মাটি ছাড়িয়ে প্রায় আধমাইল উপরে যখন বেলুনরা উড়ছে, সেই সময় মসিয়ঁ লে পিক তাঁর 'ব্লাণ্ডার ব্যাস' (এক ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র) থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য কবে অগ্নিবর্ষণ করলেন। লক্ষ্য ব্যর্থ হল। এইবার গুলি ছুড়লেন মসিয়ঁ গ্র্যাণ্ড পী। তাঁর নিক্ষিপ্ত গুলি প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহ স্পর্শ করল না বটে, কিন্তু বেলুনের গায়ে লেগে বেলুনটাকে ফাটিয়ে দিল। হতভাগ্য মসিয়ঁ লে পিক ও তাঁর সঙ্গী মধ্যস্থকে নিয়ে ফুটো বেলুনটা সবেগে আছড়ে পড়ল একটা বাড়ির ছাদের উপর—সেই আঘাতের বেগ সামলাতে না পেরে দুটি মানুষই ঢলে পড়লেন মৃত্যুর ক্রোড়ে।

ইতিহাসে যে-সব দ্বন্দ্বযুদ্ধের ঘটনা পাওয়া যায়, সেইসব ঘটনার নায়করা যে সব সময় যুদ্ধের বীতিনীতি পালন করেছে একথা বলা যায় না—কাবণ মানুষের বিরুদ্ধে মানুষই যে সকল সময় দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে এমন নয়।

পশু ও মানুষের দ্বৈরথ ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছে একাধিকবার।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হিউজ গ্লাস নামে এক অভিযাত্রী ও সীমান্তরক্ষী আমেরিকার 'রকি মাউন্টেন' অঞ্চলে এক বিশালকায় গ্রিজলি ভল্লুকের সম্মুখীন হয়েছিল। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিরট ঐ জন্তুটা ছিল নয় ফুট লম্বা! হিউজ গ্লাস তার বন্দুক ছুড়ল। গুলি লাগতেই ভল্লুক ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে এল হিউজের দিকে। দ্বিতীয়বার গুলি চালানোর আগেই প্রকাণ্ড এক থাবার আঘাতে হিউজের বন্দুকটা দূরে ছিটকে পড়ল। ভল্লুকের দ্বিতীয় চপেটাঘাত হিউজকে করল ধরাশায়ী। রক্তাক্ত ও অবসন্ন দেহ নিয়ে হিউজ টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, তারপর কোমর থেকে শাণিত ছুরিকা কোষমুক্ত করে চতুষ্পদ প্রতিদ্বন্দ্বীব মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হল। বারবার ছুরিকাঘাত করে হিউজ তার শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলাব চেষ্টা করছিল। কিন্তু ভল্লুকটা তাকে এমন ভীষণভাবে জড়িয়ে ধরেছিল

যে, হিউজের মনে হচ্ছিল তার শবীরের হাড়গুলো এখনই ভেঙ্গে যাবে। দেহের শেষ শক্তি জড় করে প্রাণপণে ছুরি চালাতে লাগল হিউজ।

হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল গ্রিজলি ভল্লুকের ভয়াবহ আলিঙ্গন, ধীরে ধীরে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল শ্বাপদেব প্রাণহীন দেহ। হিউজ যুদ্ধে জয়ী হল বটে, কিন্তু ভল্লুকের নখদন্ত তাকে প্রায় মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল। শরীরের মারাত্মক ক্ষতগুলো নিরাময হতে বেশ সময় লেগেছিল; দীর্ঘ কয়েক মাস যন্ত্রণা ভোগ করার পর সুস্থ হয়ে উঠেছিল হিউজ গ্লাস।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জুলাই আমেরিকার পশ্চিম অংশে যে বিখ্যাত দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই যুদ্ধে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম ইয়েলো হ্যাণ্ড ও বাফেলো বিল কোডি। রেড ইণ্ডিয়ানদের এক দলপতির নাম ইয়েলো হ্যাণ্ড। বাফেলো বিল কোডি ছিল আমেরিকার তদানীন্তন সেনাবাহিনীর এক অশ্বারোহী সৈনিক। যুদ্ধটা কি করে ঘটেছিল এইবার সেই কথাই বলছি। উল্লিখিত অশ্বারোহী বাহিনীর একটি দল একদিন হঠাৎ আকস্মিকভাবে 'শেনি' জাতের রেড ইণ্ডিয়ানদের একদল যোদ্ধার সামনে পড়ে গেল। রেড ইণ্ডিয়ানদের ঐ দলটা শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিল, কিন্তু তারা আমেরিকার অশ্বারোহী সৈন্যদের আক্রমণের চেষ্টা করল না। কারণ, সর্দার ইয়েলো হ্যাণ্ড ইতিমধ্যেই কোডিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে দল ছেড়ে এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ এতগুলো লোকের ভিতর থেকে কোডিকে সর্দার কেন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বেছে নিয়েছিল, এই প্রশ্নটা হয়তো কারও মনে জাগতে পারে। তাই পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, সেই যুগে বাফেলো বিল কোডি নামটি ছিল রেড ইণ্ডিয়ান জাতির ক্রোধ ও ঘৃণার বস্তু। রেড ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে বিল কোডি অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। কোডিকে চিনতে পেরেছিল বলেই সর্দার ইয়েলো হ্যাণ্ড তাকে দ্বৈরথ বণে আহ্বান জানিয়েছিল।

সর্দারেব আহ্বানে সাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এল কোডি।

সর্দারও অগ্রসব হল। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরকে লক্ষ্য কবে তীরবেগে এগিয়ে আসতে লাগল, হাতে তাদেব গুলিভরা রাইফেল।

ধাবমান ঘোড়াব পায়ে পাযে মধ্যবর্তী দূরত্ব যখন খুব কমে এসেছে, তখন হঠাৎ নিজের উইনচেস্টার বাইফেল তুলে গুলি ছুড়ল কোডি।

ইয়েলো হ্যাণ্ড গুলি চালানোর সময় পেল না, তার আহত ঘোড়া মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল। পবক্ষণেই কোডি নিজেও ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে ধরাশয্যা অবলম্বন করল। দুজনেই একসঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর পরস্পরকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল উন্মাদের মতো।

যোদ্ধাদের মধ্যে কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারল না। অবশেষে যখন তাদের গুলি ফুরিয়ে গেল, তখন অকেজো রাইফেল ফেলে দিয়ে তারা কটিবন্ধের খাপ থেকে টেনে নিল ধারাল ছুরি। সতর্ক দৃষ্টিতে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করতে করতে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, দুজনেই শত্রুর পাঁয়তারার মধ্যে ফাঁক খুঁজতে ব্যস্ত...আচম্বিতে যেন এক অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু-আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে ছুরির ফলকে ফলকে জাগল বিদ্যুতের চমক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে গেল, ছুরিকাঘাতে ছিন্নভিন্ন ইয়েলো হ্যাণ্ড রক্তাক্ত দেহে মৃত্যুবরণ করল—মৃত্যুপণ দ্বৈবথে জয়লাভ করল বাফেলো বিল কোডি। 'শেনি' রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের সর্দারের মৃত্যুতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল, একটি কথাও না বলে তারা নিঃশব্দে স্থানত্যাগ করল।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যে-সব দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই সব যুদ্ধে সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও উদারতার অভাব থাকলেও ভীষণতার অভাব ছিল না—পাশবিক হিংসার প্রাণঘাতী উগ্রতায় তৎকালীন দ্বৈরথের ইতিহাস অতিশয় ভয়াবহ।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার দুজন রাজনৈতিক নেতা পিস্তল হাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ঐ দুই ভদ্রলোকের নাম মেজর জেমস জ্যাকসন ও রবার্ট ওয়াটকিন্স। দুই যোদ্ধাই গুলি ছুড়লেন, দুজনের লক্ষ্যই হল ব্যর্থ। আবার পিস্তলে গুলি ভরার চেষ্টা না করে দুজনেই তীরবেগে ছুটে পরস্পরের নিকটবর্তী হয়ে পিস্তলের নীচে লাগানো ছোট সঙিনের সাহায্যে শত্রু নিপাতের চেষ্টা করতে লাগলেন। ধারাল সঙিনের খোঁচায় দুজনেরই পোশাক-পরিচ্ছদ হল ছিন্নভিন্ন, দেহ হল রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত, এবং এক সময়ে দেখা গেল, শ্রান্ত-ক্লান্ত যোদ্ধাদের শিথিল মুষ্টি থেকে অস্ত্র দুটি পড়ে গেছে মাটির উপর!

লড়াই তবু শেষ হল না। জ্যাকসন আর ওয়াটকিন্স এবার প্রয়োগ করলেন মুষ্টিযোগ—শুরু হল দারুণ ঘুষোঘুষি। প্রায় ঘণ্টাখানেক মারামারি করার পর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান হারিয়ে ধরাশায়ী হলেন।

এমন সাংঘাতিক লড়াই-এর পরেও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হল না। ঐ দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বেশ কয়েক বৎসর পরেও যোদ্ধাদের কে বড়, এই নিয়ে দুজনের সমর্থকদের মধ্যে প্রবল তর্কের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই বাগ্‌যুদ্ধ কখনও কখনও রূপান্তরিত হয়েছে ভীষণ মুষ্টিযুদ্ধে।

১৮০০ সালে কিলকেনি ফ্রেল্যাণ্ড নামক স্থানের নিকটে উন্মুক্ত প্রান্তরে পিস্তল নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামলেন দুই ভদ্রলোক। ভদ্রলোক দুটির নাম অনারেবল সমারসেট বাটলার ও মিঃ পিটার বারোজ। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন ব্যারিস্টার। তবে বাটলার সাহেবের সঙ্গে বিরোধ মেটাতে তিনি আদালতের

আশ্রয় না নিয়ে পিস্তলের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। অতএব দ্বন্দ্বযুদ্ধ। মধ্যস্থের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই যোদ্ধাদের পিস্তল গর্জে উঠল। বারোজ সাহেব ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বাটলার অক্ষত দেহ নিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন দ্রুতবেগে।

একজন চিকিৎসক তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ধরাশায়ী বারোজকে পবীক্ষা করে বললেন, আহত ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কয়েক মিনিটের মধ্যেই বহির্গত হবে প্রাণবায়ু। কয়েক মিনিট তো দূরের কথা, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আহত বারোজ আর্তনাদ করলেন, তবু অনিবার্য মৃত্যুর কোন লক্ষণই তাঁর দেহে দেখা দিল না!

বিস্মিত চিকিৎসক আবার ভাল করে পরীক্ষা শুরু করলেন এবং মরণোন্মুখ বাবোজ সাহেবের ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একগাদা বাদামেব সঙ্গে মারাত্মক গুলিটাকেও বার করে ফেললেন। চিকিৎসক বুঝলেন পকেটের গাদা-গাদা বাদাম আর একটি রৌপ্যমুদ্রার সংঘর্ষে পিস্তলের গুলির শক্তি কমে গিয়েছিল—বুলেট সজোরে আঘাত করে বারোজকে ফেলে দিয়েছিল বটে, কিন্তু বাদাম আর রৌপ্যমুদ্রার কাঠিন্য ভেদ করে বারোজকে জখম করতে পারে নি।

বারোজ যখন চিকিৎসকের কাছে শুনে জানতে পারলেন আপাততঃ তিনি মরছেন না, তখন ভারী আশ্চর্য হয়ে তিনি আর্তনাদ থামিয়ে ফেললেন এবং ভূমিশয্যা ত্যাগ করে একলাফে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করল নিকটবর্তী চিকিৎসক ও মধ্যস্থের প্রবল অট্টহাসি। মিঃ পিটার বারোজের কর্ণমূল হল রক্তবর্ণ, চটপট পা চালিয়ে তিনি অকুস্থল ছেড়ে প্রস্থান করলেন দ্রুতবেগে।

১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার টমাস দ্য লা মার্চে নামক একজন ফরাসী নাইট স্যার জন দ্য ভিকঁৎ নামে জনৈক সাইপ্রিয়টের অধিবাসীকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। একদল খ্রীষ্টান সৈন্য তুর্কীদের হাতে বিপন্ন হয়েছিল এবং স্যার টমাসের মতে ঐ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী স্যার জন দ্য ভিকঁৎ। অভিযোগ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ভিকঁৎ তাঁর হাতের দস্তানা খুলে টমাসের সামনে ফেলে দিলেন। তখনকার দিনে ঐ ভাবেই একজন আর একজনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করত। অতএব টমাস ও জনের মধ্যে যুদ্ধ হয়ে পড়ল অবধারিত।

ইংল্যাণ্ডের ওয়েস্টমিনিস্টার নামক স্থানে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের সামনে পূর্বোক্ত দ্বৈরথ সংঘটিত হয়। প্রচলিত রীতি অনুসারে বিপরীত দুই দিক থেকে সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে দুই যোদ্ধা শূল হাতে পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু প্রথম সংঘর্ষেই শূল দুটি গেল ভেঙ্গে এবং যোদ্ধাবাও আঘাতের বেগ সামলাতে না পেরে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লেন মাটির উপর।

উভয় যোদ্ধারই দেহ ছিল লৌহবর্মে আবৃত, শূলের ফলক ঐ বর্ম ভেদ করতে পারে নি, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাতে অশ্বারোহী যোদ্ধাদের পদাতিকে পরিণত করে দিয়েছিল।

অশ্বারোহীর পদ থেকে পদাতিকের অবনত স্থানে নেমে আসলেও যোদ্ধাদের উৎসাহ একটুও কমে নি, তরবারি কোষমুক্ত করে দুই বীর আবার রণরঙ্গে মেতে উঠলেন। তলোয়াবের খেলায় দুই পক্ষই সিদ্ধহস্ত, সংঘাতে সংঘাতে তীব্র ঝংকারধ্বনি তুলে ঝকমক জ্বলতে লাগল দুটি ঘূর্ণ্যমান তরবারি—কিন্তু যুযুধানরা কেউ সুবিধা করতে পারলেন না। অবশেষে হঠাৎ প্রচণ্ড সংঘর্ষে দুখানা তলোযারই ভেঙ্গে গেল।

তলোয়ার ভাঙ্গল, লড়াই থামল না। লৌহদস্তানায় আবদ্ধ বজ্রমুষ্টি তুলে দুই যোদ্ধা পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। দুজনেরই সর্বাঙ্গ ছিল লৌহবর্মে ঢাকা। কিন্তু দূরদর্শী ফরাসী বীর যুদ্ধের বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, তাঁর ডান হাতের দস্তানার বহির্ভাগে বসিয়ে দিয়েছিলেন ধারাল লোহার কাঁটা। তীক্ষ্ণ কণ্টকসজ্জিত সেই লৌহময় বজ্রমুষ্টির নিদারুণ প্রহার যখন স্যার ভিকঁতের মুখেব উপরে বৃষ্টিধাবার মতো পড়তে লাগল, তখন তিনি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। মুখেব লৌহ-আবরণ ভিকঁৎকে ঐ ভয়াবহ দস্তানার বজ্রমুষ্টি থেকে বাঁচাতে পারল না। পরাজিত ভিকঁৎ হলেন ফরাসী বীর টমাসের বন্দী।

এসব ক্ষেত্রে বিজয়ী যোদ্ধা পরাজিত বন্দীর কাছ থেকে মোটা রকম মুক্তিপণ দাবী করতেন এবং ঐ অর্থ না পেলে বন্দীকে মুক্তি দিতেন না। কিন্তু স্যার দ্য লা মার্চে কোনরকম মুক্তিপণ দাবী না করেই উদারভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

এবার সাগরের বুকে ভাসমান জাহাজের উপর একটি প্রসিদ্ধ দ্বন্দ্বযুদ্ধের কাহিনী বলছি। সাত সাগরের বুকে জাহাজ ভাসিয়ে যে-সব জলদস্যু ইতিহাসের পৃষ্ঠা রক্তাক্ত করে তুলেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র ও ভয়ংকর মানুষ হচ্ছে বোম্বেটে সর্দার এডওয়ার্ড টিচ ওরফে এডওয়ার্ড ব্ল্যাক বিয়ার্ড। সাধারণ মানুষের কথা তো ছেড়েই দিলাম, দুর্ধর্ষ জলদস্যুরাও তাদের দলপতি ব্ল্যাক বিয়ার্ডকে যমের মতো ভয় করত। ব্ল্যাক বিয়ার্ড তার দলকে পরিচালনা করত কঠোর হস্তে; ক্রুদ্ধ হলে তার হাতে শত্রু-মিত্র কারুরই রক্ষা ছিল না। উক্ত বোম্বেটে দলপতির দৈহিক শক্তি ছিল অসাধারণ। একটা জোয়ান মানুষকে সে মাথার উপর তুলে ছুড়ে ফেলতে পারত অনায়াসে। বছরের পর বছর ধরে সমুদ্রের বুকে সন্ত্রাস ও বিভীষিকার রাজত্ব চালিয়েছিল ব্ল্যাক বিয়ার্ড। তার অধীনে জলদস্যুরা বহু জাহাজ লুঠ করেছিল এবং ঐসব জাহাজের নাবিক ও যাত্রীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল ব্ল্যাক বিয়ার্ডের আদেশ অনুসারে। কোন মানুষকেই ভয় করত না ব্ল্যাক বিয়ার্ড। দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে ছিল দুর্জয় যোদ্ধা।

একদিন রাজকীয় নৌবহরের দুটি জাহাজ বোম্বেটে ব্ল্যাক বিয়ার্ডের জাহাজকে আক্রমণ করল। উক্ত জাহাজ দুটিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট রবার্ট মেনার্ড। প্রচণ্ড হট্টগোল ও মারামারির মধ্যেও মেনার্ডের সন্ধানী দৃষ্টি ব্ল্যাক বিয়ার্ডকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হল। তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে বোম্বেটে দলপতিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন অসিধারী মেনার্ড। বলাই বাহুল্য, সেই আহ্বানে

সাড়া দিতে একটুও দেরি করে নি বোম্বেটে ব্ল্যাক বিয়ার্ড। শুরু হল যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্ল্যাক বিয়ার্ড বুঝল, এ শত্রু সহজ নয়—সে আজ শক্ত পাল্লায় পড়েছে। একবার এগিয়ে, একবার পিছিয়ে এবং চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ ধরে লড়াই চলল। দুই যোদ্ধারই সর্বাঙ্গ হল ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। অবশেষে সমুদ্রের বুকে সংঘটিত যাবতীয় দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ লড়াইটা শেষ হয়ে গেল মেনার্ডের তরবারির দ্রুত সঞ্চালনে—জাহাজের রক্তরঞ্জিত পাটাতনের উপর লুটিয়ে পড়ল মরণাহত ব্ল্যাক বিয়ার্ডের ঘৃণিত শরীর।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ঠিক ক্রিসমাসের আগে লণ্ডনের একটি ক্লাবে গিল্‌স বোথাম ও টম ব্রাস নামে দুই ভদ্রলোকের মধ্যে ভীষণ তর্ক শুরু হল। তর্কের বিষয়বস্তু খুবই তুচ্ছ, কিন্তু শ্লেষতিক্ত কণ্ঠের বাদানুবাদের ফল হল অতিশয় মারাত্মক। বোথামের ক্রুদ্ধ কণ্ঠের চ্যালেঞ্জ তর্কযুদ্ধকে টেনে আনল 'পিস্তল-ডুয়েল' নামক ভয়াবহ দ্বৈরথের প্রাণঘাতী সম্ভাবনার মধ্যে।

সাধারণতঃ দিনের আলোতেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উত্তেজিত ভদ্রলোক দুটি আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারকে উপেক্ষা করে তৎক্ষণাৎ ফয়সালা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। ক্লাবের মধ্যে 'ডুয়েল' লড়া সম্ভব নয়, অতএব নিকটস্থ একটি মাঠের দিকে দুজনে রওনা হলেন। মধ্যস্থ হিসাবে দুজন সাক্ষী যোগাড় করতেও তাঁদের দেরি হয় নি। তখন তুষারপাত হচ্ছে। পিস্তলের নিশানাকে অস্পষ্ট করে তুলেছে সন্ধ্যার ছায়া। দুই প্রতিযোগী অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করে পিস্তল তুললেন। মধ্যস্থের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র গুলি ছুড়লেন বোথাম। লক্ষ্য ব্যর্থ হল। এবার পিস্তল তুললেন টম ব্রাস এবং ধীরে ধীরে প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর লক্ষ্যস্থির করতে লাগলেন।

মধ্যস্থ দুজন ও বোথাম বুঝলেন, আজ আর রক্ষা নেই। কারণ, টম ব্রাস হলেন 'ক্র্যাক-শট'—তাঁর হাতের গুলি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন বোথাম। পিস্তলের লক্ষ্য স্থির করে গুলি চালাতে উদ্যত হলেন টম ব্রাস—আর ঠিক সেই মুহূর্তে নীরবতা ভঙ্গ করে ভেসে এল ক্রিসমাসের সঙ্গীত-ধ্বনি। টম শুনলেন, সুরের জাল বুনতে বুনতে গায়করা সমগ্র মানবজাতিকে পরস্পরের প্রতি স্নেহপরায়ণ হতে অনুরোধ করছে। অদ্ভুতভাবে সেই সঙ্গীত টমের হৃদয়কে পরিবর্তিত করল। উদ্যত পিস্তল নামিয়ে নিলেন টম ব্রাস।

যে ক্লাবঘরের ভিতর উল্লিখিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল, আবার সেইখানে দুই যুযুধানকে দেখা গেল। অবশ্য তাঁদের হাতে পিস্তল ছিল না, ছিল কাচের পানপাত্র। তাঁরা হাসিমুখে পরস্পরের

'স্বাস্থ্যপান' করছেন এবং তাঁদের পানপাত্রে স্থান পেয়েছে দুটি বিভিন্ন জাতের সুরা—যাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রথমে বাগ্‌যুদ্ধ ও পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ডুয়েল লড়াইটা হয়েছিল, এখানে সেই কথাই বলছি। লেখাপড়ায় কোনদিনই ভাল ছিলেন না স্যার উইনস্টন চার্চিল, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তাঁর তলোয়ারে হাত ছিল পাকা। ছাত্রজীবনেই তলোয়ারের দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কোন অসিযোদ্ধা ছিল না। 'স্যাণ্ডহার্স্ট' অঞ্চলে 'রয়েল মিলিটারি কলেজ'-এ সৈনিকের শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন চার্চিল এবং সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃটিশ বাহিনীর 'চতুর্থ হাসার' নামক সেনাবিভাগের অন্যতম অধিনায়ক হয়েছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এক পর্বতসঙ্কুল স্থানে তিনি যখন অধীন সেনাদের নিয়ে টহল দিচ্ছিলেন, সেই সময়ে তাঁদের আক্রমণ করল একদল বিদ্রোহী পাঠান।

ইংরেজ সেনাদলে সৈন্যসংখ্যা ছিল খুব কম, তাই তারা পিছু হটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। নিরাপদ স্থান থেকে চার্চিল দেখলেন, তাঁর এক আহত সঙ্গী পাঠান দলপতির উদ্যত তরবারির নীচে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে পাঠান-সর্দারকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন।

পাঠান সেই রণ-আহ্বান উপেক্ষা করল না। আহত সৈনিককে ছেড়ে সে এগিয়ে গেল চার্চিলের দিকে। উদ্যত তরবারি হাতে মৃত্যুপণ দ্বৈরথে অবতীর্ণ হল দুই যোদ্ধা। পাঠান বিদ্রোহীরা সরে গিয়ে যোদ্ধাদের জায়গা করে দিল।

উদ্বিগ্ন নেত্রে শত্রুর গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে করতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পাঁয়তারা করল বেশ কিছুক্ষণ, তারপর অকস্মাৎ তীব্র ঝনৎকারে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল দুখানা শাণিত তরবারি। পাঁচ মিনিট ধরে লড়াই চলার পর তরবারির এক দ্রুত সঞ্চালনে লড়াই শেষ করে দিলেন চার্চিল। পাঠান-সর্দার রক্তাক্ত দেহ নিয়ে ধরাশায়ী হল। প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে এল বিদ্রোহী পাঠানবাহিনী, কিন্তু তাদের চেষ্টা বিফল হল না। ইংরেজ সেনাদের রাইফেলগুলো ঘন-ঘন অগ্নিবর্ষণ করে পাঠানদের ঠেকিয়ে রাখল এবং সেই ফাঁকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলেন উইনস্টন চার্চিল।

ঊনবিংশ শতকে আমেরিকার এক জেনারেল দ্বৈরথ রণে জীবন বিপন্ন করেছিলেন, পরে তিনি হয়েছিলেন ঐ দেশেরই কর্ণধার। ঘটনাটা বলছি ঃ

জেনারেল অ্যানড্রু জ্যাকসন লোকটি ছিলেন যেন শক্তসমর্থ, তেমনি তাঁর কথাবার্তাও ছিল চোখা-চোখা। রেখে-ঢেকে কথা বলতে তিনি জানতেন না প্রয়োজনে, উচিত কথা শুনিয়ে দিতে তিনি ইতস্ততঃ করতেন না কখনই এবং তার ফলে যে-কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে তাঁর আপত্তি ছিল না কিছুমাত্র। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস ডিকেনসন নামে এক কুখ্যাত জুয়াড়ীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া বেধে গেল। আগেই বলেছি, জেনারেল ছিলেন স্পষ্টবক্তা। তাঁর শাণিত বাক্যবাণে বিপর্যস্ত জুয়াড়ী ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে পিস্তলের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাল।

জুয়াড়ী ডিকেনসন ছিল পাকা পিস্তলবাজ। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ পনেরবার পা ফেলে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, সেই দূরত্ব থেকে পিস্তলের গুলি চালিয়ে একটা দোদুল্যমান সুতোকে

ছিঁড়ে ফেলতে পারত ডিকেনসন। জুয়াড়ী চার্লস ডিকেনসনেব লক্ষ্যভেদ করার সাংঘাতিক ক্ষমতা সম্পর্কে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকাব মানুষ ছিল অবহিত। জেনারেল অ্যানড্রুও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর নির্ভুল নিশানার কথা জানতেন, কিন্তু তবুও এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে তাঁর বিলম্ব হয় নি এক মুহূর্তও। দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য নির্বাচিত স্থানটির নাম 'টেনেসি'।

পিস্তলধাবী দুই যোদ্ধার মধ্যবর্তী দূরত্ব ছিল মাত্র আট পা। পরস্পরকে লক্ষ্য করে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পিস্তল উদ্যত কবলেন। প্রথমেই গুলি ছুড়ল ডিকেনসন। মধ্যস্থরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন জেনারেল জ্যাকসন। কী আশ্চর্য! লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত ডিকেনসনের নিক্ষিপ্ত বুলেট তাহলে ব্যর্থ হল? পরক্ষণেই অগ্নি উদ্‌গিরণ করে গর্জে উঠল জেনারেল জ্যাকসনের পিস্তল এবং ডিকেনসনের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর। বিবর্ণ রক্তহীন মুখে জেনারেল তাঁর জন্য অপেক্ষমান গাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন স্খলিত চরণে। জেনারেলের অবস্থা দেখে জনৈক মধ্যস্থ সন্দেহ করলেন, ডিকেনসনের লক্ষ্য বোধহয় ব্যর্থ হয় নি। সন্দেহ সত্য। জেনারেলের পাঁজরে বিদ্ধ হয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বীব গুলি। দাঁতে দাঁত চেপে সেই আঘাত সহ্য করে জেনারেল যখন তাঁর নিশানা স্থির করছিলেন, তখনও শত্রুর নিক্ষিপ্ত বুলেট তাঁর দেহের ভিতরেই ছিল! আহত জেনারেল পরে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি হয়েছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

এইবাব যে ঐতিহাসিক দ্বৈরথের বিবরণ দিতে যাচ্ছি, সেই ঘটনা ঘটেছিল অষ্টাদশ শতকের স্কটল্যাণ্ডে। ডিউক অব মণ্টরোজ স্কটল্যাণ্ডের রব বয় ম্যাকগ্রেগবকে তার নিজস্ব জমি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। উক্ত ডিউক ছিলেন অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও অসৎ প্রকৃতির ইংবেজ। রব রয়ের জমি থেকে চালাকি করে তাকে উৎখাত করার পর জায়গাটা নিজেই দখল করে নিয়েছিলেন ডিউক অব মণ্টরোজ। ফলে স্কটল্যাণ্ডের মাটিতে জন্ম নিল এক ইংরেজ-বিদ্বেষী দস্যু—রব রয় ম্যাকগ্রেগর।

১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকগ্রেগর গোষ্ঠী তার প্রতিবেশী স্টুয়ার্ট বংশের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ল। স্টুয়ার্টদের দলপতি জানাল, উভয়পক্ষ থেকে একজন করে নির্বাচিত যোদ্ধা যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে অসিহস্তে অবতীর্ণ হয়, তাহলে বহু মানুষের হতাহত হওযার সাংঘাতিক পরিণতিকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। কারণ, দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলাফল থেকেই বিবাদের নিষ্পত্তি হতে পারে অনায়াসে। ধূর্ত স্টুয়ার্ট দলপতি জানত, তার দলের নির্বাচিত যোদ্ধার সমকক্ষ কেউ নেই ম্যাকগ্রেগরদের মধ্যে। রব রয়কে সে গণ্য করে নি। সে ভেবেছিল বৃদ্ধ বয়সে রব রয় আর তলোয়ার ধরতে এগিয়ে আসবে না।

স্টুয়ার্ট দলপতির ধারণা ভুল। স্টুয়ার্টদের নির্বাচিত যোদ্ধার সম্মুখীন হল অসিহস্তে স্বয়ং রব রয় ম্যাকগ্রেগর। বয়স তার যুদ্ধের উদ্যমকে থামিয়ে দিতে পারে নি। ষাট বৎসর বয়সেও রব রয় ছিল ম্যাগগ্রেগর গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ অসিযোদ্ধা।

শুরু হল লড়াই। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ঢাল আর তলোয়ার নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করল। এক ঘণ্টার উপর লড়াই চলল—অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের বিরুদ্ধে যৌবনউদ্ধত শক্তির লড়াই। অবশেষে একসময়ে রব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার বলিষ্ঠ বাহুকে গ্রাস করল বয়সের ক্লান্তি, ঘূর্ণিত অসির চমক হয়ে পড়ল মন্থর। সুযোগ বুঝে আঘাত হানল স্টুয়ার্ট যোদ্ধা—বিদ্যুৎবেগে তার হাতের শাণিত

তরবারি প্রতিদ্বন্দ্বীর অসিধারী দক্ষিণ বাহুর হাড় পর্যন্ত কেটে বসে গেল। রক্তসিক্ত বিদীর্ণ হস্ত আর অসি ধারণ করতে পারল না, রব রয়ের শিথিল মুষ্টি থেকে খসে পড়ল তলোয়ার। অবিচলিত প্রস্তরমূর্তির মতো স্থির হয়ে রব অপেক্ষা করতে লাগল চরম আঘাতের জন্য। কিন্তু আঘাত পড়ল না। বৃদ্ধ রব রয়ের বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল স্টুয়ার্ট যোদ্ধা। নিজের হাতে কাপড় ছিঁড়ে সে প্রবীণ যোদ্ধার ক্ষতস্থান বেঁধে দিল।

ঐ যুদ্ধই রব রয়ের জীবনের শেষ যুদ্ধ। উল্লিখিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর মাত্র তিন বৎসর সে বেঁচেছিল। তারপর তার মৃত্যু হয়।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের বৃটিশ সেনাবাহিনীর একটি বিভাগে ক্যাপ্টেন বয়েড ও মেজর ক্যাম্বেল নামে দুই সেনাধ্যক্ষের মধ্যে হঠাৎ বাদানুবাদ শুরু হল সেনানিবাসের মধ্যে। মেজর ক্যাম্বেল অধীন সৈন্যদের উপর যে-আদেশ জারি করেছিলেন, সেই আদেশ ক্যাপ্টেন বয়েডের পছন্দ হয় নি এবং তার ফলে উত্তপ্ত বিতর্কের অবতারণা। বয়েডের মতে মেজর সাহেবের পক্ষে ঐ আদেশ জারি অনুচিত কার্য। মেজবের বক্তব্য, উচিত কাজই করেছেন তিনি। দুজনেই নিজস্ব ধারণায় অটল। তীব্রস্বরে বাদানুবাদ চলল কিছুক্ষণ, তারপর দেখা গেল ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে স্থানত্যাগ করছেন ক্যাম্বেল এবং তাঁকে অনুসরণ করছেন বয়েড। পরবর্তী ঘটনার সঠিক বিবরণ কেউ সংগ্রহ করতে পারে নি; তবে এটুকু জানা যায় যে, দুজনের মধ্যে পিস্তল নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটেছিল।

একটা ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে 'ডুয়েল' হয়েছিল, অকুস্থলে কোন মধ্যস্থ উপস্থিত ছিলেন না। আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ শুনে অকুস্থলে ছুটে এলেন কয়েকজন অফিসার। তাঁদের সামনে অতিশয় উদ্বিগ্নস্বরে ক্যাম্বেল তাঁর মরণাহত প্রতিদ্বন্দ্বীকে উদ্দেশ করে বললেন, "বয়েড, সাক্ষীদের সামনে স্বীকার কর যে, লড়াইটা ন্যায়সঙ্গতভাবেই হয়েছিল।"

স্খলিত স্বরে বয়েড যা বললেন, সেই বক্তব্য হল ক্যাম্বেলের পক্ষে মারাত্মক, "না, লড়াই ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল একথা বলা যায় না। তুমি আমাকে প্রস্তুত হওয়ার সময় দাও নি। তুমি খুব খারাপ লোক, ক্যাম্বেল।"

ঐ কথা বলার পরই বয়েডের মৃত্যু হয়।

ক্যাম্বেলের বিচার হল। বয়েডের মৃত্যুকালীন উক্তি ক্যাম্বেলকে ঠেলে দিল মৃত্যুর মুখে। বিচারে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন মেজর ক্যাম্বেল।

এইবার দ্বৈরথের পটভূমি চতুর্দশ শতক, স্থান ইংল্যাণ্ড। ১৩৯০ সালে এক ভোজসভায় স্কটল্যাণ্ডের নাইট স্যার ডেভিড লিণ্ডসে এবং ইংল্যাণ্ডের লর্ড জন ওয়েলস নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ক্রুদ্ধ বাদানুবাদ শুরু হয়। ইংরেজ ও স্কচদের মধ্যে কারা অধিকতর বীরত্ব ও সাহসের অধিকারী, এই ছিল তাঁদের তর্কের বিষয়।

'হাত থাকতে মুখ কেন?' এই নীতি অবলম্বন করলেন ইংরেজ জন ওয়েলস। প্রতিপক্ষকে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন।

'লণ্ডন ব্রিজ' নামক সেতুর উপর রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সামনে দুই যোদ্ধা দ্বৈরথরণে ব্যাপৃত হলেন অশ্বপৃষ্ঠে।

কিছুক্ষণ লড়াই চলার পর ইংল্যাণ্ডের লর্ড জন ওয়েলস প্রতিদ্বন্দ্বীর শূলের আঘাতে আহত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লেন মাটির উপর। স্কটল্যাণ্ডের নাইট তখন ঘোড়া থেকে নেমে পদব্রজে অগ্রসর হলেন ভূপতিত শত্রুর দিকে।

জনতা উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। এখনই প্রচণ্ড আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন লর্ড জন ওয়েলস। কিন্তু না, চরম আঘাত পড়ল না। স্কচ নাইট স্যার ডেভিড লিণ্ডসে শত্রুর শিরস্ত্রাণ খুলে শুশ্রূষা শুরু করলেন। অকুস্থলে চিকিৎসকের আগমন না হওয়া পর্যন্ত তিনি শত্রুর পরিচর্যা থেকে বিরত হন নি।

এই ঘটনার পরে ইংল্যাণ্ডের লর্ড জন ওয়েলস ও স্কচ নাইট স্যার ডেভিড লিণ্ডসের মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হয়। পরবর্তী জীবনে তাঁরা কখনও স্বচ্ছন্দে সাহস কিংবা বীরত্ব নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন নি।

আবার দ্বৈরথ। আবার আমেরিকা। তবে এবারের ঘটনার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্যের স্বাদ আছে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঞ্চলে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল, পৃথিবীর কোন স্থানে কোনদিন সেরকম দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা কেউ কখনও শুনেছে বলে মনে হয় না।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার 'লস এঞ্জেলস' নামক স্থানে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি ভোজসভা বসেছিল। ভোজসভার শেষে বাধল গণ্ডগোল। উইলিয়াম অসবোর্ণ নামে একটি লোক বলে বসল, আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে মহান ব্যক্তি হচ্ছেন তার বাবা এবং তার কথার সত্যতা সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে সে ঐ ব্যক্তিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে প্রস্তুত।

প্রতিবাদ এল। প্রতিবাদকারী ভদ্রলোকটির নাম কর্নেল ম্যাগরুডার। 'ডুয়েল'-এর নিয়ম অনুসারে যাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা হয়, সেই ব্যক্তিরই যুদ্ধের অস্ত্র ও স্থান নির্বাচনের অধিকার থাকে। কর্নেল ম্যাগরুডার বললেন, "আমি ডিলিঞ্জার পিস্তল নিয়ে লড়ব। লড়াই হবে এখনই, এই টেবিলের দু'পাশ থেকে।"

দুটি ছোট অথচ মারাত্মক পিস্তল তখনই এসে গেল। পিস্তল দুটিতে গুলি ভরে দেওয়া হল; টেবিলের দু'ধারে বসে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরকে লক্ষ্য করে উঁচিয়ে ধরল হাতের অস্ত্র। অসবোর্ণ তখন ভয়ে কাঁপছে, কর্নেল নির্বিকার শান্ত। দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়ম অনুসারে মধ্যস্থ নির্দেশ দিলে প্রতিদ্বন্দ্বীরা গুলি চালায়। কিন্তু কাপুরুষ অসবোর্ণ নির্দেশ আসার আগেই পিস্তলের ট্রিগার টিপে দিল।

ভীত বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে অসবোর্ণ নিরীক্ষণ করল, তার প্রতিদ্বন্দ্বী অবিচলিত ও অকম্পিত হস্তে তার দিকে পিস্তলের লক্ষ্য স্থির করছে—নিক্ষিপ্ত গুলি তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। দারুণ আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে অসবোর্ণ কর্নেলের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইল। কর্নেল পিস্তল না চালিয়ে চালালেন পা—প্রচণ্ড পদাঘাতে তিনি অসবোর্ণকে ছিটকে ফেলে দিলেন।

বেচারা অসবোর্ণ! সে জানত না যে, দুটি পিস্তলের মধ্যেই বুলেটের পরিবর্তে ভরে দেওয়া হয়েছিল বোতলের ছিপি।

কুস্তি এবং মুষ্টিযুদ্ধ বা বক্সিংকে যদিও খেলা বলেই ধরা হয়, আর কুস্তি ও মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগিতার আযোজনও হয়ে থাকে, তবে এই দুটি খেলা হাতাহাতি লড়াই-এর পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু ক্যারাটে খেলা নয়—এটা সত্যিই লড়াই, নিরস্ত্র যুদ্ধ। জাপানে কেউ ক্যারাটে নামক রণবিদ্যা আয়ত্ত করতে পাবলে, অর্থাৎ জাপানের কোন ক্যারাটে বিদ্যালয় থেকে কোন ছাত্রকে ক্যারাটে-বিশারদ বলে স্বীকৃতি দিলে জাপানী পুলিসেব কাছে উক্ত ছাত্রকে নাম 'রেজিস্ট্রি' করতে হয় এবং এই কথা বলে মুচলেকা দিতে হয় যে, উক্ত ক্যারাটে-যোদ্ধা প্রাণ বিপন্ন না হলে কখনও মারামারি করবে না।

তবে মুচলেকা দিলেও সব সময় কি কথা রাখা যায়? আর মুচলেকা তো জাপানী পুলিসের কাছে, যদি কোন ক্যারাটে-যোদ্ধা জাপানের বাইরে তাব বিদ্যাকে হাতে-নাতে প্রয়োগ করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা করবে কে?

দক্ষ ক্যাবাটে-বিশাবদ গুলি ভর্তি বাইফেলের মতোই ভয়াবহ। রাইফেলের 'সেফটি ক্যাচ' তুলে ট্রিগার টিপলেই অস্ত্রটি সগর্জনে মৃত্যু পবিবেশন করে। ক্যারাটের নীতিশিক্ষা ঐ 'সেফটি ক্যাচ'—ক্যারাটে-যোদ্ধা যদি কখনও নিজের উপর সংযম হারিয়ে তার নীতি ভুলে যায়, তবে রাইফেলের গুলিব মতোই নিদারুণ আঘাত এসে পড়ে বিপক্ষের উপর। সেই আঘাতের ফলে আহত ব্যক্তির সাংঘাতিক দৈহিক ক্ষতি হতে পারে। এমন কি মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। অস্ত্রধারী মানুষের চাইতেও ক্যাবাটে-বিশাবদ অধিকতর বিপজ্জনক ব্যক্তি, কাবণ অস্ত্র দেখে লোকে সাবধান হতে পারে কিন্তু

ক্যারাটেকে চোখে দেখা যায় না—ক্যারাটে-যোদ্ধা এই প্রাণঘাতী অদৃশ্য অস্ত্রকে বহন করে সর্বাঙ্গে, মুহূর্তের মধ্যে প্রয়োগকারীর মুষ্ট্যাঘাত, পদাঘাত বা আঙ্গুলের খোঁচায় নির্দয় মৃত্যুর পরোয়ানা নেমে আসতে পাবে কলহে নিযুক্ত বিপক্ষের উপর। ক্যারাটে নামক রণবিদ্যা যে আয়ত্ত কবেছে, সে কখনও নিজের উপর সংযম হারিয়ে ফেললে ঘটনার পরিণতি যে কতটা ভয়ানক হতে পারে নিম্নে পরিবেশিত কাহিনীটি তার প্রমাণ ঃ

আমেরিকার এক ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক জাপানের ইয়োকোহামা নামক স্থানে দু'বছরের জন্য কার্যে নিযুক্ত হন। একটি আমেরিকান ব্যবসায়ী সংস্থা জাপান সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি কবেছিল, ঐ সংস্থাব পক্ষ থেকে নিযোগ করা হয়েছিল উল্লিখিত ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোককে। ঐ আমেবিকান ভদ্রলোক অবশ্য আমাদের কাহিনীব নাযক নন, নায়কের স্থান অধিকার করেছে তাঁর ছেলে জো লার্কিন। ছোটবেলা থেকেই জো বেশ শক্তিশালী। কিছুদিন সে মুষ্টিযুদ্ধ অভ্যাস করেছিল। এমন কি মুষ্টিযুদ্ধকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার কথাও তার মনে হয়েছিল। পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধার উপযুক্ত শরীর ছিল তার—দৃঢ় পেশী, দ্রুত গতি আর দুরন্ত সাহস। দরকাব ছিল শুধু উপযুক্ত শিক্ষা আর নিয়মিত অভ্যাস।

জাপানে এসে জো মুষ্টিযুদ্ধের পরিবর্তে ক্যারাটের প্রতি আকৃষ্ট হল। কঠিন পরিশ্রমের ব্যাপার। হাতের মুঠি পাকিয়ে ঘুষি মারতে মারতে এবং তালুর পাশ দিয়ে কাটারির মার অভ্যাস করতে করতে দারুণ ব্যথায় হাত অসাড় হয়ে আসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমে আড়ষ্ট হয়ে যায় বাহুর পেশী, নগ্নপদে কঠিন বস্তুর উপর লাথি মারতে মারতে ভেঙ্গে যায় পায়ের আঙ্গুল, আর—

আর এই কষ্ট সহ্য করে টিকে থাকতে পারলেই অভ্যাসকারীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ!

দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের পর জো লার্কিন ক্যারাটে রণবিদ্যা আয়ত্ত করতে সমর্থ হল। আর তখনই ক্যারাটের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে তাকে সাবধান করে দেওয়া হল—প্রাণ বিপন্ন না হলে লড়াই করা চলবে না। অপমানিত হলেও অপমান সহ্য করতে হবে। ক্যারাটে বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাকে ক্যারাটে-যোদ্ধা বলে স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপানী পুলিসের খাতায় তাকে নাম লেখাতে হয়েছে—রাস্তায় বা কোন দোকানের মধ্যে মারামারি করলে ক্যারাটে-যোদ্ধা আইনত অপরাধী, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে সরকার থেকে।

—"অপমানিত হলেও সহ্য করতে হবে?"

—"হ্যাঁ, সেটাই নিয়ম। ক্যারাটে-যোদ্ধার মারামারি কবার উপায় নেই। শুধুমাত্র জীবন বিপন্ন হলেই সে লড়াই করতে পারে।"

জো লার্কিন তার আত্মজীবনীতে বলেছে, এত সব বিধি-নিষেধ আছে জানলে সে ক্যারাটে শিখত কিনা সন্দেহ।

তবে জোকে বেশিদিন জাপানে থাকতে হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার দুই সপ্তাহ আগেই নিজের দেশ আমেরিকায় ফিরে এসেছিল সে। তাঁর বয়স তখন উনিশ। সেই তরুণ বয়সেই জাপানী পুলিসের খাতায় 'ক্যারাটে-যোদ্ধা' বলে তার নাম উঠে গেছে।

দেশে এসে আমেরিকার সেনাবাহিনীতে নাম লেখাল জো। 'আর্মি ট্রেনিং' বা সামরিক শিক্ষা

বেশ কঠিন, কিন্তু ক্যারাটে শিক্ষার ভয়ঙ্কর পাঠশালায় পাঠ নেওয়ার পর সামরিক শিক্ষা জোর কাছে বাগান থেকে ফুল তোলার মতোই সহজ মনে হয়েছিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে সার্জেন্ট হল। তারপর তাকে পাঠানো হল সমুদ্র পার হয়ে অন্য দেশে।

এতদিন তার সাংঘাতিক বিদ্যাকে হাতে-নাতে প্রয়োগ করার সুযোগ পায় নি জো, এইবার 'ক্যাসাব্লাংকা' নামক ফরাসীদের আস্তানায় সে নিজের ক্ষমতা যাচাই করার সুযোগ পেল। অবশ্য এর আগে ঝগড়া বা মারামারির সম্ভাবনা কখনও হয় নি এমন নয়। প্ররোচনা এসেছে ভীষণভাবে। কিন্তু ইয়াকোহামার প্রফেসর সাতো বারবার সাবধান করে ভয় দেখিয়েছিলেন—খুনের দায়ে পড়ার অনেক ঝামেলা। সেই ঝামেলার ভয়েই অনেক সময় অপমান সহ্য করে সরে এসেছে জো, অপমানকারীকে আঘাত করার চেষ্টা করে নি কখনও। একবার মারামারি বাধলে মেপে মেপে ওজন বুঝে আঘাত করা সম্ভব নয়। ক্যারাটে মৃত্যুবাহী—দেহের দুর্বল স্থানে ক্যারাটের আঘাত মৃত্যুকে ডেকে আনতে পারে মুহূর্তের মধ্যে। এসব কথা খুব ভালোভাবেই জানত জো, তাই ঝগড়ার সূত্রপাত হলে সে সতর্ক হয়ে যেত। সে মিষ্টি কথায় ঝগড়া এড়িয়ে যেতে শিখেছিল; তবু যখন মাথায় রাগ চড়ে যাওয়ার উপক্রম হতো, তখন দুই হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখত প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে।

তবু মানুষ তো যন্ত্র নয়, সংযমের বাঁধন একদিন ছিঁড়ল। যাকে কেন্দ্র করে ব্যাপারটা ঘটল, সেই লোকটা জাহাজী শ্রমিক, আলজিরিয়ার মানুষ। মানুষটা প্রায়ে সাড়ে ছয় ফুট উঁচু, বিশাল বুক, চওড়া কাঁধ, মুখের ডান দিকে চোখের তলা থেকে চিবুক পর্যন্ত ছুরিকাঘাতের শুষ্ক ক্ষতচিহ্ন—এক নজর দেখলেই বোঝা যায় সে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অভ্যস্ত। আলজিরিয়ানটি পানাগারে মদ্যপান করতে এসেছিল। জো দেখল, সে বেশ মাতাল হয়ে পড়েছে। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে লোকটা গেলাসের পর গেলাস মদ গিলছিল, তখনও পর্যন্ত কোন গোলমাল করেনি, কিন্তু তার হাত অল্প কাঁপছিল নেশার ঝোঁকে।

দুর্ভাগ্যক্রমে জো দাঁড়িয়েছিল লোকটার খুব কাছেই। হঠাৎ আলজিরিয়ান শ্রমিকটি হাত বাড়িয়ে জোর হাতের গেলাস ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

"তুই একটা শুয়োর", গর্জন করে উঠল মাতাল আলজিরিয়ান, "তুই একটা দুর্গন্ধ শুয়োর। তোর গা থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছে।"

"ঠিক, ঠিক", একটু হেসে ঝগড়া এড়িয়ে যেতে চাইল জো, "তুমি বরং আর এক গেলাস মদ নাও।"

মুখে হাসলেও জোর মাথায় তখন আগুন জ্বলছে। ক্যারাটে না শিখলে সে নিশ্চয়ই লোকটার চোয়ালে ঘুষি বসিয়ে দিত। কিন্তু ক্যারাটের শিক্ষা তাকে প্রতিরোধ করল—না, এখনও তার প্রাণ বিপন্ন হয় নি, এখনও আঘাত হানার সময় আসে নি। কিন্তু বহুদেশের বহু লোক সেখানে জমায়েত হয়েছে, তাদের সামনে নিজেকে কাপুরুষ ভীরু প্রতিপন্ন করতে জো লার্কিনের খুবই খারাপ লাগছিল—তবু আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিল সে, দুই হাত তাড়াতাড়ি ঢুকিয়ে দিল প্যান্টের পকেটে!

হঠাৎ মাতালটা জো লার্কিনের মুখের উপর থুথু ছিটিয়ে দিল, তারপর বুনো জানোয়ারের

মতো গর্জে উঠে একটা মদের বোতল টেবিলে ঠুকে ভেঙ্গে ফেলল। পলকের মধ্যে বোতলের তলার দিকে আত্মপ্রকাশ করল ধারাল ছুরির মতো অনেকগুলো ভাঙ্গা কাচের টুকরো।

সেই ভাঙ্গা বোতলের গলার দিকটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধারাল কাচগুলো সজোরে জোর মুখের উপর বসিয়ে দেওয়াব চেষ্টা করল মাতাল, কিন্তু জো চটপট সবে যাওয়ায় মাতালের চেষ্টা সফল হল না।

লোকজন তখন চিৎকার করে মাতালের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, মেয়েরা আর্তনাদ করছে ভীতস্বরে।

দ্বিতীয় বার আঘাত হানল মাতাল। আবার সরে গেল জো। বোতলের ধারাল কাচগুলো জোর মুখের কয়েক ইঞ্চি দূরে শূন্যে ছোবল মারল।

এবার আর জোর হাত দুটো পকেটের ভিতর নেই, বেরিয়ে এসেছে। এখনও জো আশা করছে কেউ মাতালটাকে ধরে ফেলবে, পকেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা ভয়ংকর হাত দুটো বোধহয় ব্যবহার করার দরকার হবে না। কিন্তু ভীষণদর্শন মাতাল নিগ্রোটার সামনে কেউ এগোল না, সকলেই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে একটা রক্তাক্ত দৃশ্যের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

জো লার্কিনের সহকর্মী কয়েকটি সৈন্য অবশ্য সেখানে ছিল, তারা ভয় পায় নি, ব্যাপারটা উপভোগ করছিল। জোর মুখে তারা শুনেছে সে ক্যারাটে-যোদ্ধা, হঠাৎ খুনের দায়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে বলে সে মারামারির মধ্যে যেতে চায় না। অথচ তাদের সামনে জো কার্যকলাপে কোন প্রমাণ রাখে নি! তাই আজ তারা নিশ্চেষ্ট— শুধু মুখের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তারা দেখতে চায় 'হাতের কাজ'।

পানাগারের ভিতর বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল মাতাল আর জো। কয়েকবার ভাঙ্গা বোতল উচিয়ে আঘাত হানতে চেষ্টা করল মাতাল। প্রত্যেকবারই সরে গিয়ে লোকটার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল জো, ছুরির মতো ধারাল কাচগুলো একবারও জোর মুখ স্পর্শ করতে পারল না।

বারবার ব্যর্থ হয়ে লোকটা ক্ষেপে গেল। হঠাৎ সে বোতলটা ছুড়ে মারল জোর মুখ লক্ষ্য করে। এবারও জো সরে

গেল, কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারল না—বোতলটা তার মাথার উপর পড়ে ছিটকে গেল অন্যদিকে।

আঘাতের ফলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল জো...কয়েক মুহূর্তের স্তম্ভিত অনুভূতি....মাথা বেয়ে নামছে তপ্ত তরল একটা ধারা...রক্ত!

জো সামলে ওঠার আগেই মাতাল তাকে আক্রমণ করেছে। এবার তার হাতে ঝকঝক করছে ধারাল ছুরি।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে জোর মগজের মধ্যে কী যেন ঘটল...'সেফটি ক্যাচ'! ক্যারাটে শিক্ষার 'সেফটি ক্যাচ' এখন সরে গেছে, এখন সে আক্রান্ত, তার জীবন এখন বিপন্ন, লড়াই করার অধিকার এখন তার আছে।

উদগ্র ক্রোধ এইবার মুক্তি পেল, জোর কণ্ঠভেদ করে বেরিয়ে এল ভয়ংকর চিৎকার!

জোর বাঁ হাত কাটারির মতো পড়ল শত্রুর ছুরি ধরা পুরোবাহুর (forearm) উপর। অনভ্যাসের ফলে আঘাতের শক্তি কমে গেছে, তাই ছুরিটা মাতালের হাত থেকে খসে পড়ল না, কিন্তু হাতটা অবশ হয়ে গেল কয়েকক মুহূর্তের জন্য। সেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সামলে নিয়ে জো শত্রুর পরবর্তী আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

মাতাল জোর পেট লক্ষ্য করে ছুরি চালাল, জো একপাশে সরে গেল, তারপর ডান হাত বাড়িয়ে মাতালের ছুরি ধরা হাতের কব্জি চেপে ধরল। পরক্ষণেই তার বাঁ হাত কাটারির মতো মাতালের বাহুর পেশীতে আঘাত করে ছুরি ধরা হাতটাকে অসাড় করে দিল।

এইবার ক্যারাটের খেলা—মাতাল ব্যাপারটা কি হচ্ছে বুঝে ওঠার আগেই তার শত্রু চট করে একপাশে ঘুরে গিয়ে নিজের বাঁ কাঁধের উপর রাখল, সঙ্গে সঙ্গে পাঁজরের উপর নিদারুণ কনুই-এর গুঁতো—সেই আঘাত সামলে ওঠার আগেই মাতালের ছুরি সমেত হাতটা সবেগে শূন্যে উঠে প্রবল আকর্ষণে শত্রুর কাঁধের উপর পড়ল, তৎক্ষণাৎ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল কনুই-এর হাড়!

ক্যারাটের মার—পৃথিবী কোন ডাক্তারই সেই হাড়কে আর জোড়া লাগাতে পারবে না!

ছুরিটা অনেক আগেই পড়ে গেছে মেঝের উপর। বিস্ময়-বিস্ফারিত ভীত দৃষ্টিতে মাতাল দেখল, তার ডান হাতটা ভাঙ্গা অবস্থায় নড়বড় করে ঝুলছে!

তবু সে হার মানল না। বুনো জানোয়ারের মতো গর্জন করে সে শত্রুর পেট লক্ষ্য করে লাথি ছুড়ল। লাথি লাগল না, কিন্তু তার পায়ের গোড়ালি ধরা পড়ল শত্রুর মুঠের মধ্যে—পরক্ষণেই এক হ্যাঁচকা টান এবং মাতাল হল মেঝের উপর লম্বমান!

এইবার জোর ভারি জুতো সমেত লাথি এসে পড়ল মাতালের তলপেটে, সঙ্গে সঙ্গে লড়াই শেষ। লোকটা হাঁফাতে হাঁফাতে আর্তনাদ করতে লাগল। হঠাৎ এক ঝলক বমি বেরিয়ে এসে তার আর্তকণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিল।

শায়িত শত্রুর দিকে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিপাত করল জো। তার বুকের ভিতর জেগে উঠেছে রক্তলোভী দানবের হিংস্র উল্লাস—পলকে নীচু হয়ে মাতালের আহত হাতটা চেপে ধরে সে মোচড় দিল, একেবারে চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেল হাতটা। আবার একটা আর্ত চিৎকার। আবার এক ঝলক বমি। তারপরই অজ্ঞান হয়ে গেল লোকটা।

পানশালার মধ্যে অন্ততঃ বারো রকমের বিভিন্ন জাতির লোক ছিল। সবাই নির্বাক, স্তব্ধ। শেষকালে ধরাশায়ী শত্রুর উপর জোর অমানুষিক অত্যাচার তাদের বিস্ময় ও আতঙ্কে স্তব্ধ করে দিয়েছে। জোর সঙ্গীদের মুখেও কথা নেই, তাদের দৃষ্টি আতঙ্কে বিস্ফারিত—তারা যেন চোখের সামনে এক অপার্থিব বিভীষিকা দেখছে।

কেউ একটি কথা বলল না। জো এতক্ষণে নিজেকে বুঝতে পারছে। ক্যারাটে তার ভিতর এক রক্তলোভী হিংস্র দানবের জন্ম দিয়েছে, যে-দানব অপরকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়। ভাঙ্গা হাতটাকে মুচড়ে দিয়ে লোকটাকে যন্ত্রণা দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, তলপেটে লাথি না মেরেও সে লোকটাকে কাবু করতে পারত। অবরুদ্ধ হিংসা মুক্তি পেয়েই তার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেছে যথেচ্ছভাবে। হঠাৎ তীব্র বিবমিষা জোকে অস্থির করে তুলল, কোনরকমে প্রস্রাব-আগারে ঢুকে সে বমি করে ফেলল।

বেরিয়ে এসে জো দেখল, পানাগারের ভিতরে অবস্থা যেন কিছুটা স্বাভাবিক। ভিড়ের মধ্যে কেউ 'অ্যামবুলেন্স' ডেকে পাঠিয়েছে। ফরাসী সাইরেনের উৎকট ধ্বনি কানে এল। পুলিস আসছে। জো বিশেষ ভয় পেল না। প্রথমে ভাঙ্গা বোতল পরে ছুরি নিয়ে লোকটা যে তাকে আক্রমণ করেছিল, সেই দৃশ্য বহু লোক দেখেছে। সে যে মারামারি করতে চায়নি বরং এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে সেটাও প্রমাণ করা কঠিন হবে না—বহু মানুষের চোখের সামনে এসব ঘটনা ঘটেছে। না, পুলিসকে নিয়ে সে মাথা ঘামাচ্ছে না, মূর্ছিত লোকটার কথাই চিন্তা করছে সে। হঠাৎ পকেট থেকে অনেকগুলো ডলার বার করে সে অচেতন মানুষটার পকেটে গুঁজে দিল। আলজিরিয়ান নিগ্রোর ভাঙ্গা হাড় আর জোড়া লাগানো যাবে না, কিন্তু ঐ টাকায় অন্ততঃ ভালোভাবে চিকিৎসা করার সুযোগ সে পাবে।

কয়েকটা দিন কাটল। সেনানিবাসের সকলেই অকুস্থলে উপস্থিত সৈনিকদের মুখ থেকে ব্যাপারটা শুনেছে। হঠাৎ একদিন জো আবিষ্কার করল সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। কেউ তার সঙ্গে কথা কইতে চায় না। জো নানাভাবে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমাতে চেষ্টা করল। বৃথা চেষ্টা। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তারা তার সঙ্গে কথা বলে না। জমাট তাসের আড্ডায় সে উপস্থিত হলে আড্ডা ভেঙ্গে যায়। নানা ছুতোয় সকলে স্থান ত্যাগ করে। সিনেমা যাওয়ার আমন্ত্রণ এখন কেউ তাকে করে না। বন্ধুদের মধ্যে যারা তাকে ক্যারাটের কৌশল শেখাতে অনুরোধ ছেড়ে তোষামোদ পর্যন্ত করত, তারাও এখন তাকে এড়িয়ে চলতে চায়।

ফল হল সাংঘাতিক। জো আবার স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছিল। হয়তো সে তার মারাত্মক বিদ্যাকে দ্বিতীয় বার প্রয়োগ করত না। কিন্তু সবাই তাকে এড়িয়ে চলছে দেখে সে মনে মনে ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠল। তার প্রাণঘাতী আক্রোশকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সে সুযোগের অপেক্ষায় রইল।

সুযোগ এল কিছুদিনের মধ্যেই। ছয়টি সৈন্যের সঙ্গে একদিন জো বেরিয়েছিল টহল দিতে। জো স্বয়ং ছিল দলের নেতা। নিতান্ত অভাবিত ভাবেই হঠাৎ একটি জার্মান সেনা তাদের সামনে এসে পড়ল। সৈন্যটি তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ করল, সে নাকি পথ হারিয়েছে। আমেরিকান সৈন্যরা

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল—নির্দিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করার জন্য তারা টহল দিতে বেরিয়েছে, এখন বন্দীকে নিয়ে আস্তানায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

জার্মান সেনাটি যখন বুঝল তাকে গুলি করা হবে না, সে আশ্বস্ত হল। দেখা গেল সে ভাঙ্গা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। জো তাকে কিছু খাদ্য আর সিগারেট দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দেহটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল—হ্যাঁ, লম্বায়-চওড়ায় জার্মানটি প্রায় তারই মতো, আঁট-সাঁট শরীরটা দেখলে মনে হয় সে ব্যায়ামে অভ্যস্ত। জো বন্দীর সঙ্গে কথা বলছিল। তার সঙ্গীরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল। বন্দীকে নিয়ে যে-সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, জো যে তার সমাধান করতে চাইছে সেটা তারাও বুঝতে পারছিল। এই ভয়ংকর ক্যারাটে-যোদ্ধাটি যে কেমন করে এই সমস্যার সমাধান করবে সেটাও তারা আন্দাজ করতে পারছিল—তাই বন্দীর সঙ্গে কথা বলতে তারা বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে নি।

জো বন্দীকে প্রশ্ন করল, "তুমি কখনও বক্সিং লড়েছ?" জার্মান বন্দীর বলিষ্ঠ দেহ আর ভাঙ্গা নাকের গড়ন দেখেই জোর ঐ প্রশ্ন। অনুমান নির্ভুল, বন্দী জানাল ১৪ বছর বয়স থেকেই সে বক্সিং লড়ছে। তাছাড়া ফুটবল খেলার অভ্যাসও তার আছে।

"বাঃ! চমৎকার!" জো বলল, "শোনো, তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি করছি। আমরা হাতাহাতি লড়াই করব। যদি আমাকে হারাতে পারো তাহলে তোমায় মুক্তি দেওয়া হবে। ঠিক আছে?"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না," জার্মান বন্দী বলল। তার কণ্ঠস্বরে আতঙ্কের আভাস। সে বোধ হয় বুঝেছিল তার বিপদ আসন্ন।

"তুমি ঠিকই বুঝেছ" জো বলল, "নাও, তৈরি হও। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।"

জো জামা খুলে ফেলল। বন্দীও তার উদাহরণ অনুসরণ করল। জো দেখল বন্দীর বুক বেশ চওড়া, হাত-পায়ের কঠিন মাংসপেশী বন্দীর দৈহিক শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। জো খুশী হল। শক্তিশালী মানুষ না হলে লড়াই করে সুখ নেই।

জোর সঙ্গীরা নীরব। তারা জানত জো ক্যারাটে-যোদ্ধা, তার ভয়াবহ খ্যাতি তাদের কানেও এসেছে। এখন তারা স্তব্ধ হয়ে জোর কার্যকলাপ দেখার জন্য অপেক্ষা করছে।

লড়াই-এর শুরুতে জার্মান সৈন্যটি বিশেষ উৎসাহ দেখাল না। জো প্রতিরোধের ভঙ্গিতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায় নি, মুখ আর শরীর প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে উন্মুক্ত—বন্দী তবুও নিশ্চেষ্ট, তার আঘাত হানার উদ্যম নেই কিছুমাত্র।

জো এবার বন্দীকে উত্তেজিত করতে সচেষ্ট হল, সে সজোরে চড় মারল বন্দীর গালে, "আমি জানি নাজীরা ভীরু, কাপুরুষ। তোমাদের লড়াই করার সাহস নেই।" সঙ্গে সঙ্গে গালাগালি।

এবার কাজ হল। বন্দীর চোখে-মুখে ফুটল ক্রোধের আভাস। সে এগিয়ে এসে সজোরে ঘুষি ছুড়তে লাগল। একটা ঘুষিও অবশ্য জোকে স্পর্শ করতে পারল না। সুকৌশলে আঘাতগুলো এড়িয়ে গেল জো।

জো এবার কাজ শুরু করল; ডান হাতের বুড়ো আঙুল করতল চেপে রইল, আঙুলগুলো ছুরির মতো আড়ষ্ট, শক্ত—পরক্ষণেই সেই কঠিন আড়ষ্ট আঙুলগুলো দারুণ জোরে ছোবল মারল

প্রতিদ্বন্দ্বীর বুক আর পেটের মাঝখানে। দারুণ যাতনায় জার্মান বন্দীর শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

আবার শ্বাস টেনে নিজেকে প্রস্তুত করার আগেই জোর বাঁ হাতের বজ্রমুষ্টি হাতুড়ির মতো আছড়ে পড়ল বন্দীর ওষ্ঠের উপর। কয়েকটা দাঁত ভেঙে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ক্যারাটে-ঘুষি সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে ঐ আঘাতেই দাঁতের পরিবর্তে মুখের হাড় ভাঙত, তারপর আর এক ঘুষিতে ভাঙা হাড়গুলো পৌঁছে যেত মগজের মধ্যে। ইচ্ছে করেই ভুল করেছিল জো, ক্যারাটের মরণ-মার মারতে চায় নি সে। লড়াইটাকে দীর্ঘস্থায়ী করে বন্দীকে যন্ত্রণা দিয়ে ধীরে ধীরে হত্যা করতে চাইছিল সে।

নাজী বন্দীটি ভীষণভাবে আহত হলেও তখন পর্যন্ত মারামারি করার ক্ষমতা হারায় নি। সে বুঝেছিল শত্রুকে পরাস্ত করতে না পারলে তার মৃত্যু নিশ্চিত, অতএব হিংস্র আক্রোশে সে এবার জোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জো শান্তভাবে অপেক্ষা করছিল—তার ডান হাত তলার দিকে ঝুঁকে পড়েছে আর আঙুলগুলো খুলে ছড়িয়ে রয়েছে উপযুক্ত জায়গায় ছোবল মারার জন্য।

ক্যারাটে শিক্ষায় ঐ ভঙ্গিকে বলে 'নাকিতে'—অতি ভয়ংকর ঐ খোলা আঙুলের নিষ্ঠুর আঘাত।

জো আঘাত হানল। বন্দীর নাকের দু'পাশ দিয়ে সটান দুই চোখে খোঁচা মারল আঙুলগুলো। তৎক্ষণাৎ বন্দীর দুই চক্ষু হল রক্তাক্ত, অন্ধ।

ঐভাবে আঘাত হানার কৌশল শিখলেও হাতে-নাতে কখনও সেই শিক্ষাকে প্রয়োগ করার সুযোগ পায় নি জো। আঙুলগুলোকে লোহার মতো শক্ত করে নির্ধারিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে সে ক্যারাটে শিক্ষার বিদ্যালয়ে, কিন্তু আঘাত হানতে পারে নি কারণ, অংশীদার সহকর্মীর বিপদ ঘটতে পারে। এতদিন পরে ঐ ভয়ংকর কৌশলকে বাস্তবে রূপায়িত করবার সুযোগ পেল জো।

বন্দীর অবস্থা তখন শোচনীয়। জোর বন্ধুরাও তার নিষ্ঠুরতা দেখে চমকে গেছে। ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে আতঙ্ক-বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তারা তাকিয়ে আছে জোর দিকে। যাতনাকাতর অন্ধ বন্দী তখন অসহায়ভাবে আর্তনাদ করছে অস্ফুট কণ্ঠে—হিংস্র পশুর মতো জো তার উপর লাফিয়ে পড়ল। প্রথমে বন্দীর বাঁ হাত, তারপর ডান হাত ভাঙল জো। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল জোর সহকর্মী সৈনিক ছয়জন। জো বুঝল, বন্দীর উপর আর অত্যাচার করলে সৈন্যরাই ক্ষেপে যেতে পারে। ছয়টি রাইফেলধারী মানুষকে উত্তেজিত করা ক্যারাটে-যোদ্ধার পক্ষেও বিপজ্জনক, অতএব জো হাতের কাজ শেষ করতে সচেষ্ট হল। মৃত্যুবাহী ক্যারাটের এক দারুণ আঘাতে বন্দীর নাকের হাড় ভেঙে মগজে প্রবেশ করল, হতভাগ্যের মৃত্যু হল তৎক্ষণাৎ।

ক্যারাটের নিয়ম লঙ্ঘন করেছিল জো। আত্মরক্ষার জন্যই ঐ অদ্ভুত প্রাচ্যদেশীয় রণকৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু জো তার বিদ্যাকে প্রয়োগ করেছিল অন্তরে নিহিত হিংস্র উল্লাস চরিতার্থ করার জন্য। এবং সেইজন্য সে অনুতপ্ত হয় নি কিছুমাত্র।

যথাসময়ে সদরে রিপোর্ট গেল বন্দী নাকি পলায়নের চেষ্টা করেছিল, তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে। জোর সঙ্গীরা চুপ করে রইল। জার্মানদের চাইতেও সার্জেন্ট জো লার্কিন সম্পর্কে তাদের ভীতি ছিল অনেক বেশি।

কিছুদিন পরে আবার ক্যারাটেকে কাজে লাগানোর সুযোগ পেল জো লার্কিন। একটি জার্মান ক্যাপ্টেনকে মার্কিন সেনানিবাসে বন্দী করে আনা হয়েছিল। লোকটা ঝটিকা-বাহিনীর ক্যাপ্টেন, হিটলারের অন্ধ ভক্ত, গোঁড়া নাজী—শত্রুপক্ষের প্রত্যেকটি মানুষ তার কাছে অতিশয় ঘৃণ্য।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে মার্কিন বাহিনীর ক্যাপ্টেন জোন্‌স্ ঐ নাজী বন্দীকে কয়েকটা প্রশ্ন করে। জোন্‌স্ আদর্শ ভদ্রলোক, প্রশ্ন করার আগে বন্দীর হাতে সে এক গেলাস মদ তুলে দিয়েছিল। হতভাগা নাজী এমন ভালো ব্যবহারের মূল্য দিল না—গেলাসের মদ জোন্‌সের মুখে ছিটিয়ে দিয়ে সে সজোরে পদাঘাত করল তার পেটে!

আর কিছু করার আগেই প্রহরীরা তাকে ধরে ফেলল। ততক্ষণে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে—জোন্‌স্ আর্তনাদ করছে রুদ্ধস্বরে, তার পেটের নাড়ী ছিঁড়ে গেছে বুটসমেত লাথির আঘাতে।

হাসপাতালে যাওয়ার আগে জো লার্কিনকে ডেকে পাঠাল ক্যাপ্টেন জোন্‌স্। যদিও জোন্‌স্ কখনও জো লার্কিনের সঙ্গে ক্যারাটে সম্পর্কে কোন প্রসঙ্গ তোলে নি, তবু জো সম্পর্কে কিছু গুজব তার কানে এসেছিল নিশ্চয়ই।

জো আসতেই ক্যাপ্টেন জোন্‌স্ বলল, "বন্দীকে এইবার তুমি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করবে।" তারপর জোকে কাছে আসতে ইশারা করে জোন্‌স্ মৃদুস্বরে বলল, "ঐ শয়তানটাকে নিয়ে তুমি যা খুশী করতে পারো। পরিণামের কথা ভেবে ভয় পেও না। আমি তোমাদের ক্যাপ্টেন, আমি তোমাকে সব সময়ই সমর্থন করব।"

বাঃ! চমৎকার! জো তো এইরকমই চাইছিল। তার অন্তরের অন্তস্থলে এক ঘুমন্ত দানব জেগে উঠল হিংস্র উল্লাসে।

গেস্টাপো নামে কুখ্যাত জার্মান গুপ্ত পুলিস কাউকে গোপনে খুন করতে হলে মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে তাকে নিয়ে আসে—ঠিক সেইভাবেই মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে মার্কিন প্রহরীরা নাজী ক্যাপ্টেনকে একটা ফাঁকা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বন্দী জার্মানকে তার প্যান্ট পরার সময়ও দেওয়া হয় নি, তার পরনে ছিল শুধু ছোট হাফ প্যান্ট। ঐ অবস্থায়ই তাকে নগ্নপদে হাঁটিয়ে আনা হয়েছে।

ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছিল জো লার্কিন। তার পোশাকে 'স্ট্রাইপ' চিহ্নগুলোর দিকে তাকাল বন্দী, তারপর শুদ্ধ ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, "এমন অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ কি?"

"হের ক্যাপিটান", জো তার শার্ট আর প্যান্ট খুলতে খুলতে বলল, "তোমার ভারি বদ-অভ্যাস, লোকজনকে তুমি লাথি মারো। এটা খুবই অন্যায় আর অভদ্র ব্যবহার। তোমাকে আমি আজ ভদ্রতা শিখিয়ে দেব।"

হের ক্যাপিটান সঙ্গে সঙ্গে জোর কথার আসল মানেটা বুঝতে পারল, ব্যাপারটা তার ভারি মজার মনে হল।

হো-হো শব্দে হেসে সে বলল, "তুমি?"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, লোকটা হাতাহাতি মারামারিতে বেশ দক্ষ; নিজের দৈহিক শক্তি সম্পর্কে তার ধারণাও যে খুবই উঁচু সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জো প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করল—প্রায় ছয় ফুট দু' ইঞ্চির মতো লম্বা, চওড়া বলিষ্ঠ কাঁধ, কোমরের দিকটা চাপা, হাতে-পায়ে কঠিন মাংসপেশীর স্ফীত বিস্তারের কোথাও এতটুকু মেদের চিহ্ন নেই—হ্যাঁ, লোকটা গর্ব করার মতো দেহের অধিকারী বটে। বন্দীর গায়ের রং রোদে পোড়া, নিশ্চয়ই ফাঁকা মাঠে ব্যায়াম করার অভ্যাস আছে। জো ভাবল হয়তো কিছু কিছু জুডোর কায়দা লোকটা রপ্ত করেছে।

ততক্ষণে পোশাকের আবরণ থেকে মুক্ত হয়েছে জো। তার পরনে জার্মান বন্দীর মতোই একটা ছোট 'হাফ প্যান্ট' এমন কি পায়ের ভারি বুট দুটো খুলে ফেলা হয়েছে। জুতো পায়ে লাথি মারার সুযোগ নিতে চায় না জো, তার একমাত্র ভরসা মৃত্যুবাহী ক্যারাটে।

"ঠিক আছে, মূর্খ আমেরিকান শুয়োর," নাজী গর্জন করে উঠল, "আমি ভদ্রতা শেখার জন্য প্রস্তুত।"

লোকটার চোখে-মুখে একটা হিংস্র দীপ্তি জ্বলে উঠল, কিন্তু সে এগিয়ে এল না, প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। জো একটু অবাক হল, লোকটার মতলব সে বুঝতে পারল না।

আচম্বিতে বিস্ময়ের চমক! ক্যারাটে! এই লোকটাও ক্যারাটে-যোদ্ধা! যে-ভাবে ডান পায়ের আঙুলগুলো গুটিয়ে নিয়ে সে লাথি চালাল তাতে প্রমাণ হয়ে গেল ক্যারাটের মরণ খেলায় সেও এক খেলোয়াড়।

চিবুকের উপর প্রচণ্ড পদাঘাতে ছিটকে পড়ল জো লার্কিন!

আর একটু হলেই ঘাড় ভাঙ্গত, কোনরকমে আত্মরক্ষা করে জো উঠে দাঁড়াল। ভালোভাবে টাল সামলে দাঁড়ানোর আগেই সে দেখতে পেল জার্মান বন্দী তাকে আক্রমণ করতে আসছে। চকিতে পিছন ফিরে পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত হানল জো। ঠিক জায়গায় সেই আঘাত লাগলে লড়াই-এর মোড় তখনই ঘুরে যেত, তবে জোর লাথিটা একেবারে ব্যর্থ হল না—নাজীর দম বেরিয়ে গেল, সে থমকে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্য।

লোকটা সত্যিই কঠিন ধাতুতে গড়া, আর তেমনি চটপটে। জো ব্যাপারটা কি হচ্ছে বুঝে ওঠার আগেই নাজী তাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলল যে, জো দস্তুরমতো যন্ত্রণা বোধ

কবল। অবশ্য জো মুহূর্তের মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং তলপেট লক্ষ্য করে প্রাণঘাতী লাথিটা এড়িয়ে গিয়েছিল। ব্যর্থ হয়ে বন্দী আবার জোর চিবুক লক্ষ্য করে লাথি হাঁকাল আর একটুর জন্য ফসকে গেল। জো ততক্ষণে বুঝে নিয়েছে, লোকটা ক্যারাটে জানে এবং যথেষ্ট ক্ষিপ্র, তবে সে পাকা খেলোয়াড় নয়।

সেই মুহূর্তে নাজী যেভাবে অবস্থান করছিল, তাতে জোর পক্ষে তার চিবুকে কনুই দিয়ে আঘাত কবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। বলাই বাহুল্য, জো সেই সুযোগ নিতে একটুও দেরি করে নি। নাজী বন্দী চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে জো ক্যারাটের বিশেষ পদ্ধতিতে পদাঘাত করল শত্রুর মুখে। জার্মান সৈন্যের নাক ভেঙ্গে গেল তৎক্ষণাৎ!

আহত নাজী সেনা দারুণ আক্রোশে লাফিয়ে উঠল, তারপর ধেয়ে এল জোকে আক্রমণ করতে। সে কিছু করার আগেই তার কণ্ঠনালীতে হাতের তালু দিয়ে কাটারির মতো আঘাত হানল জো। যন্ত্রণায় জার্মানটির মুখ নীল হয়ে গেল।

লড়াই-এর পরবর্তী বিবরণ এমন নিষ্ঠুর যে, সেই বর্ণনা পাঠকের মনকে পীড়িত করবে। সংক্ষেপে বলছি, সৈন্যটিকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে অবশেষে তাকে হত্যা করেছিল জো। সকালের আলোতে জার্মান সৈন্যটির মৃতদেহের অবস্থা দেখে জো নিজেও শিউরে উঠেছিল।

লড়াই-এর উন্মাদনা তখন কেটে গেছে, হত্যার নির্দয় লালসা তৃপ্ত হওয়ায় জো লার্কিনের বুকের মধ্যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে হত্যারক্ত দানব—অনুতপ্ত জো ক্যাপটেন জোন্‌সের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলল। কী অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে লোকটাকে সে হত্যা করেছে, তার বিশদ বিবরণ দিয়েছিল জো। সেই বিবরণ (পাঠকদের কাছে আমি যা বর্ণনা করি নি) শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ক্যাপটেন জোন্‌স্।

পরবর্তী কালে সেনাবিভাগের কাজে ইস্তফা দিয়ে নাগরিকদের জীবন গ্রহণ করল জো লার্কিন। এমন একটা অফিসে সে কাজ নিয়েছিল যেখানে কারও সঙ্গে মারামারি হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত।

জো লার্কিনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এখানেই শেষ। কৌতূহলী পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে, 'ক্যারাটের অভিশাপ থেকে জো কি আজ মুক্ত?' জো নিজেও এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ নয়। তবে পরিশিষ্ট হিসাবে তার নিজস্ব বক্তব্য তার জবানিতেই পরিবেশন করছি ঃ

"পাঠক! একটা কথা বলে আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। আমার প্রকৃত নাম জো লার্কিন নয়। আপনি যদি শক্তিশালী হন আর গায়ের জোর দেখাতে গুণ্ডামি করতে ভালবাসেন, আর সেইজন্যই যদি কোন রাত্রে কোন রেস্তঁরা বা পানাগারের মধ্যে খুব শান্তশিষ্ট একটি লোককে আপনার যাবতীয় অসভ্যতা সহ্য করে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে অত্যন্ত গোবেচারার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন, তবে—

তবে বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। কারণ আমার দৈহিক ক্ষমতা এখনও অটুট, আর একবার মারামারি বাধলে আমি শেষ না দেখে থাকতে পারি না।"

বহুদিন আগেকার কথা। বৃটিশশাসিত দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তালাইনভু নামে গ্রামটির নিকটবর্তী অরণ্যে কয়েকটি গ্রামবাসীর অকারণ নিষ্ঠুর আচরণের ফলে সমগ্র বনাঞ্চলে ভয়াবহ সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়েছিল এবং স্বজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রাণ হারিয়েছিল কয়েকটি নিরপরাধ মানুষ—

সেই অদ্ভুত এবং ভয়ংকর ঘটনার বিবরণ এখানে পরিবেশিত হল ঃ

উক্ত তালাইনভু গ্রামের ছয়-সাতজন লোক কাবেরী নদীর তীরে বাঁশবন থেকে বাঁশ কাটতে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা বাঁশঝাড়ের নিচে তারা তিনটি প্যান্থারের বাচ্চা দেখতে পায়। বাচ্চাগুলো তাদের কোন ক্ষতি করে নি, সেখান থেকে সরে এলেই আর কোন ঝামেলা হতো না—কিন্তু লোকগুলোর নিতান্ত দুর্মতি, তাদের মধ্যে একজন হাতের ধারাল কাটারি দিয়ে একটা বাচ্চার গায়ে কোপ বসিয়ে দিল। বাচ্চাটা প্রায় দুখানা হয়ে রক্তাক্ত শরীরে কয়েকহাত দূরে ছিটকে পড়ল। হত্যাকারীর দৃষ্টান্ত দেখে তার সঙ্গীরা মহা উৎসাহে অন্য বাচ্চা দুটিকে আক্রমণ করল। কাটারির আঘাতে আঘাতে দুটি শ্বাপদ শিশুই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

আচম্বিতে বনের মধ্যে জাগল ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ধ্বনি—পরক্ষণেই হলুদের উপর কালো কালো ছোপ বসানো একটা অতিকায় বিড়ালের মতো জানোয়ার ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকগুলোর মধ্যে—

মা-প্যান্থার!

মানুষ সম্পর্কে বন্য পশুর একটা স্বাভাবিক ভীতি আছে। তাই সকলের অলক্ষ্যে একটু দূরে দাঁড়িয়ে মা-প্যান্থার লোকগুলোকে লক্ষ্য করছিল, কাছে আসতে সাহস পায় নি। কিন্তু চোখের উপর তার বাচ্চাদের হত্যাকাণ্ড দেখে দারুণ ক্রোধে তার মন থেকে ভয়ের অনুভূতি লুপ্ত হয়ে গেল, সে ঝাঁপিয়ে পড়ল হন্তারকদের উপর।

প্রথম ব্যক্তি ব্যাপারটা কী হল বুঝতেই পারল না, কারণ মা-প্যান্থারের থাবার আঘাতে তার দুটো চোখই অন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে! লোকটি ছিটকে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে তার ধরাশায়ী দেহ টপকে একলাফে আরেকটি লোকের বুকের উপর কামড় বসাল ক্ষিপ্তা জননী! প্রথম ব্যক্তির মতো দ্বিতীয় ব্যক্তিও সশব্দে ধরাশায়ী হয়ে আর্তনাদ করতে লাগল।

আহত লোক দুটির সঙ্গীরা বাচ্চা তিনটির উপর কাটারির ধার পরিখ করতে ইতস্ততঃ করে নি, কিন্তু অস্ত্র হাতে মা-প্যান্থারের নখদন্তের সম্মুখীন হওয়ার সাহস তাদের ছিল না—দারুণ আতঙ্কে আর্তনাদ করতে করতে তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে পালাতে লাগল তীববেগে।

মা-প্যান্থার পলাতকদের অনুসরণ করল না, আহত অবস্থায় যে দুটি লোক মাটিতে পড়ে ছটফট করছিল, তাদের উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নখে দাঁতে তাদের ছিঁড়ে ফেলল টুকরো টুকরো করে।

তারপর বাচ্চা তিনটির মধ্যে যে-জন্তুটার দেহে কম ক্ষত ছিল সেটাকে মুখে তুলে নিয়ে গভীর বনের ভিতর অদৃশ্য হল।

বাঁশ কাটতে যারা গিয়েছিল, তারা গ্রামে গিয়ে বলল একটা প্রকাণ্ড প্যান্থার সম্পূর্ণ বিনাকারণে তাদের আক্রমণ করে দুটি মানুষকে হত্যা করেছে। তারা যে বাচ্চাগুলোকে খুন করে মা-প্যান্থারকে উত্তেজিত করেছিল, একথা তারা বেমালুম চেপে গেল। পরে অবশ্য আসল ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছিল।

কিছুদিন খুব গোলমাল হল। যেখানে ঘটনাটা ঘটেছিল, সেই জায়গাটা এড়িয়ে চলল স্থানীয় মানুষ। নিতান্তই ঐ জায়গা দিয়ে যাতায়াত করার দরকার হলে সেখানকার মানুষ দলে ভারি হয়ে অস্ত্র নিয়ে পথ চলত।

কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল। মা-প্যান্থারকে কেউ আর দেখতে পায় নি। লোকে তার কথা ভুলে গেল। কিন্তু শ্বাপদ জননী তার শাবকদের অপমৃত্যুর কথা ভোলে নি, সে তখন বিদ্বেষ পোষণ করছে সমগ্র মনুষ্য জাতির উপর। কিছুদিন পরেই আবার প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পেল সে।

পূর্বে উল্লিখিত গ্রামটির নিকটবর্তী অরণ্যে এক কুখ্যাত চোর বনরক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে বন থেকে চন্দন কাঠ চুরি করত। অনেক চেষ্টা করেও বনবিভাগের লোকজন এবং পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি।

এই চোরটি তার ছেলেকে নিয়ে এক চাঁদনি রাতে জঙ্গলে প্রবেশ করল। কিছু চন্দন কাঠ কেটে নিয়ে ডিঙ্গিতে তুলে নদীর উত্তরদিকের তীরে উঠতে পারলে আর মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ তাদের গ্রেপ্তার করতে পারবে না—নদীর ঐ দিকটা ছিল মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত এবং সেই উদ্দেশ্যেই তারা প্রবেশ করেছিল বনের মধ্যে।

দিনের বেলা এসে একসময় তারা পছন্দমতো গাছগুলো দেখে গিয়েছিল, এখন নির্ধারিত স্থানে এসে তারা কুড়াল দিয়ে গাছ কাটতে শুরু করল। শাবকহারা মা-প্যান্থারি ঐ শব্দে আকৃষ্ট হয়েছিল সন্দেহ নেই। নিঃশব্দে সে হানা দিল। নরমাংসের লোভ তার ছিল না, নরহত্যাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য।

বাপ বুঝতেই পারে নি ব্যাপারটা কি ঘটল, একবার আর্তনাদ করার সময়ও সে পায় নি। আচম্বিতে পিঠের উপর একটা গুরুভার দেহের সংঘাতে সে হল ভূমিপৃষ্ঠে লম্বমান, পরক্ষণেই কণ্ঠনালীতে তীক্ষ্ণ দন্তের সাংঘাতিক নিষ্পেষণ। আঠারো বছরের ছেলে তার বাপকে বাঁচানোর চাইতে নিজের প্রাণ বাঁচাতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ল, হাতের কুড়াল ফেলে সে পলায়ন করল দ্রুতবেগে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হতভাগ্য চোর প্রাণত্যাগ করল প্যান্থারের কবলে। ছেলেটি অবশ্য শ্বাপদকে ফাঁকি দিতে পারল, তীরবেগে ছুটে গিয়ে সে নদীর ধারে রক্ষিত ডিঙ্গির উপর লাফিয়ে উঠল এবং প্রাণপণে দাঁড় বেয়ে নদী পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করল তার কুঁড়ে ঘরে। চোরের বৌ স্বামীর ভয়াবহ মৃত্যু-সংবাদ পেল ছেলের মুখ থেকে।

গ্রামবাসীরা অনেক আগেই শয্যাগ্রহণ করেছিল। মা আর ছেলের আর্তক্রন্দন শুনে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আলো জ্বালিয়ে তারা চোরের কুটিরে এল, তারপর তার ছেলের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনল। কিন্তু সেই রাতে কেউ কিছু করতে রাজী হল না। সকলেই জানত বাপ-ছেলে দুজনেই চোর—চোরের মৃতদেহ উদ্ধার করার জন্য রাতের অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের সম্মুখীন হওয়ার ইচ্ছা তাদের ছিল না।

পরের দিন বেশ বেলা হলে গ্রামবাসীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছেলেটির সঙ্গে রওনা হল এবং অকুস্থলে গিয়ে চোরের মৃতদেহ দেখতে পেল। লোকটির গলা থেকে পেট পর্যন্ত চিরে ফেলা হয়েছে, সমস্ত শরীর নখদন্তে ছিন্নভিন্ন, জায়গাটা রক্তে ভাসছে। কিন্তু প্যান্থার মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করে নি, হত্যাকাণ্ড সমাধা করে সে চলে গেছে।

আবার কয়েকদিন খুব সোরগোল চলল। লোকজন দল বেঁধে অস্ত্র নিয়ে পথ চলতে শুরু করল। কিন্তু বেশ কিছুদিনের মধ্যেও কোন হত্যাকাণ্ড যখন অনুষ্ঠিত হল না, তখন স্থানীয় মানুষ আবার স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা শুরু করল। ধীরে ধীরে প্যান্থারের কথা লোকে ভুলে গেল।

কয়েকটা সপ্তাহ কাটল। আবার এল শুক্লপক্ষ। জ্যোৎস্না রাতেই জঙ্গলের মধ্যে দুর্বৃত্তরা যাবতীয় দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ঐ সময়ে যেখানে হরিণরা নুন চাটতে অথবা জলপান করতে আসে, সেই

সব জায়গায় ওৎ পেতে বসে চোরাই শিকারীর দল (poachers) এবং কাঠ চোরের দল। কাঠ চোর চাঁদনি রাতে চন্দন, মাথি, গাল প্রভৃতি কেটে নদীপথে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অথবা গরুর গাড়িতে বোঝাই করে চোরাই মাল নিয়ে চম্পট দেয়।

এছাড়া আছে আর এক ধরনের চোর। তারা চুরি করে মাছ। এরা বঁড়শী বা জাল দিয়ে মাছ ধরে না। ঘরে তৈরি হাতবোমা জলে ফাটিয়ে মাছ ধরে। বিস্ফোরণের জলে ছোটবড় অসংখ্য মাছ মরে অথবা অজ্ঞান হয়ে জলের উপর ভেসে ওঠে। বাঁশের ডগায় বসানো জালের সাহায্যে বড় বড় মাছগুলো ধরে চোরের দল নৌকা বোঝাই করে। ছোট ছোট মরা মাছগুলো ভেসে যায়, পরে বড় মাছ আর কুমিরের খাদ্যে পরিণত হয়।

এই মাছ চুরির জন্য দুটি ডিঙ্গি নৌকা ব্যবহার করা হয়। একটি ডিঙ্গি থেকে বোমা ছোড়া হয়, আর একটি শুধু মাছ বোঝাই করার জন্য থাকে। মাছের ভারে ডিঙ্গি যতক্ষণ ডুবে যাওয়ার উপক্রম না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত চোররা মাছ ধরে যায়। জোয়ারের জলে মাইল পাঁচেক ডিঙ্গি ভাসিয়ে একসময়ে তারা ডিঙ্গি থামায়, তারপর মাছগুলোকে থলিতে ভরে রাখে। প্রত্যেক চোর একটা করে থলি বহন করে। ডিঙ্গি দুটিকে উল্টো করে ফেলে এক-একটা ডিঙ্গি দুজন করে মানুষ মাথায় তুলে হাঁটতে থাকে সেইদিকে, যেখান থেকে তারা প্রথম ডিঙ্গি ভাসিয়েছিল।

নদীতে জোয়ারের জল ঠেলে ঐ গোলাকার চামড়ায় ঢাকা ডিঙ্গি নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই এই পরিশ্রম। হাল্কা দাঁড়গুলো অবশ্য সমস্যা নয়। হাতে হাতে সেগুলো সবাই নিয়ে যায়। অমাপক্ষ এলে চোররা বিশ্রাম নেয়। আবার শুক্লপক্ষের আবির্ভাবে তাদের কাজকর্ম শুরু।

সেই রাতটাও ছিল শুক্লপক্ষের চাঁদনি রাত। একদল চোর চুরি করতে বেরিয়েছিল। ক্রমাগত বোমা মেরে মাছ তুলে তারা ডিঙ্গি বোঝাই করছিল। মাছ বোঝাই করার ডিঙ্গিতে ছিল মাত্র একটি লোক। কারণ, লোক কম হলে সংখ্যায় বেশি মাছ রাখা যায়। প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত মাছ ধরার পর যে ডিঙ্গি থেকে বোমা ছোড়া হচ্ছিল, সেই ডিঙ্গির লোকরা হাঁক দিয়ে মাছ-বোঝাই ডিঙ্গির মালিককে বলল, "অনেক হয়েছে, এবার ডাঙ্গায় ভেড়াও। কিছু খাওয়া দরকার।"

মাছ-বোঝাই ডিঙ্গির নিঃসঙ্গ লোকটি খুশি হল, সে সতর্কভাবে খরস্রোতা নদী বেয়ে ধীরে ধীরে ডিঙ্গিটাকে পাড়ে নিয়ে এল। ডিঙ্গির তলায় বাঁশের সঙ্গে যে-দড়ি বাঁধা থাকে, সেইটা নিয়ে লোকটা একলাফে পাড়ে উঠল। একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়িটাকে বেঁধে ডিঙ্গিটাকে সে দাঁড় করাতে চেয়েছিল। কিন্তু তার সেই উদ্দেশ্য সফল হল না। দুই নম্বর ডিঙ্গি থেকে তার বন্ধুরা দেখল একটা দীর্ঘ ধূসর বস্তু নদীর তীরবর্তী ঝোপ থেকে লাফিয়ে পড়ল। তাদের কানে এল একটা চাপা গর্জন, পরক্ষণেই তারা দেখল তাদের সঙ্গীটি মাটিতে পড়ে যাচ্ছে এবং তার দেহের উপর রয়েছে সেই ধূসর বস্তু!

একটা কান-ফাটানো আর্ত চিৎকার—সঙ্গে সঙ্গে চোরের দল দেখল মাছভর্তি ডিঙ্গিটা খরস্রোতা নদীর জলে ছুটে চলেছে এবং তাদের সঙ্গীর হাত থেকে খসে পড়ে মোটা দড়িটাও ছুটছে ডিঙ্গির সঙ্গে!

বোমা ছোড়ার ভূমিকায় যে ডিঙ্গিটা ছিল, সেই ডিঙ্গির মাঝি প্রাণপণে দাঁড় চালিয়ে মাছভর্তি

ভেসে-যাওয়া ডিঙ্গিটাকে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু তার ডিঙ্গিতে অনেক লোক ছিল বলে সেটা ছিল বেজায় ভারি, তাই মাঝির চেষ্টা সফল হল না। ভেসে-যাওয়া ডিঙ্গিটা মাঝ নদীতে ছিটকে এসে কয়েকটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এত কষ্টে ধরা মাছগুলো অদৃশ্য হল নদীগর্ভে। নিতান্ত দুঃখে সঙ্গে সেই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখল চোরের দল, তারপর তারা তীরের দিকে তাদের ডিঙ্গিটাকে ফেরাল। যে হাঁদা লোকটা হাতের দড়ি ধরে রাখতে পারে না, তাকে এবার আচ্ছা করে ঠ্যাঙ্গানি দিতে হবে এই হল তাদের মনোগত বাসনা। মাছ তো গেলই, ডিঙ্গিটাও গেল—ঐ ধরনের একটা ডিঙ্গি জোগাড় করতে তাদের অন্ততঃ একশো টাকা খরচ হবে, তাছাড়া মাছের দাম তো আছেই। নির্বোধ সঙ্গীকে বেশ ভালোরকম প্রহার করার সংকল্প নিয়েই তীরে এসে তরী ভেড়াল চোরের দল।

কিন্তু নদীতীরে লোকটার কোন চিহ্ন নেই তো! তখন হঠাৎ সেই দীর্ঘ ধূসর বর্ণ বস্তুটির কথা তাদের মনে পড়ল। হ্যাঁ, একটা গর্জনও শোনা গিয়েছিল বটে! লোকটাও যেন হঠাৎ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল বলে মনে হচ্ছে!

যে ব্যক্তি ডিঙ্গি চালাচ্ছিল, সে নদীর পাড়ে উঠে নিরুদ্দেশ সঙ্গীর খোঁজ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সবাই তাকে নিষেধ করল। প্রথমে তারা ভেবেছিল তাদের সঙ্গী কোন প্রেতাত্মার কবলে পড়েছে। একটু পরেই হঠাৎ তাদের মনে পড়ল প্যান্থারটির কথা। কিছুক্ষণ আলোচনা করে তারা স্থির করল ঐ জন্তুটাই তাদের সঙ্গীকে আক্রমণ করেছিল। এতক্ষণে জন্তুটা নিশ্চয়ই লোকটাকে মেরে ফেলেছে এবং অন্ধকার নির্জন জায়গায় বসে শিকারের মাংস ভক্ষণ করছে। এই সিদ্ধান্তে আসতেই তারা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেইদিকে অর্থাৎ স্রোতের বিপরীত দিকে ডিঙ্গি বাইতে শুরু করল। কিন্তু প্রায় আধমাইল যাওয়ার পর আর ঐভাবে ডিঙ্গি চালানো সম্ভব হল না। তখন চোরের দল ডিঙ্গিটাকে পাড়ের উপর তুলে রেখে যথাসম্ভব দ্রুত পদচালনা করল গ্রামের উদ্দেশ্যে। পথ চলার সময় তারা চিৎকার করে কথা বলছিল, যাতে প্যান্থারটা ভয় পেয়ে তাদের সামনে না আসে।

পরের দিন সূর্য যখন মাথার উপর আগুন ছড়াচ্ছে, সেই সময় সমগ্র গ্রামের লোক দল বেঁধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সন্ধানে যাত্রা করল। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না, তাকে পাওয়া গেল নদীর ধারে একটা

ঝোপের কাছে। জীবিত নয় মৃত—ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত। অন্যান্য বারের মতো এবারও দেখা গেল প্যান্থার মানুষটিকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে বটে, কিন্তু তার মাংস খায় নি।

এরপর শুরু হল হত্যার তাণ্ডবলীলা। আরও কয়েকটি মানুষ প্রাণ দিল প্যান্থারের কবলে। প্যান্থার শুধু হত্যা করে, মাংস খায় না। প্রত্যেকটি মৃতদেহকে জন্তুটা এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত করে ফেলে যে, লোকগুলোকে চিনতে পারাই কষ্টকর হয়ে ওঠে। মনে হয় দারুণ আক্রোশে জন্তুটা ক্রমাগত আঘাত করে গেছে, হত্যার পরেও মানুষগুলোর উপর তার রাগ যায় নি।

এই সময়ে নিতান্তই ঘটনাচক্রে একটি জিপগাড়ি চড়ে অকুস্থলে এসে পড়লেন বিখ্যাত শিকারী কেনেথ অ্যাণ্ডারসন। প্যান্থারের উপদ্রবের বিষয় তিনি কিছু জানতেন না, তিনি এসেছিলেন মাছ ধরতে। সঙ্গে ছিল তাঁর ছেলে ডোনাল্ড ওরফে ডন, ডনের বন্ধু মারওয়ান, সেডন টাইনি নামে এক ওস্তাদ মাছ-শিকারী এবং থাংগুভেলু নামে এক স্থানীয় ব্যক্তি—যে একাধারে শিকার, গাড়ি পরিষ্কার, রন্ধন, পরিবেশন প্রভৃতি সর্ববিষয়ে সর্ববিদ্যা বিশারদ।

বাঙ্গালোরে অবস্থিত অ্যাণ্ডারসন সাহেবের বাড়ি থেকে পাক্কা নিরানব্বই মাইল দূরে কাবেরী নদীর ধারে যেখানে তাঁদের আস্তানা ফেলা হল, সেই জায়গাটা তালাইনভু গ্রাম থেকে দশ মাইল দূরে। ঐখানেই মাছ ধরা হবে বলে স্থির হল।

রাতের খাওয়া শেষ করে সকলে বনের মধ্যে একটা জায়গা পরিষ্কার করে শুয়ে পড়ল।

ঐ অঞ্চলে যে একটি নরঘাতক প্যান্থারের আবির্ভাব হয়েছে সে কথা আগন্তুকরা জানতেন না, অতএব কারও মনে দুশ্চিন্তা ছিল না। তবে একটা বিপদের সম্ভাবনা ছিল,—হাতি। তাই সারা রাত অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা হল। কিছুক্ষণ গল্প করার পর সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল...

হঠাৎ অ্যাণ্ডারসন সাহেবের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি ঘড়ি দেখলেন। তিনটে বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে। আগুন প্রায় নিবে এসেছে, অন্ধকার ভেদ করে জ্বলছে কয়েক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ। আগুনটাকে সারা রাত জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব যায় ছিল, সেই থাংগুভেলু গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সাহেবের বাঁদিকে তাঁর ছেলে ডোনাল্ড নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। ডানদিকে মারওয়ান আর টাইনি রাতের শিশির এবং মশার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য মাথা-মুখ চাদর-ঢাকা দিয়ে ঘুমাচ্ছে।

অ্যাণ্ডারসন ভাবতে লাগলেন হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল কেন? জঙ্গলের ভিতর থেকে কোন সন্দেহজনক শব্দ ভেসে আসছে কি...কিন্তু ছেলে ডোনাল্ডের প্রচণ্ড নাসিকা-গর্জন ছাড়া আর কিছুই তিনি শুনতে পেলেন না...

হঠাৎ তিনি জানতে পারলেন তাঁর ঘুম ভাঙ্গার কারণ। খুব কাছেই জেগে উঠল করাত চালানোর মতো খসখসে শ্বাপদ কণ্ঠের আওয়াজ—'হা-আঃ! হা-আঃ! হা-আঃ!' ক্ষুধিত প্যান্থারের কণ্ঠস্বর!

সাহেব বুঝলেন নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর মগ্নচৈতন্য ঐ শব্দে সাড়া দিয়েছে, আর সেইজন্যই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

অ্যাণ্ডারসন ভয় পেলেন না। শিকারী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতেন প্যান্থার মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক নয়। প্যান্থার মানুষের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে। অবশ্য আহত হলে বা কোন কারণ বশতঃ নরমাংসের প্রতি আকৃষ্ট হলে ভয়ের কথা বটে। তবে নরখাদক প্যান্থার অতিশয় বিরল।

মা-প্যান্থারের কাহিনী তখন পর্যন্ত সাহেব জানতেন না, তাই প্যান্থারের আক্রমণের সম্ভাবনা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে নি।

আবার জাগল শ্বাপদ কণ্ঠে অবরুদ্ধ গর্জন ধ্বনি। সাহেব শব্দ লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেললেন। জন্তুটাকে এবাব স্পষ্ট দেখা গেল। নিদ্রিত থাংগুভেলুর থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে মাটির উপর গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে শ্বাপদ। বসার ভঙ্গি দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় সে থাংগুভেলুর উপর লাফিয়ে পড়ার উপক্রম করছে।

সাহেব রাইফেলের দিকে হাত বাড়ালেন। অস্ত্রটাতে গুলি ভরে পাশেই রেখে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রাইফেল বাগিয়ে ধরার আগেই হঠাৎ থাংগুভেলু ঘুমের ঘোরে উঠে বসল। তার পায়ের কাছে ছিল জলভরা ডেকচি, পায়ের ধাক্কা লেগে পাত্রটা সশব্দে নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটা একলাফে অদৃশ্য হল অন্ধকার অরণ্যের গর্ভে। থাংগুভেলু অবশ্য ততক্ষণে আবার শুয়ে পড়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

অ্যাণ্ডারসন এইবার হৈ হৈ করে সকলকে ডেকে তুললেন এবং প্যান্থারের উপস্থিতির কথা বললেন। কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করতে চাইল না। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস তিনি ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন।

অ্যাণ্ডারসনকে একটু ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে সকলেই আবার নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মন দিল। সাহেবের আর ঘুম এল না। বাকি রাতটা তিনি রাইফেল হাতে জেগে রইলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস একটা মানুষখেকো প্যান্থারকেই তিনি দেখেছেন—জন্তুটা থাংগুভেলুকে আক্রমণের উদ্যোগ করছিল।

পরের দিন মাছ ধরার পালা। চাইনি কয়েকটা মাছ ধরল। অ্যাণ্ডারসন আর তাঁর ছেলে ডোনাল্ড ওরফে ডন অনেকক্ষণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁদের ছিপে একটিও মাছ উঠল না। মারওয়ান বলল সে স্নান করতে যাচ্ছে। স্নানের ফলে যাতে মাছ ধরার বিঘ্ন না হয়, সেইজন্য যেখানে মাছ ধরা হচ্ছিল তার থেকে একটু দূরে, নদীস্রোত যেদিক থেকে আসছে, সেইদিকে চলল মারওয়ান কাঁধে একটা তোয়ালে নিয়ে।

অন্য কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, গত রাত্রে প্যান্থারের উপস্থিতি সম্পর্কে অ্যাণ্ডারসন সাহেবের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না এবং সেটা যে নরখাদক এবিষয়েও তিনি ছিলেন নিশ্চিত, অতএব তিনি মারওয়ানকে ডেকে বললেন, "দাঁড়াও, আমিও আসছি।"

হাতে রাইফেল আর কাঁধে রাইফেল নিয়ে মারওয়ানকে অনুসরণ করলেন কেনেথ অ্যাণ্ডারসন।

সেদিন বিকালের দিকে নদীর জলে বোমা ফাটার আওয়াজ শুনে অ্যাণ্ডারসন সাহেব ও তাঁর দলবল শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলেন। নদীর বাঁক ঘুরতেই মাছ চোরদের দুটি ডিঙ্গি তাঁরা দেখতে পেলেন। একটা ডিঙ্গিতে মাছ বোঝাই, আর একটাতে কয়েকজন লোক অর্থাৎ চোরের দল। সাহেবদের দেখে চোররা ঘাবড়ে গেল, তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে তারা চম্পট দেওয়ার উপক্রম করল। কিন্তু অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গীরা তাদের পালাতে দিল না, বন্দুক উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে তাদের তীরে ডিঙ্গি ভেড়াতে বাধ্য করা হল। তারপর শুরু বল বাগ্‌যুদ্ধ। সাহেবের ছেলে ডন তাদের চৌর্যবৃত্তির জন্য তিরস্কার করল। চোরদের বক্তব্য হচ্ছে, মাছগুলো যখন কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তখন মাছ ধরায় দোষ কি? সাহেবরাই বা তাদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন কোন্ অধিকারে? তাঁরা কি

সরকারের লোক? থাংগুভেলু এই সব আইনঘটিতে প্রসঙ্গে যোগ দিল না, তার বক্তব্য হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মাছ দুটি তাদের দিয়ে চোররা যেখানে খুশি যাক, তাদের গন্তব্য বিষয় নিয়ে শিকারীদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

অ্যাণ্ডারসন এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার বললেন, "আচ্ছা, তোমরা বলতে পারো এই এলাকায় কোন মানুষখেকো প্যান্থার আছে কি না?"

বেশ কিছুক্ষণ সকলে স্তব্ধ। তারপর একজন মৃদুস্বরে বলল, "হ্যাঁ, ডোরাই, আছে। জন্তুটা অনেক মানুষ মেরেছে। আমাদের দলেই কালু নামে একটি লোক তার কবলে মারা গেছে কয়েকদিন আছে। আমরা তাই দিনের বেলায় মাছ ধরছি। আমরা চাঁদনি রাতেই মাছ ধরি। কিন্তু এখন সন্ধ্যার পর কেউ ঘরের বাইরে যেতে সাহস পায় না।"

লোকটির কথা শুনে সাহেবের ছেলে ডন দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল, "চুলোয় যাক মাছ। আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। আমাদের কাছে এই প্যান্থার সম্পর্কে সব কিছু খুলে বলো। আমরা শিকারী, জন্তুটাকে গুলি করে মারতে চেষ্টা করব।"

লোকগুলো আশ্বস্ত হয়ে তীরে নামল। তারপর তাদের মুখ থেকে সাহেব এবং তাঁর সঙ্গীরা প্যান্থারটির সম্পর্কে সব কিছুই শুনলেন। সেসব কথা আগেই সবিস্তারে বলা হয়েছে, তাই এখানে আর পুনরাবৃত্তি করলাম না।

ঘটনার বিবরণ শুনে শিকারীদের সহানুভূতির সঞ্চার হল মা-প্যান্থারের উপর। বন্য শ্বাপদের এমন প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রবৃত্তি বড় একটা হয় না। ব্যাঘ্র জাতীয় পশুরা অনেক সময় মানুষের অস্ত্রে আহত হলে নরভুক্ হয়, কিন্তু তার কারণ স্বতন্ত্র। আহত অবস্থায় দ্রুতগামী বলিষ্ঠ বন্য পশুদের হত্যা করতে অসমর্থ হয়ে বাঘ অথবা প্যান্থার মানুষের মতো দুর্বল শিকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেখানে প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাব থাকে না, অতি সহজে ক্ষুধা নিবারণের জন্যই তারা নরখাদকে পরিণত হয়।

কিন্তু এই মেয়ে-প্যান্থারটি মানুষকে হত্যা করে, মাংস খায় না। শুধু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই সমগ্র মনুষ্য জাতির বিরুদ্ধে সে জেহাদ ঘোষণা করেছে! এমন ঘটনার কথা বড় একটা শোনা যায় না।

যাই হোক, মা-প্যান্থারের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও শিকারীরা তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। জন্তুটা বেঁচে থাকলে বহু নিরপরাধ মানুষ তার কবলে মারা পড়বে। অতএব মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক ঐ পশুকে হত্যা করাই শিকারীর কর্তব্য বলে সকলে মনে করলেন।

শিকারীরা বড় জানোয়ার মারতে আসেন নি, এসেছিলেন মাছ ধরতে। তবে মাছ ধরার সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও তাঁদের সঙ্গে দুটি রাইফেল আর দুটি শট্গান ছিল। পরামর্শের ফলে স্থির হল টাইনি শট্গান নিয়ে নদীর স্রোত অনুসরণ করে নদীতীর ধরে হাঁটবে ঘণ্টা দুই, তারপর ফিরে আসবে শিকারীদের আস্তানায়। মারওয়ান আর একটি শট্গান নিয়ে নদীস্রোতের বিপরীত দিকে নদীতীরেই অনুসন্ধান করবে। অ্যাণ্ডারসন ও তাঁর ছেলে ডন প্যান্থারের সন্ধান করবেন ভিন্ন ভিন্ন দিকে জঙ্গলের মধ্যে, তাঁদের হাতে থাকবে রাইফেল। থাংগুভেলু একটা গাছে উঠে জিপগাড়ি আর ছড়িয়ে-থাকা সরঞ্জামের উপর নজর রাখবে। স্থির হল, প্রত্যেকেই আস্তানায় ফিরবে বিকাল ৫টার মধ্যে।

ব্যাপারটা অবশ্য খুবই বিপজ্জনক। নদীর ধারে ঝোপঝাড় ও জঙ্গলেব মধ্যে লুকিয়ে থেকে প্যান্থার খুব সহজেই শিকারীর গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারবে, কিন্তু শিকারীব পক্ষে উদ্ভিদের আবরণ ভেদ করে জন্তুটার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। জন্তুটা নরহত্যা করতে উদ্‌গ্রীব, প্রথম আক্রমণের সময়েই তাকে গুলি চালিয়ে পেড়ে ফেলতে না পারলে শিকারী নিজেই শিকারে পরিণত হবে সন্দেহ নেই। দলের প্রত্যেকেই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকবে, অর্থাৎ নিজেরাই টোপ হয়ে শ্বাপদকে আকৃষ্ট করবে—অতর্কিত আক্রমণের ফলে বিপন্ন সঙ্গীকে সাহায্যের সুযোগ অন্য শিকারীরা পাবে না, তাই প্রত্যেক শিকারীকেই নির্ভর করতে হবে নিজের ক্ষমতার উপর। ভুল হলে মৃত্যু নিশ্চিত।

আগের রাতে একটা শম্বর হরিণের চিৎকার শুনেছিলেন অ্যাণ্ডারসন সাহেব। হরিণজাতীয় পশু অনেক সময় মাংসাশী শ্বাপদের অস্তিত্ব বুঝতে পারলে চিৎকার করে বনের অন্যান্য বাসিন্দাদের সাবধান করে দেয়। অতএব যেদিক থেকে বিগত রাত্রে শম্বর হরিণের চিৎকার সাহেবের কানে ভেসে এসেছিল, সেইদিকেই তিনি যাত্রা করলেন প্যান্থারের সন্ধানে।

পার্বত্য পথ বেয়ে এগিয়ে চললেন সাহেব। চারদিকে ছড়ানো বড় বড় পাথর, ঘন ঝোপঝাড়। ঐ পাথর বা ঝোপের আড়ালে প্যান্থার লুকিয়ে থাকতে পারে অনায়াসে। কিছুদূর যাওয়ার পর ছেলে ডন এবং তার সঙ্গীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়লেন অ্যাণ্ডারসন। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই, তিনি আশা করলেন তারাও তাঁর মতোই সতর্কতা অবলম্বন করবে।

চারদিক নিস্তব্ধ। অসহ্য গরম। পাখিদের কলকণ্ঠ সম্পূর্ণ নীরব। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে অগ্রসর হলেন সাহেব। সামনে বড় পাথর বা ঝোপঝাড় দেখলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে কাছে আসছিলেন সাহেব, তবে তিনি জানতেন পিছন থেকেই বিপদের ভয় বেশি—কারণ, বাঘ অথবা প্যান্থাব মানুষ মারতে অভ্যস্ত হলেও মানুষকে ভয় পায় এবং সেইজন্যই অধিকাংশ সময়ে তারা মানুষকে পিছন থেকে আক্রমণ করে। অতএব সাহেবকে ক্রমাগত থামতে হচ্ছিল, কখনও সামনে কখনও পিছনে তাকাতে তাকাতে খুব ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। বাতাসের ধাক্কায় আন্দোলিত উদ্ভিদ এবং বৃক্ষশাখার মর্মরধ্বনি শুনে মাঝে মাঝে প্যান্থারের অস্তিত্ব কল্পনা করে রাইফেল তুলে ধরেন তিনি, একটু পরেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার অস্ত্র নামিয়ে পদচারণা করেন—এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর অ্যাণ্ডারসন বুঝলেন তাঁর স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ছে, একেবারে অনভিজ্ঞ নতুন শিকাবীব মতো আচরণ করছেন তিনি।

এইবার তিনি বেপরোয়া হয়ে উঠলেন, নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চললেন সামনে। আরও কিছুক্ষণ কাটল। কিছু ঘটল না। সাহেব মনে করলেন মাছ চোর প্যান্থারের ব্যাপারটা বাড়িয়ে বলেছে। নরঘাতিনী মেয়ে-প্যান্থারের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সন্দিহান হয়ে উঠলেন।

একটা পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠছিলেন অ্যাণ্ডারসন। একটু পরেই পাহাড়ের উপর উঠে তিনি নামতে শুরু করলেন ঘন বাঁশবনে ঘেরা একটি উপত্যকার দিকে...

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর গাছের পাতা ঘর্ষণের শব্দ সাহেবের কানে এল, পরক্ষণেই গাছের ডাল ভাঙ্গার আওয়াজ! শব্দের কারণ বুঝতে শিকারীর কান ভুল করল না—গাছের পাতা আর ডালপালা দিয়ে উদর পূরণ করছে হাতি!

অ্যাণ্ডারসন থেমে গেলেন, যেদিক থেকে শব্দ আসছে সেইদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। ব্যাপারটা জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হাতি যদি একক হয়, তাহলে কাছাকাছি মানুষ দেখলে আক্রমণ করতে পারে। একক হস্তী অধিকাংশ সময়ে দলছাড়া গুণ্ডা হয়, মানুষ বা অন্য জন্তু দেখলে সে হত্যা করতে চায়। হাতির দল থাকলে বিশেষ ভয় নেই, মানুষ দেখলে তাদের সরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। শব্দ যেদিক থেকে আসছে, সাহেবের চলার পথটা গেছে সেইদিকেই। হাতিকে এড়াতে হলে ঘন বাঁশ ঝোপ আর কাঁটাবনে ঢুকতে হয়, আর সেরকম জায়গায় ক্রুদ্ধ প্যান্থার বা হাতির সম্মুখীন হলে শিকারীর সমূহ বিপদ—তাই সোজা রাস্তা ধরেই এগিয়ে চললেন সাহেব।

সাহেবের পিছন দিক থেকে জোর হাওয়া আসছিল। সামনে গাছের ডালপালা ভাঙ্গার আওয়াজ হঠাৎ থেমে গেল। সাহেব কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। চারদিক স্তব্ধ, অর্থাৎ হাতিও বাতাসে গন্ধ পেয়ে আহারে ক্ষান্ত হয়েছে। এখন হয় সে নিঃশব্দে সরে গেছে, অথবা মানুষটাকে চাক্ষুষ দেখার জন্য অপেক্ষা করছে।

এই প্রকাণ্ড জন্তুগুলো নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে, কিন্তু জঙ্গল সেখানে এমন ঘন যে, সেই নিবিড় উদ্ভিদের আবরণের ভিতর দিয়ে চলতে গেলে সামান্য একটু শব্দ হবেই হবে—সাধারণ মানুষের কান সেই তুচ্ছ শব্দের কারণ ধরতে না পারলেও অভিজ্ঞ শিকারী সেই শব্দ থেকেই গজরাজের চলাচলের সংবাদ জানতে পারবেন। কোন শব্দ কানে না আসায় সাহেব বুঝলেন হাতি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। বাতাস নিশ্চয়ই তার কাছে নিকটবর্তী মানুষের সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে—হাতির ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল।

আরও দশ মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সাহেব। হাতি নড়ল না। বোধহয় ভাবছিল দুপেয়ে আপদটা বিদায় না হওয়া পর্যন্ত নিঃশব্দে অপেক্ষা কবাই ভালো।

অবশেষে সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। হাতিটাকে ভয় দেখানোর জন্য জোবে শিস দিতে দিতে তিনি সামনে এগিয়ে চললেন সামনের পথ ধরে। ফল হল তৎক্ষণাৎ। অবশ্য সাহেব যা আশা করেছিলেন তা হল না—হাতি স্থানত্যাগ করল বটে, কিন্তু পিছন ফিরে পালাল না, ক্রোধে চিৎকাব করতে করতে ছুটে এল সাহেবের দিকে! ঘন জঙ্গল ভেদ করে মুহূর্তের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল একটা প্রকাণ্ড মাথা আর হত্যার আগ্রহে উদ্যত একজোড়া সুদীর্ঘ গজদন্ত!

মহা মুশকিল! ঐ এলাকায় কোন গুণ্ডা হাতির অস্তিত্ব সরকার থেকে ঘোষণা করা হয় নি। জন্তুটাকে গুলি করে মারলে বনবিভাগ অ্যাণ্ডারসনকে নিয়ে টানাটানি করবে আর তার ফলে সাহেবের দুর্গতির সীমা থাকবে না। দৌড়ে পালাতে গেলে মৃত্যু অনিবার্য, কারণ ক্রুদ্ধ হস্তী তাহলে নির্ঘাত সাহেবকে অনুসরণ করে ধরে ফেলবে এবং হত্যা করবে—দৌড়ের প্রতিযোগিতায় মানুষের পক্ষে হাতিকে হারিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য গুলি চালিয়ে হাতির হাঁটু ভেঙ্গে দিয়ে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহলে জন্তুটা দিনের পর দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করবে—অনর্থক জানোয়ারকে কষ্ট দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না অ্যাণ্ডারসন সাহেব।

হ্যাঁ, আর একটা উপায় আছে, আর সেই উপায়ই অবলম্বন করলেন সাহেব। শূন্যে রাইফেল তুলে আওয়াজ করতেই হাতি চমকে থেমে গেল। তার পায়ের ধাক্কায় রাশি রাশি ঝরাপাতা আর

ধুলোর ঝড় উড়ল চারদিকে। সাহেব সামনে এগিয়ে এসে আবার রাইফেলের আওয়াজ করলেন।

এইবার গজরাজ ভয় পেল। ক্রুদ্ধ বৃংহন-ধ্বনির পরিবর্তে তার কণ্ঠে জাগল ভয়ার্ত চিৎকার। ছোট্ট বেঁটে লেজটা পিছনের দুই পায়ের ফাঁকে গুটিয়ে সে দ্রুতবেগে পলায়ন করল।

সব দিক রক্ষা পাওয়ায় খুশি হলেন সাহেব। হাতি বাঁচল, তিনিও বাঁচলেন। কিন্তু নিজের উপর তিনি বিরক্ত। চুপচাপ আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে হাতিটা নিশ্চয়ই চলে যেত। রাইফেলের আওয়াজ শুনে খুনী প্যান্থার আর এদিকে আসবে না। মাত্র আধঘণ্টা হল তিনি আস্তানা ছেড়ে বনের মধ্যে এসেছেন, এখন আর এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে কি? প্যান্থারের সাক্ষাৎ আজ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর সাহেব আবার অগ্রসর হলেন। অন্তত মিনিট দশের মধ্যে প্যান্থার, হাতি বা অন্য কোন হিংস্র জানোয়ারের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই; রাইফেলের শব্দে কাছাকাছি যে-সব পশু ছিল, তারা নির্ঘাত দূরে সরে পড়েছে। পদে পদে চারদিকে নজর রাখার দরকার আর ছিল না, তাই খুব কম সময়ের মধ্যেই ঘন বাঁশবন পেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় তিনি পৌঁছে গেলেন। এখানে রয়েছে বাবুল, কুলগাছ, ছোট ছোট তেঁতুল গাছ এবং মাটির উপর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে লম্বা লম্বা ঘাস আর ঘাস। পায়ে চলা যে-পথ ধরে সাহেব এগিয়ে চলছিলেন, সেই পথটা বিস্তীর্ণ ঘাসের সমুদ্রে হারিয়ে গেছে, তার পরিবর্তে এখানে-ওখানে তৃণাবৃত প্রান্তর ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করেছে আরও অনেকগুলো ছোট ছোট পায়ে-চলা পথ। হরিণদের পায়ে-পায়ে ঐ পথগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। জায়গাটা পরীক্ষা করে অ্যাণ্ডারসন বুঝলেন তিনি হরিণদের প্রিয় বাসভূমিতে এসে পড়েছেন। মাংসাশী পশুর প্রিয় খাদ্য হচ্ছে হরিণ—সুতরাং সাহেবের আশা হল এইখানে খুনী প্যান্থার হয়তো হানা দিতে পারে।

সাহেব আরও একটু এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁর কানে এল পাখীর ডাকের মতো এক বিচিত্র শব্দ! শব্দের তরঙ্গ এগিয়ে আসছে তাঁরই দিকে। না, ওগুলো পাখীর ডাক নয়—বুনো কুকুর! একপাল বুনো কুকুর কোন হতভাগ্য শিকারকে তাড়া করে সাহেবের দিকেই ছুটে আসছে!

সাহেব তাড়াতাড়ি একটা ছোট তেঁতুল গাছের আড়ালে সরে দাঁড়ালেন।

ভারতীয় বুনো কুকুর অতি ভয়ংকর জীব। বনের সব জানোয়ারই তাকে ভয় পায়। এই কুকুরগুলো দল বেঁধে শিকার করে। কোন হরিণের পিছনে যদি বুনো কুকুরের দল তাড়া করে, তবে তার রক্ষা নেই। যতই দ্রুতগামী হোক পলাতক হরিণ একসময়ে ধরা পড়বেই, আর কুকুরগুলো তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে।

গাছের ডালপালার উপর শিং-এর ঘষা লাগার আওয়াজ শুনতে পেলেন সাহেব, সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল ভেদ করে তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করল একটি সুন্দর শম্বর হরিণ। তার মুখ থেকে ফেনা ঝরে পড়ছে, কাঁধের উপরও জড়িয়ে রয়েছে মুখের ফেনা, আর তার দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে দারুণ আতঙ্কে! হরিণটা থামল না, তীরবেগে ছুটে পালাতে লাগল।

আচম্বিতে জাগল বজ্রপাতের মতো ভীষণ গর্জনধ্বনি, পরক্ষণেই ডোরাকাটা একটা শরীর শূন্যপথে উড়ে এসে পড়ল ধাবমান শম্বরের পিঠের উপর!

একটা বাঘ শিকারের খোঁজে হরিণদের বিচরণ ভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে কুকুরদের চিৎকার

নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিল এবং তারা যে শিকার তাড়িয়ে নিয়ে আসছে সেটাও বুঝতে পেরেছিল। সাধারণতঃ বাঘ বুনো কুকুরদের এড়িয়ে চলে, এই বাঘটাও হয়তো তাই করত—কিন্তু হরিণটা তার কাছে এসে পড়ায় সে লোভ সামলাতে পারে নি, শিকারের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বাঘের শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সে নিশ্চয়ই সাহেবের অনেক আগেই কুকুরগুলোর চিৎকার শুনতে পেয়েছিল এবং উৎকর্ণ হয়ে শব্দের গতি নির্ণয় করছিল, সেইজন্য সাহেবের মৃদু পদধ্বনি তার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে নি।

বাঘের গুরুভার দেহ হঠাৎ পিঠের উপর পড়তেই শম্বরের পিঠ বেঁকে গেল, তার কণ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে এল ভয়ার্ত চিৎকার, তারপরই দুটি জানোয়ার জড়াজড়ি করে পড়ে গেল মাটির উপর। লম্বা লম্বা ঘাসের আড়ালে ভূপতিত পশু দুটিকে আর দেখতে পাচ্ছিলেন না সাহেব—কিন্তু মেরুদণ্ড ভাঙ্গার আওয়াজ এবং শক্ত মাটিতে খুরের সংঘাতজনিত শব্দ শুনে বুঝলেন বাঘ তার শিকারকে হত্যা করছে, মাটির উপর মৃত্যুকালীন আক্ষেপে পা ঠুকছে মরণাহত হরিণ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে অকুস্থলে উপস্থিত হল একপাল বুনো কুকুর!

সাহেব যেখানে আত্মগোপন করেছিলেন, সেখান থেকে ঘাসের আড়ালে উপবিষ্ট বাঘকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। সে মৃত শিকার আগলে রেখে কুকুরগুলোকে তাড়াবার জন্য ভীষণ গর্জনে বন কাঁপাতে লাগল। সেই সঙ্গে কাঁপতে লাগল সাহেবের বুক। কিন্তু কুকুরের দল নির্বিকার!

অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের চমক সামলে নিয়ে কুকুরগুলো মৃত হরিণ আর বাঘকে ঘিরে ফেলল। সাহেব গুণে দেখলেন দলে রয়েছে নয়টি কুকুর।

হঠাৎ কুকুরগুলোর কণ্ঠস্বর বদলে গেল, পাখীর ডাকের মতো তীক্ষ্ণ কলধ্বনির পরিবর্তে তাদের কণ্ঠে জাগল এক করুণ ও বিলম্বিত শব্দের তরঙ্গ! শিকারী অ্যাণ্ডারসনের কাছে ঐ পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরের অর্থ অজানা ছিল না—কুকুরগুলো এখন তারস্বরে সাহায্য চাইছে জাতভাইদের কাছে!

প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে ঐ সাহায্য প্রার্থনা কখনও বিফল হয় না। আশে-পাশে অবস্থিত প্রত্যেকটি বুনো কুকুর ঐ করুণ কণ্ঠের আহ্বান শুনলেই ছুটে আসবে। অরণ্যের সারমেয় সমাজে এটাই হল অলিখিত আইন। এই আইন মেনে চলে প্রত্যেকটি বনবাসী কুকুর।

বাঘ এতক্ষণ লম্বা লম্বা ঘাসের আড়ালে গুঁড়ি মেরে পড়েছিল, এবার সে উঠে দাঁড়াতেই তার সমগ্র শরীর সাহেবের দৃষ্টিগোচর হল। ধীরে ধীরে দেহ ঘুরিয়ে সে শত্রুপক্ষের সংখ্যা নির্ণয় করল। তার মুখ তখন ক্রোধে বিকৃত হয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, হিংস্র দন্ত বিস্তার করে সে ভীষণ শব্দে গর্জন করছে এবং তার দীর্ঘ লাঙ্গুল পাক খাচ্ছে দেহের দুপাশে বারংবার! অভিজ্ঞ শিকারী অ্যাণ্ডারসন লেজ নাড়ানোর ভঙ্গি দেখে বুঝলেন বাঘ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, কিন্তু সে ভয় পেয়েছে একথাও সত্যি।

কুকুরগুলো বাঘের ভীতি প্রদর্শনে বিচলিত হল না, তারা একটানা বিষণ্ণ স্বরে চিৎকার করে সাহায্য চাইতে লাগল। অরণ্যের বুকে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে বাজতে লাগল ব্যাঘ্রের ভৈরব গর্জন আর সারমেয় বাহিনীর উৎকট ঐকতান!

বাঘ বুঝল যত দেরি হচ্ছে, ততই তার বিপদ বাড়ছে। হঠাৎ দুই লাফে এগিয়ে গিয়ে বাঘ

তার সামনে দাঁড়ানো কুকুরটাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। আক্রান্ত কুকুর চটপট সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করল। বাঘের পিছনে যে কুকুরগুলো ছিল তারা এগিয়ে এল বাঘকে আক্রমণ করতে। বাঘ এইরকমই অনুমান করেছিল, চকিতে পিছন ফিরে সে ডাইনে-বাঁয়ে থাবা চালাল বিদ্যুৎ-বেগে। কুকুরগুলো তাড়াতাড়ি তার থাবার নাগাল থেকে সরে গেল, শুধু একটি কুকুর একটু দেরি করে ফেলল—

সনখ থাবার প্রচণ্ড আঘাতে কুকুরটা ঠিকরে শূন্যে উঠে গেল এবং তার দেহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পিছনের একটি পা!

কুকুরগুলো আবার পিছন থেকে বাঘকে আক্রমণ করল। আবার ঘুরে দাঁড়াল বাঘ, আবার তার সামনে থেকে সরে গেল কুকুরের দল আর বাঘ যখন আক্রমণকারী কুকুরদের সামলাতে ব্যস্ত, সেই সময়ে পিছন থেকে আর দুপাশ থেকে অন্য কুকুরগুলো ছুটে এল কামড় বসাতে।

বাঘ একপাশে ঘুরল, তারপর আশ্চর্য কৌশলে দিক্-পরিবর্তন করে পিছন থেকে তেড়ে আসা কুকুরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শত্রুর এমন অভাবনীয় আচরণের সম্ভাবনা কুকুররা কল্পনা কবতে পারে নি। সরে যাওয়ার আগেই বাঘের প্রচণ্ড দুই থাবা দুটো কুকুরকে মাটির উপর পেড়ে ফেলল। একটা আহত কুকুর তার বিদীর্ণ উদর নিয়ে অতিকষ্টে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই বাঘ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁত বসিয়ে দিল।

শত্রুপক্ষকে বাঘ প্রায় বিধ্বস্ত করে এনেছিল, কিন্তু আহত কুকুরটাকে কামড়াতে গিয়েই সে ভুল করল। মুহূর্তের মধ্যে অন্যান্য কুকুরগুলো তাকে পিছন থেকে ও দুপাশ থেকে ছেঁকে ধরল এবং কামড়ের পর কামড় বসিয়ে বাঘের শরীর থেকে মাংস তুলে নিতে লাগল।

বাঘের ঘন-ঘন গর্জনে বন কাঁপতে লাগল, কিন্তু এখন তার গর্জনে ভয়ের আভাস ফুটে উঠল...

বাঘ হাঁপাচ্ছে। তার নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত। কুকুরের দল বিশ্রামে রাজী নয়। তারা নতুন উদ্যমে আক্রমণ শুরু করল, চিৎকার করতে করতে। বাঘ আবার গর্জে উঠল কিন্তু তার গর্জনে তেমন জোর নেই। যুদ্ধের আগ্রহ তার কমে এসেছে। সে এখন দস্তুরমতো শঙ্কিত!

আচম্বিতে ব্যাঘ্র গর্জন আর সারমেয় কণ্ঠের ঐকতান ডুবিয়ে দিয়ে ভেসে এল এক নতুন শব্দের তরঙ্গ! দূর থেকে ভেসে আসছে বহু কুকুরের কণ্ঠস্বর—একদিকে থেকে নয়, বিভিন্ন দিক থেকে, এবং একই সঙ্গে!

সাহায্যের আশ্বাস! দলে দলে বুনো কুকুর ছুটে আসছে যুদ্ধে যোগদান করতে।

নাজেহাল বাঘ আর দাঁড়াল না। সভয়ে লেজ গুটিয়ে সে দৌড় দিল রণক্ষেত্র ত্যাগ করে। কুকুরগুলো নাছোড়বান্দা—ক্লান্ত ও আহত দেহ নিয়েই তারা বাঘের অনুসরণ করল। দেখতে দেখতে সাহেবের চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল পলাতক বাঘ আর অনুসরণকারী ছয়টি কুকুরের দল...

কিছুক্ষণ পরেই সাহায্যকারী কুকুরগুলো অকুস্থলে এসে পড়ল। প্রথমে পাঁচ, পরে আরও বারোটি কুকুর সেইখানে উপস্থিত হল। নিহত তিনটি কুকুরের দেহ থেকে ঘ্রাণ গ্রহণ করতে করতে নবাগত কুকুরের দল হঠাৎ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, তারপর ছুটে চলল সেই পথে, যে-পথ দিয়ে পালিয়েছে বাঘ এবং তার অনুসরণকারী ছয়টি কুকুর।

সব মিলিয়ে এখন প্রায় চব্বিশটি কুকুর বাঘের পিছু নিয়েছে। সাহেব বুঝলেন বাঘের আর নিস্তাব নেই। কুকুরেব দল একসময়ে বাঘকে ধরে ফেলবেই ফেলবে, তারপর সকলে মিলে তাকে ছিঁড়ে টুকবো টুকরো কবে ফেলবে। বাঘকে শেষ করে ফিরে এসে কুকুরগুলো হরিণটাকেও যে খেয়ে ফেলবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই।
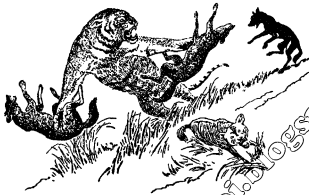
অ্যাণ্ডারসন তাঁর আস্তানায় ফিরে এসে দেখলেন টাইনি ফিরে এসেছে। একটু পরে এসে পড়ল মারওয়ান। তারা কেউ কিছু দেখে নি বা শোনে নি। বেশ দেরি করে এল সাহেবের ছেলে ডন। সে একটা প্যান্থারের পায়ের ছাপ দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ বনের পথে চলতে চলতে একটা গুহা তার চোখে পড়ে। গুহার মধ্যে প্যান্থার থাকতে পারে ভেবে সে কয়েকটা ঢিল ছুড়ে মারে। তার আশা ছিল ঢিল খেয়ে গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে প্যান্থার। হ্যাঁ, বেরিয়ে এসেছিল বটে—কিন্তু প্যান্থার নয়, এক ভল্লুকী! তার পিঠে ছিল দু'দুটো বাচ্চা! ভল্লুকী বাচ্চা নিয়ে অন্ধের মতো ছুটতে ছুটতে অরণ্যগর্ভে অদৃশ্য হল, ডনকে সে দেখতে পায় নি। ভাগ্যিস দেখে নি, মানুষ দেখলে হয়তো সে আক্রমণ করত আর আত্মরক্ষার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে গুলি করতে বাধ্য হতো ডন।

ভল্লুক পরিবারের সঙ্গে প্যান্থারের সহাবস্থান অসম্ভব, অতএব অনুসন্ধান-পর্বে ইস্তফা দিয়ে আস্তানায় ফিরে এসেছিল ডোনাল্ড ওরফে ডন।

বনের মধ্যে অ্যাণ্ডারসন সাহেবের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে সবাই তো অবাক। বাঘ আর কুকুরের লড়াই-এর ঘটনা সকলকেই আকৃষ্ট করল। আশ্চর্যের বিষয় হল যে, হাতিকে ভয় দেখানোর জন্যে সাহেবের গুলি ছোড়ার আওয়াজ কেউ শুনতে পায় নি।

রাতে শুতে যাওয়ার আগে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা হল। ঠিক হল দু'ঘণ্টা পর পর পালা করে সবাই পাহারা দেবে। চটপট রাতের খানা শেষ করে সকলে গল্পগুজব আরম্ভ করল। একসময় কথাবার্তা থেমে গেল, সকলের চোখে নামল তন্দ্রার আবেশ। পালা অনুসারে প্রথম দু'ঘণ্টা পাহারা দেবে থাংগুভেলু, তারপর মারওয়ান, তারপর অ্যাণ্ডারসন সাহেব স্বয়ং—অ্যাণ্ডারসনের পরে যথাক্রমে ডোনাল্ড আব টাইনি।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে অ্যাণ্ডারসন শুনতে পেলেন পাহাড়ের উপর থেকে ভেসে আসছে বাঘের গর্জন। তাঁব মনে হল যে-বাঘটিকে কুকুরের দল তাড়া করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই হত্যা করেছিল, সেই নিহত বাঘের সঙ্গিনীই পাহাড়ের উপর গর্জন করে ফিরছে...

নির্দিষ্ট সময়ে সাহেবকে ঘুম থেকে তুলে মারওয়ান বলল, একটা প্যান্থারকে সে শিকারীদের আস্তানার পিছনে পাহাড়টাব উপর থেকে ডাকতে শুনেছে। আওয়াজ আসছিল অনেক দূর থেকে। হ্যাঁ, আরও একটা কথা তার মনে পড়ছে—একটা পাখী, সম্ভবতঃ বনমোরগ, শিকারীদের শয্যার খুব কাছ থেকে হঠাৎ চিৎকার করতে করতে পাখা ঝটপটিয়ে উড়ে গেছে। ব্যাপারটা এত তুচ্ছ যে, সে ঘটনাটার কথা উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিল।

মারওয়ান শুয়ে পড়ল। অ্যাণ্ডারসন তাকে কিছু বললেন না, কিন্তু বনমোরগের ব্যাপারটা তাঁর কাছে আদৌ তুচ্ছ মনে হয নি। পাখীটা হঠাৎ চিৎকার করে অন্ধকাবেব মধ্যে উড়ে গেল কেন? সে নিশ্চয়ই দিনেব আলো থাকতে থাকতে রাতের নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ঐ জায়গাটাকে বেছে নিয়েছিল। কোন বিপদের সম্ভাবনা না থাকলে পাখীটা রাতের অন্ধকাবে অনিশ্চিত আশ্রয়ের জন্য অন্ধের মতো স্থানত্যাগ করে

ভাবতেব বুনো কুকুব

ছোটাছুটি করবে না। এই বিপদটা হয়তো শিকারসন্ধানী পাইথন, বনবিড়াল বা ভাম হতে পারে—এমন কি ক্ষুধার্ত কোন প্যান্থারের উপস্থিতিও অসম্ভব নয়। হরিণ, শুয়োর প্রভৃতি জানোয়ার প্যান্থারের প্রিয় খাদ্য হলেও পক্ষিমাংসে তার অরুচি নেই।
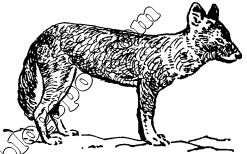
ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে সাহেবের মনে হল নরঘাতিনী মেয়ে-প্যান্থারটাকে দেখেও পাখীটা ভয় পেয়ে থাকতে পারে। আগের বাতে ঐ প্যান্থারটাই যে নিদ্রিত শিকারীদের আস্তানায় হানা দিতে এসেছিল সে বিষয়ে সাহেবের সন্দেহ ছিল না কিছুমাত্র। জন্তুটার মনুষ্যজাতির উপর যে রকম বিদ্বেষ, আজ রাতেও নিদ্রিত শিকারীদেব উপর তার হামলার সম্ভাবনা আছে বলেই সাহেবের মনে হল। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আরও একটা কাঠ তিনি ফেলে দিলেন, আলোটা জোর হলে নজর রাখার সুবিধা হবে। তারপর নদীর ধারে একটা মস্ত গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাইফেল বাগিয়ে বসলেন।

পিছনে নদী, পৃষ্ঠরক্ষা কবছে গাছের গুঁড়ি—অতএব পিছন থেকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে পাহারা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন অ্যাণ্ডাবসন...

রাত দুটো বাজল। তখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নি। পিছন থেকে ভেসে আসছে নদীর কল্লোলধ্বনি। মাঝে মাঝে জলচর জীবের সশব্দ আলোড়ন...মাছ, অথবা কুমীর হওয়াও বিচিত্র নয়। বিপরীত দিকে নদীকূল থেকে ভেসে এল বাতচবা সারসেব বিষণ্ণ চিৎকার। তারার মালায় সাজানো অন্ধকার আকাশের পটে আরও-অন্ধকাব এক উড়ন্ত ছায়া। কয়েক মুহূর্তের জন্য সাহেবের দৃষ্টিপথে ধরা দিয়ে অদৃশ্য হল। অন্ধকারেও ঐ উড়ন্ত ছায়ার স্বরূপ নির্ণয় করতে ভুল করেন নি শিকারী, ওটা 'হর্নড আটল' নামক অতিকায় প্যাঁচা। ঐ পাখি রাতের শিকারী, অন্ধকারে খরগোস ও অন্যান্য ছোটখাটো জীবজন্তু মেবে খায়।

পেচক অন্তর্ধান করার পরেই কাঠের উপর করাত চালানোর মতো একটা কর্কশ চাপা আওয়াজ সাহেবের কানে এল। জলকল্লোল ভেদ করে ঐ অস্পষ্ট আওয়াজ তা আলাদা করে ধরার মতো শ্রবণশক্তি এবং ঐ শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধি করার মতো শিক্ষা সকলের নেই—কিন্তু অভিজ্ঞ শিকারী কেনেথ অ্যাণ্ডারসন বুঝলেন শব্দটা এসেছে প্যান্থারের গলা থেকে! অর্থাৎ মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ঘাতিনী!

আবার, আবার সেই মৃদু অথচ ভীতিপ্রদ শব্দ। এবারে খুব কাছে। নিদ্রিত মানুষগুলোর পিছনেই একটা ঘন ঝোপ থেকে শব্দ এসেছে। আক্রমণের আগে সাহস সঞ্চয় করার জন্যই জন্তুটা চাপা গলায় গর্জন করছে। এখনই সে আক্রমণ করবে সন্দেহ নেই। শ্বাপদের উদ্দেশ্য বুঝলেও সাহেব টর্চের বোতাম টিপলেন না। কারণ সামনের ঝোপটাকে একটা নিরেট অন্ধকারের স্তূপের মতো লাগছিল, প্যান্থারকে সাহেব তখনও দেখতে পাচ্ছিলেন না। যদি এই মুহূর্তে সে ঝোপের আড়ালে থাকে, তাহলে আলো জ্বাললেও সাহেব তাকে দেখতে পাবেন না—কিন্তু জন্তুটা তাঁকে দেখেই চম্পট দেবে, তাকে গুলি করার আর সম্ভাবনা থাকবে না। সুতরাং সাহেব আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে চাইলেন।

কিন্তু প্যান্থার অপেক্ষা করতে রাজী হল না। আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে প্যান্থার যেরকম তীব্র ও ছোট গর্জনে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়, ঠিক সেইভাবে গর্জন করে জন্তুটা একলাফে ঝোপ থেকে বেবিয়ে নিদ্রিত শিকারীদের কাছাকাছি এসে পড়ল। আর একটি লাফ দিলেই সে এসে পড়বে মানুষগুলোর উপব।

ঠিক এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন সাহেব। টর্চের আলোকরেখা অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে নির্দিষ্ট নিশানাকে সাহেবের দৃষ্টিগোচর করে দিল—নিক্ষিপ্ত আলোকে জ্বলে উঠল প্যান্থারের দুই চক্ষু!

হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে জন্তুটা থমকে গেল, সাহেব রাইফেলের নিশানা স্থির করে ট্রিগার টিপতে উদ্যত হলেন—

আচম্বিতে একটা প্রচণ্ড শব্দ! তারপরই আর একটা!

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল সাহেবের ছেলে ডন, জানিয়ে দিল বাবা গুলি ছোড়ার আগেই তার রাইফেল ঘাতিনীকে মৃত্যুশয্যায় শুইয়ে দিয়েছে।

জন্তুটা তখনও মরে নি। খুব ধীরে ধীরে সে শ্বাস টানছিল, তার শরীব কেঁপে কেঁপে উঠে প্রকাশ করছিল প্রাণশক্তির শেষ স্পন্দন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেই স্পন্দনও স্তব্ধ হয়ে গেল। মৃত্যুবরণ করল ঘাতিনী।

মা-প্যান্থারের মৃত্যুতে খুশি হন নি সাহেব। তবে সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে ছেলের কৃতিত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল—

বাস্তবিক, ঘুম-জড়ানো চোখে অন্ধকারের মধ্যে অব্যর্থ সন্ধানে লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা কয়জনের থাকে?